To be indicated thus :— "New" for item[illegible] appearing for th

ACJP—A 235—1942-43—1,400.

উত্তরায়ণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আড়াই টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৩৬

প্রিণ্টার-শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উত্তরায়ণ 'ভারতবর্ষ' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়া ৺বিজয়া দেবী

ছোট পিসিমা :

আজও নূতন উপন্যাস লিখলে তোমার কথা মনে করে চোখের জল আমি বন্ধ রাখতে পারিনে। আমার লেখা এ বইখানি তোমারই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর্‌লেম।

তোমার চির-স্নেহের
অনুরূপা

উত্তরায়ণ

১

"আপনি ভাল কর্ব্বার কথা দিতে পারেন? না, শেষটা অন্য ডাক্তারদের মতনই আমায় ফাঁকি দেবেন?"

"অন্য ডাক্তাররাও হয় ত আপনাকে ইচ্ছা করে ফাঁকি দেন নি, এবং আমিও দেবো না, এখন আমার হাতযশ আর আপনার কপাল!"

ডাক্তারের সহিত একটী তরুণী রোগিনীর কথা হইতেছিল। রক্তশূন্য সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া সেই মেয়েটী অবজ্ঞাসূচক স্বরে কহিয়া উঠিল,—

"তবেই হয়েছে! আমার কপালে যদি সুখই থাকবে, তবে আমার এ দশা হতেই বা যাবে কেন? শুনেছিলুম ভাল খেতে পরতে পেলে মানুষের শরীর ভাল থাকে,—ও-সব কিন্তু বাজে কথা! আমায় তাহলে কিসের দুঃখে এমন ধারা রোগে ধরলো! ঠিক করে বলুন দেখি, আমি বাঁচব ত?"

ডাক্তার সেখানে দুজন উপস্থিত ছিলেন; একজন এ-বাড়ীর পারিবারিক চিকিৎসক, আর একজন নূতন। উভয়েই দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন, তার পর নবীনাগত ডাক্তারটী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলেন,—

"বাঁচবেন তো বটেই, বেশ সুস্থ সবল হয়েই বহুকাল বেঁচে থাকবেন।" শুনিয়া রোগিনী একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস পরিগ্রহণ করিল।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন—"তবে এই কথা যে, আমাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, সেইটী যদি আপনি ঠিক মেনে চলেন, তবেই আমরা আপনার চিকিৎসার ভার নেবো।"

মেয়েটি গভীর উৎসুক হইয়া কহিল—"কি,—অনেক টাকা চান,—এই তো? তা' আমার স্বামীকে বল্লে তিনি হয়ত তা' দিতে রাজী হবেন। তিনি এলে বলবেন!"

ডাক্তার দুজনেই একটুখানি হাসিলেন। নূতনটী কহিলেন "টাকার কথা আমি বলিনি।—আচ্ছা, থাক তিনি এলেই সে-সব কথা কওয়া যাবে।—"

পাশের ঘরের পরদা ঠেলিয়া রোগিনীর শাশুড়ী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাঁর ফরসা রংয়ে, সাদা চুলে, অম্লান শুভ্র বসনে তাঁকে যেন একটী সচল সাদা মেঘের মতই মহিমান্বিতা দেখাইতেছিল। যদিও শেষ দিকের কয়টী বৎসরে তাঁর চেহারার অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—পরিণত দেহ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে,—তথাপি স্বাভাবিক মর্য্যাদাপূর্ণ ভাবটুকুর কিছুই বিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু তাঁর মুখে চোখে একটা ক্লান্ত অবসন্নতা যেন ছায়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সেটা বোধ করি বা তাঁর একমাত্র পুত্রের অযোগ্য বিবাহে তাঁর নিজেরই অনেকখানি দায়িত্বের অনুশোচনায়। এই অশিক্ষিত রুগ্না এবং সন্তানহীনা পুত্রবধূ লইয়া তাঁর সাংসারিক সুখ ও ভবিষ্যতের সকল আশাই ফুরাইয়া গিয়াছে। ছেলের মুখ চাহিয়া আর নিজের অপরাধের লজ্জায় তবু তিনি ঢের সহ্য করিতেছেন। সহ্য না করিয়াই বা উপায় কি? ইঁহার পুত্র সরোজবন্ধু শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তাঁর এই সন্তান-বৎসলা সুশিক্ষিতা মায়ের হাতেই সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া

উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এঁদের সুবিস্তৃত জমিদারী, সাতমহলা বাড়ী, বাগান, দেবমন্দির, নহবৎখানা, এ সমস্তই থাকা সত্ত্বেও, ছেলের উচ্চ-শিক্ষার জন্য সরোজের মা তাঁর নব-বৈধব্যের সমস্ত বেদনা এবং সুখৈশ্বর্য্যের সমুদায় প্রভাব হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া লইয়া দু'একটী কর্ম্মচারী মাত্র সহায়ে ছেলে লইয়া সামান্য ভাবেই কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ছেলে মাকে ও মা ছেলেকে ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন কিছুরই সঙ্গে যেন তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ছিল না। সেই এক দিন ছিল!

তার পর জমিদার-সন্তান সরোজ একটার পর একটা করিয়া পর পর কয়েকটাই পরীক্ষা পাস করিয়া গেল। কোনটায় সে সোনার মেডেল, কোনটায় বা কিছু স্কলারশিপও পাইল। পুত্র-গৌরবে পুত্রগতপ্রাণা জননীর বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। এইবার একটী সুন্দরী সুশিক্ষিতা পুত্রবধূ আনিতে পারিলেই সকল বাসনাই পূর্ণ হয়। সরোজের যোগ্য বধূ খুঁজিবার জন্য ঘটকের দল নিযুক্ত হইয়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুলের হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ এবং আশঙ্কার ছায়ালোক সৃজন করিতে লাগিল। উচ্চ-শিক্ষিত ধনী-সন্তানে কন্যা সম্প্রদান কোন্ পিতার না প্রার্থিত? আবার ইহার উপযুক্ত যৌতুকের অভাবটাও এই সঙ্গে চিন্তার বিষয় বই কি!

অতঃপর এমন একটী ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার ফলে তাদের মাতা-পুত্রের সমস্ত আশা সহসা ঘোর নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া আজিকার দৃশ্যটীকে তাঁর জীবন-নাটকের রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিতে বাধ্য করিয়াছে।

সরোজের মা ঘরে ঢুকিতে ডাক্তার দুইজনেই চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নামাইয়া অভিবাদন জানাইলেন। তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসকটী তাঁহার দিকে একটা চেয়ার সরাইয়া দিয়া বলিলেন—

"বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। সরোজ কি এখনও বাড়ী আসেনি ?"

ডাক্তারের সরাইয়া দেওয়া চৌকিটা আর একটু টানিয়া লইয়া উহাতে বসিতে বসিতে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া মা জানাইলেন যে, তাঁর ছেলে তখনও এ গৃহে অনুপস্থিত।

কিন্তু এইটুকু নীরব প্রকাশের মধ্য দিয়াই এ প্রশ্নটার প্রত্যুত্তর সমাধা হইতে পাইল না। ডাক্তারদের সেদিনকার রোগী ডাক্তারের প্রশ্নে তার শাশুড়ীর অমন ঔদাস্যে-ভরা নীরব অস্বীকৃতিতে বোধ করি কিছু অসহিষ্ণু এবং উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে তার মাংসহীনতায় সমধিক সরলোন্নত নাসিকাটি প্রচুর ভাবে কুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা কহিয়া বলিল,—

"উনি এক্ষণই বাড়ী আসবেন! আপনি কি আজ নূতন হলেন না কি, ডাক্তারবাবু ?"

কথাটা সত্য হইলেও এই নবাগত ডাক্তারটীর সাক্ষাতে পুত্রপ্রাণা মার মুখের 'পরে এবং রোগীর নিজ মুখে বড় বেশিই অপ্রিয় শুনাইল। এর মধ্যে যেন প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি ভর্ত্তি করা রাশিকৃত অভিযোগ ভরা রহিয়াছিল। প্রবীণ ডাক্তারটী ইহাতে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং ইহার সংশোধনার্থ কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে অবসর না পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"না, তার জন্যে কিছু নয়; সে এই এলো বলে। আজ যে ডাক্তার সেনকে কনসণ্ট কর্ব্বার জন্যে কল করা হয়েছে, সে কথা তার নিশ্চয়ই মনে আছে। ততক্ষণ আমরা দুজনে বেশ করে কেশটাকে ষ্টাডি করে রাখি,—"কি বলেন, ডক্টর সেন ?"

একটা তীব্র অবজ্ঞার কঠিন হাস্যে রোগিনীর শীর্ণ অধর ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল! "সে কথা তাঁর মনে থাকতে তিনি আর এবাড়ীতে

ঢুকচেন না, এটা স্থির জান্‌বেন। তার চাইতে যা' পারেন আপনারাই করুন, অ্যাটা চুকে যাক্।"

নবাগত পূরাতনের মুখের দিকে চাহিলেন,—তাঁদের এই রোগীটাই সরোজবন্ধুর স্ত্রী।

সরোজের মায়ের নাম মহামায়া দেবী। বধূর এই মন্তব্য শুনিয়া মহামায়ার চোখ দুটীতে একটুখানি রোষের তীক্ষ্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কথা কহিতে কণ্ঠেও ঈষৎ ঐ আভাষই ব্যক্ত হইল, তিনি তীক্ষ্ণ ভাবে কহিলেন,—

"কি বাজে বক্‌চো বউমা! সে তোমার অসুখে যত্ন নিচ্চে না—এই কথা কি তুমি বলতে চাও না কি? তা যদি বলো, তাহলে বাছা, তোমায় আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ বলি।"

বাহিরের লোকেদের সাক্ষাতে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা তিনি সঙ্গত বোধ করিলেন না বলিয়াই বোধ করি এইখানেই চুপ করিয়া গেলেন; নতুবা তাঁর মনের মধ্যে আরও একটু কিছু বলিবার জন্য প্রেরণা আসিতেছিল।

বধূ স্বর্ণলতা শাশুড়ীর তিরস্কার গায়ে মাখিলেন না। তিনি তাঁর কোমল সাটিনের গদির উপর নরম পালকের বালিসের গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক মৃদুকণ্ঠে যেন আত্মগতই কহিলেন,—

"ওঁর অসুখ হলে আমি কি ওই রকম করে দিন নেই রাত নেই বেড়িয়ে বেড়াতুম?"

এ কথাটার কেহই জবাব দিল না। ডাক্তার দুজনেই যেন এ কথাটা শুনিতে পান নাই, এম্‌নি করিয়াই নিজের নিজের আসনে বসিয়া একটা অনির্দ্দেশ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তবে মনের ভিতর যে দুজনেই ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছিল।

আর সেইটুকু বুঝিতে পারিয়াই মহামায়া দেবী তাঁদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

"আপনাদের যদি সময় নষ্ট হচ্চে মনে করেন, তা'হলে না হয় কাল একবারটী এই সময়েই দুজনে আবার একত্র হয়ে—"

স্বর্ণলতা তার রক্তাল্পতায় অতি শুভ্র শীর্ণ হস্ত সবেগে বিছানার উপর বিক্ষেপ করিয়া অসহিষ্ণুতার সহিত বলিয়া উঠিল—"আঃ আবার কাল! ভাল বিপদ আমার হয়েচে! প্রত্যেক দিনই দুজন চারজন ডাক্তার এসে এসে যদি আমার পেট টিপে, পিঠ বাজিয়ে, জিভ টেনে দেখতে থাকে, তাহলে মরণ আসতে আমার যেটুকুও বা দেরি আছে, সেও নিকট হয়ে দাঁড়াবে! বাবাঃ! আমার আর বেঁচে কাজ নেই।"

ডাক্তারদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"আপনারা যান, আমার ভাল হ'বার দরকার নেই, চিকিৎসা আর আমি করাবো না।"

মহামায়ার মুখে বিরক্তি-চিহ্ন পুনশ্চ ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াই ধীর স্বরে কহিলেন,—

"ছি, মা, সব বিষয়েই অমন অসহিষ্ণু হ'লে চলে কি? অসুখ কার না হয়? হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে। এ ত দু'একদিনের কাজ নয়! আজ তো এঁরা তোমায় দেখে গেলেন, কাল একবার এসে শুধু—"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! নিজের হ'লে তখন টেরটী পেতে, রোজ রোজ ডাক্তারের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া কত সুখের!"—বলিতে বলিতে স্বর্ণলতা কাঁদিয়া ফেলিল, এবং অশ্রু-আবিল অথচ রোষ-তীব্র দৃষ্টি শাশুড়ীর দিকে ফিরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"এই তো আমার দুখানা হাড়। এর উপর ওই নল বসানো, আর টোকা মারা, কোঁক দুটো তো ডাক্তারদের লোহার মত আঙ্গুলের টিপুনীতে

সর্ব্বদা ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আছে। এই করে করে আমার হচ্চে কি? আমি কি একটুও ভাল হচ্চি? না দিন দিন মরণের দিকেই এগিয়ে যাচ্চি?"—

মুখের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া অসহ্য দুঃখে সে কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার বোধ করি এসব দৃশ্য দেখা ও শোনা খুব বেশি রকমই অভ্যাস হইয়া গিয়া থাকিবে। তিনি বধূর অতখানি দুঃখে খুব বেশি বিচলিত না হইয়াই শুধু সহজ স্বরেই "ওসব কথা বলতে আছে কি?" বলিয়াই নীরব হইলেন। প্রবীণ ডাক্তারটী নিজের আঙ্গুলের দিকে একবার চকিত নেত্রে চাহিয়াই সেগুলার লৌহ-কাঠিন্য সম্বন্ধে একটুখানি পরীক্ষাচ্ছলে টিপিয়া ধরিয়া অন্য দিকে চোখ ফিরাইলেন। শুধু এঁদের মধ্যে নূতন আগন্তুক এই নবীন ডাক্তারটীই তাঁর এই নূতন রোগীর সুদীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণার অসহিষ্ণুতায় তাহার প্রতি মমতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়া একটা মৃদুশ্বাস মোচন করিলেন। মেয়েটীর পোকায়-কাটা জীর্ণ ফুলের মতন দুরন্ত রোগের তাড়নায় শুকাইয়া যাওয়া সুন্দর,—অতি সুন্দর মূর্ত্তিটী তাঁর মনে অত্যন্ত গভীর ভাবেই সহানুভূতির উদ্রেক করিতেছিল। তাঁর মনের মধ্যে ইহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিবার একটা উৎকট তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। মেয়েটীর বয়স বড় জোর কুড়ি বৎসর।

"লতি! তুমি জেগে না ঘুমিয়ে? আমি তোমার কাছে আস্‌চি—" বলিতে বলিতে ঘটঘট শব্দে জুতা বাজাইয়া সশব্দে দরজাটা ঠেলিয়া দিয়া এ গৃহের অধিকারী যিনি তিনিই আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ইনিই স্বর্ণলতার স্বামী সরোজবন্ধু গুপ্ত।

"ওঃ, মা রয়েছ? আঃ, আপনারাও এসেছেন যে! তাই তো! ক'টা বেজেছে? দশটা বেজে সতের মিনিট! এতটা কখন বাজলো! অ্যাঁ! কতক্ষণ এসেছেন ডক্টর চ্যাটার্জ্জী? বেশিক্ষণ না বোধ

হয়? ঘণ্টাখানেক? বলেন কি! ওঃ, তাহলে ভারি অন্যায় হয়ে গ্যাছে ত!”

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী সরোজকে অনেক দিন হইতেই জানেন। ইহার সহিত তাঁহার এখনকার যে সম্পর্ক, সেটা শুধু রোগী বা ভিজিটদাতার সম্পর্কই নয়, একটু স্নেহসম্বন্ধেও তিনি এক্ষণে ইহার সহিত সম্বদ্ধ। তাই উহার এই একান্ত প্রয়োজনীয় সময়ের অনুপস্থিতিকে তিনি এটিকেটের খাতিরেও মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ স্বর্ণলতার চোখের জলে তাঁহার মনটাও সরোজের ’পরে কিছু অপ্রসন্ন হইয়াছিল। যদিও এ জল যে কতটাই সুলভ, সে খবরটায়, তিনি তার চিকিৎসা হাতে লওয়া অবধি এই দীর্ঘ তিনটী বৎসর ধরিয়া নিয়তই অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেও, আজিকার এ অশ্রুপাতে সরোজের পক্ষ হইতে যে ত্রুটীটা ঘটিয়াছে, সেটাকেও খুব তুচ্ছ বোধ করিতে পারেন নাই। তাই গম্ভীর মুখেও তাহারই সহিত সমান ওজনে মাপিয়া কণ্ঠস্বরকে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিয়া লইয়া কহিলেন,—

“অন্য দিন যা হয় হয়, আজ আপনার বাড়ী থাকা উচিত ছিল সরোজ বাবু! মিঃ সেনের সময় তো আর আমার মতন শস্তা নয়—”

“বাঃ! আপনারই বা সময় শস্তা হলো কবে থেকে? আমি যেন সেই মনে করেই দেরি করেছি? ভুলে গেছলুম, ডক্টর সেন! একেবারেই আপনাকে কল দেওয়ার কথাটা ভুলে গেছলুম। তার জন্য হাজারবার ক্ষমা চাইচি, দোহাই আপনার, রাগ কর্ব্বেন না।”

ডাক্তার সেন সহাস্যে কহিলেন,—

“আমি একহাজার বার পেরে উঠবো না, তার চাইতে একেবারেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে চুকিয়ে দিলেম,—তার পর এখন আমাদের কাজের কথা হোক।—”

“তাই হোক,—” বলিয়া সরোজ একটুখানি অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর কাছে

গিয়া দাঁড়াইল। স্বর্ণলতা স্বামীর আগমনাবধি উহাঁদের দিকে পিছন ফিরিয়া দেওয়ালের দিকেই মুখটা করিয়া চুপচাপ শুইয়া ছিল। বোধ করি বা তাহার একান্ত প্রিয়তম স্বামীর মুখের চাইতে সাদা দেওয়ালটাও এই অভিমানের মুখে তার কাছে বেশি দর্শনীয় মনে হইয়া থাকিবে! কাপড়ের যে অংশ মুখে চাপিয়া ইতিপূর্ব্বে সে কাঁদিতেছিল, তাহাই এখন তার মুখের অশ্রুচিহ্ন গোপন করিবার অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে।

বিমুখী স্ত্রীর শয্যালীন শীর্ণ দেহের উপর ঈষৎ নত হইয়া সরোজ জিজ্ঞাসা করিল,—

"এখন কেমন আছ লতা? কলিকটা আজ আর ধরে নি ত?"

স্বর্ণলতা প্রথমটা এ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া স্থির করিলেও নূতন ডাক্তারটীর উপস্থিতি স্মরণ করিয়া সে শুধু তার শেষ প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সুবিধার খাতিরে সঙ্গত বোধ করিল। মাথা একটু নাড়িয়া জানাইল যে কলিকের যে ব্যথা তার রোগের প্রধান অংশ, সেটা সেদিন তখনও তাহাকে ধরে নাই।

সরোজ খুসী মনে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ার লইয়া বসিল—"তার পর? এখন আমায় কি করতে হবে বলুন তো?"

ডাক্তার সেন নিজের আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,— "এখানে নয়, এখান থেকে অন্য ঘরে চলুন। সেইখানে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। এঁর চিকিৎসার সম্পূর্ণ ভার আমি নিতে প্রস্তুত আছি। আমার বিশ্বাস, একটী মাসের ভিতরে আমি আশ্চর্য্য সুফল দেখাতেও পার্ব্বো; কিন্তু আমি যে রকম বলবো, ঠিক সেই ভাবে যদি আপনারা দুজনেই চলতে রাজী থাকেন, তবেই আমি এ চিকিৎসা হাতে নোব, তা না হলে নোব না।"

মহামায়া দেবী সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন,—

"আপনি যে রকম বলবেন, নিশ্চয়ই সেই মত চ'লা হবে, এ আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।"

সরোজও মার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিল,—

"নিশ্চয়!"

শুধু স্বর্ণলতাই এতক্ষণ পরে এপাশে ফিরিয়া শুইল এবং সনিঃশ্বাসে তার সাভিমান মৌন ভঙ্গ করিয়া কথা কহিল,—

"আমি কিন্তু সবটা না জেনে শুনে আপনাকে কোন রকমেই কোন কথা দিতে পারবো না। আর তা'ছাড়া র'মীটজুস্, বেঙ্গারস্‌ফুড, আর বেদানার রস, এ' যদি আমায় খেতে বলেন, তাহলে আমার চিকিৎসা করে আপনার কাজ নেই।"

ডাক্তার সেন তাঁর ভবিষ্যৎ রোগীর কথা শুনিয়া মৃদু হাসিলেন, কহিলেন,—

"আমি আপনাকে খাঁটি দুধ, ডিমসিদ্ধ, মাগুরমাছের রোষ্ট আরও অনেক কিছু খেতে দেবো। আমের মোরব্বা, আর সব রকমেরই একটু একটু—জ্যাম ও জেলি—তা' কিছু খেতেই আমার বারণ থাকবে না। এমন কি, খেতে চান্ তো ভীম নাগের সন্দেশও রোজ আধখানা করে খেতে পারবেন।"

স্বর্ণলতা গভীর ঔৎসুক্যে ক্ষীণ হাস্যোদ্ভাসিত মুখে ডাক্তারের দিকে চাহিল, কহিল,—

"সন্দেশে আমার রুচি নেই,—এদের বাড়ী এসে ও ঢেরই খেয়েছি। তবে একটুখানি কোন রকম জেলি আর দুখানা টোষ্ট পেলেই আমি এখন বেঁচে যাই। কাঁচকলা সেদ্ধ আর পোরের ভাত খেতে খেতে প্রাণটা আমার বেরিয়ে গেছে!—ওগো, শুন্‌চো? তুমি এঁর হাতেই আমায় দিয়ে দাও,—মরি বাঁচি, যা হয় আমার ওঁরই হাতেই হয়ে যাক। আর র'মীটজুস খেয়ে খেয়ে আমি বাঁচতে পাচ্চিনে; এর চেয়ে যে মরণও ভাল।"

২

ডাক্তার সেন লোকটী বয়সে যদিও খুব প্রাচীনত্বের দাবী করিতে এখন পর্য্যন্ত অধিকারী হইয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি প্রবীণতার একটা বিশেষ অধিকার তাঁর রোগী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যেন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। যে বয়সে অধিকাংশেই অজ্ঞ থাকে, তেমন বয়সেই তিনি বিজ্ঞ বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এটা তাঁর বড় কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এম্-বি পাশ হইয়া ডাক্তার সেন তাঁর কাকার সাহায্যে বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে লণ্ডনে কয়েক বৎসর থাকিয়া সেখানের ডিগ্রি বেশ সম্মানের সহিতই লাভ করিয়া বৎসর দুই সেখানে শিক্ষকতা করিয়া জার্ম্মাণীতে যান। হার্ট সম্বন্ধীয় বিখ্যাত অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ চিকিৎসকের কাছে দুই বৎসর ঐ বিষয়ে অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পূর্ব্বক ডাক্তার সেন বৎসর কতক হইল দেশে ফিরিয়াছেন। এখানে সহরতলীতে মুক্ত স্থানে একটী চিকিৎসালয় খুলিয়া তিনি তাঁর নূতন অভিজ্ঞতায় হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করিতেছিলেন। কয়েকটী বড়লোক রোগীকে আরোগ্য করায় নামটা হঠাৎ সভ্যজগতে একটু বিশেষ ভাবেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সভ্যজগতে বিশেষতঃ মেয়ে-মহলে এই রোগটী আমাদের দেশে অন্ততঃ আর সব রোগেরই মত বেশ ভাল করিয়া প্রসার হইতেছে। যাদের সামর্থ্য আছে, প্রতিবিধান-চেষ্টা কেন না করিবে? কষ্ট তো বড় কম নয়।

এঁর চিকিৎসার মধ্যে বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক কতকগুলি প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। রোগীর নিজের বাড়ীতে এ সমস্ত যথাযথ ভাবে

ঠিক সুসম্পন্ন হয় না, এই জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত নার্সিং-হোমে থাকিয়া চিকিৎসিত হওয়াই সদুপায়। তবে সকলেই কিছু আর ধনী নয়, এবং ঘরছাড়া হইতেও সহজে সম্মত করাও যায় না; বিশেষতঃ খুব বেশি সাহেবীয়ানার মধ্যের লোক ছাড়া। তাই অনেক রোগীকে তাদের বাড়ীতে রাখিয়াই চিকিৎসা করিতে হয়। এবং ভালও যে তাদের কেহই হয় না, এমনও নয়। কিন্তু নার্সিং-হোমের রোগীরাই ডাক্তার সেনের নিজস্ব রোগী; এদের উপর তিনি তাঁর সমস্ত সময়ের অর্দ্ধেকটার বেশিই খরচ করিয়া থাকেন, ফলও বেশি ফলিতে দেখা যায়।

সরোজবন্ধু দুজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া তার বসিবার ঘরে নীচের তলায় নামিয়া আসিল। এই ঘরখানি বাড়ীর একটী প্রান্তভাগে এবং একেবারেই এ অংশটী তার নিজস্ব। ডাক্তারদের দুখানা চেয়ার সরাইয়া দিয়া সে নিজেও একখানা টানিয়া লইয়া তাঁদের বসিবার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাঁরা আসন গ্রহণ করিলে টেবিলের উপর হইতে নিজের লম্বাচোড়া ঢাকাই-কাজ-করা সিগারেট-কেসটা টানিয়া আনিয়া তার ডালা তুলিয়া ধরিয়া স্মিতহাস্যে আরম্ভ করিল—

"Please ডক্টরস্!—"

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী একটা মোটা মাপের বর্ম্মা সিগার তুলিয়া লইয়া ডাক্তার সেনের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার সেন ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িলেন "ও-সব তো খাইনে জানেন,—বসুন মিঃ গুপ্ত!"

"এই যে—" বলিয়া সরোজ সিগার-কেশ বন্ধ করিয়া চট্ করিয়া বসিয়া পড়িল; তার রাইডিং কোটের পকেট হইতে একটা ছোট মাপের সিগারেট লইয়া সেটা ধরাইতে ধরাইতে ডাঃ সেনের দিকে চাহিয়া কিছু বিস্ময়ের সুরে কহিয়া উঠিল—

"মাপ করবেন ডাঃ সেন! অত বচ্ছর ইউরোপে থেকেও আপনি এ-সব কিছু খান না, এ যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় না। সেখানেও কি খেতেন না? না ফিরে এসে হার্ট ট্রবলের ভয়ে ছেড়ে দিয়েছেন?"

সরোজবাবুর কথার মধ্যে ডাক্তারের উপর একটু সূক্ষ্ম খোঁচা দেওয়া ছিল। ডাক্তাররা ধূমপানকে হার্ট ট্রবলের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক বলিয়া থাকেন এবং ইনি হার্ট ট্রবলেরই স্পেশালিষ্ট।

ডাক্তার মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, "না, আমি সেখানেও কোন দিন ও-সব কোন কিছু খেতুম না।"

"তাতে আপনার শীত বেশি লাগতো না? এতে আর যা হোক একটু গরম তো রাখে!"

ডাক্তার সেন হাসিয়া বলিলেন, "তা' কেমন করে বলবো? পরীক্ষা করে ত দেখিনি।"

"আশ্চর্য্য! আমি তো এ কথা ভাবতেই পারি না। আচ্ছা 'স্মোক্' করলে যে হার্ট খারাপ হয় বলে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি? সত্যি কি কিছু হয়?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে তো সেই রকমই বলে। তবে সকলেরই যে হতে হবে এমন কোন লেখাপড়া অবশ্য করা নেই।"

সরোজ এ কথায় হাসিয়া ফেলিল, এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছেন। তাই যদি হবে, তা'হলে আমার হার্টকে এমন সাউণ্ড রেখে স্বর্ণের হার্টকে অ্যাটাক্ করতে গেল কেন? ও তো আর কখনো 'স্মোক্' করেনি।"

ডাক্তার দুজনেই মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তার পর সরোজকে আবার

একটা বাজে কথার সূত্রপাত করিতে উদ্যত দেখিয়া ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী কিছু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া হঠাৎ একটু চড়া গলায় বলিয়া ফেলিলেন,—"আমাদের এইবার কাজের কথা কওয়া উচিত সরোজবাবু!"

"কাজের কথা? ও ইয়েস্! আচ্ছা, হ্যাঁ, বলুন তো ডক্টর সেন! আমার স্ত্রীকে আপনি কি রকম দেখ্‌লেন?"

ডাক্তার সেন এ ঘরে পদার্পণ করিয়া পর্য্যন্ত সমস্তক্ষণ ধরিয়াই ঘরখানার আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন; এমন কি এই ঘরের ও অন্য ঘরের মধ্যদ্বারের উপর ঝুলান পর্দ্দাখানা যতবারই বাতাসে দুলিয়া ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়াও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে সে ঘরখানাকেও বেশ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। সেটা একটা শোবার ঘর। ঘরের মেজেয় একখানা কার্পেট পাতা; মধ্যে একখানা বোম্বাই প্যাটার্ণের ছোট খাট। টর্কিস তোয়ালে ঢাকা একটী মাথার বালিস। তোয়ালের পাশ দিয়া তার ওয়াড়ের ঝালরগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাজারের কেনা জিনিস।

খাটের মাথার কাছে একটা টিপয়। তার উপরেও সাদা লংক্লথের ড্রনথেডের হালকা কাজ করা ঢাকন; হাতের কাজ নয়, সাধারণতঃ বাজারে দোকানে যেগুলি সর্ব্বদা বিক্রি হয় তাই। টিপয়ের উপর একটী ছোট কাঁচের কুঁজা; কুঁজাটী একটী এনামেলের গামলায় বসানো, খুব সম্ভব উহাতে জল ঠাণ্ডার জন্য বরফ দেওয়া হয়; একখানা ছোট তোয়ালে, একটা রূপার পানের ডিবে, একখানা অ্যাস-ট্রে, তাতে খানিকটা বাসি ছাই এখনও ভরা আছে।

পর্দ্দাখানা সরিয়া নড়িয়া পাশের ঘরকে যতখানি দেখিতে দিল, তার মধ্যে ডাক্তার সেন ঐ ঘরে তার বিপরীত জাতীয়ের গন্ধটুকু পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। ঐটী যে নারীবর্জ্জিত একমাত্র পুরুষেরই

শয্যাগৃহ, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। অথচ সে পুরুষ বিবাহিত, এবং পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন, অটুট স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারী।

পর্দ্দা সরিয়া আসিয়া ক্ষণকালের জন্য যথাস্থানেই স্থির হইল। বরঞ্চ সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া বাতাসের দোলে পত পত শব্দ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গৃহান্তর-রহস্যের আবিষ্কার চেষ্টা পরিহার করিয়া ডাক্তার সেনও সরোজের মুখের দিকে চাহিলেন।

"আপনার স্ত্রীকে কেমন দেখলেন? কি বিষয়ে জান্‌তে চাইছেন?"

সরোজ তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ যেন অস্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিকে পরিহার করিয়া অন্যত্র চাহিয়া অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর করিল— "সব বিষয়েই, তাঁর রোগ কি কঠিন?"

ডাক্তার কহিলেন—"কঠিন না হলে সারচে না কেন? এঁরা তো আর যত্নের ক্রটী করেননি।"—এই বলিয়া ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

ডাক্তার উত্তর করিলেন—"তা ঠিক, সরোজবাবুর স্ত্রীকে সারিয়ে তোলবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেচি এবং ওঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে, তাতে তা' না করেও পারিনে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।"

সরোজ একটু ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল, "রোগটা কি? থাইসিস্?"

ডাঃ সেন কহিলেন "একেবারেই না। থাইসিস্ আপনি কি থেকে মনে করলেন?"

সরোজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল, যেন তার মন হইতে তিন ভাগেরও বেশি ভয়-ভাবনা সেই মুহূর্ত্তেই বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সে স্বচ্ছন্দভাবে কহিল,—"তা হলে আর ভাবনা কি? থাইসিস্‌টা না হলেই হোলো! তা' ছাড়া ও-রোগটা বড্ডই—"

ডাঃ সেন একটু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শ্লেষের সহিত কহিলেন, "থাইসিস্ কি একাই নরহন্তা? এ অপরাধে আর কি কেউই অপরাধী নয় সরোজবাবু? পৃথিবীতে যত মানুষ মরে, সবই কি থাইসিসে মরে?"

সরোজ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কিছুক্ষণ জবাব দিতে পারিল না; তার পর আস্তে আস্তে বলিল, "তা নয়, তবে কি না, ওটাতে আর আশা থাকে না, থাইসিসের রোগী যেন under sentence of death."

ডাঃ সেন গম্ভীরমুখে কহিলেন "এও ঠিক তাই।"

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী উহাঁর মুখের দিকে চকিত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন: সরোজ যেমন তেমনই স্থির হইয়া রহিল, কোন কথা বা ভাব তার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল না। ডাঃ সেন নিজেই তাহার দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্ননেত্রে চাহিয়া রহিলেন। এতবড় দুঃসংবাদটাকে সে যে রকম শান্ত-ভাবে গ্রহণ করিল, তাহাতে দর্শকের দুরকমই সংশয় ঘটিতে পারে,—এক অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের বিহ্বলতা, আর দ্বিতীয় এ-ও মনে কিছু করা আশ্চর্য্য বা অসঙ্গত হয় না যে, এই রুগ্ন অপত্যবিহীনা অশিক্ষিতা পত্নীতে তার শিক্ষিত, ধনী এবং সুস্থদেহ স্বামী হয় ত একান্তই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁর জীবন-মরণে আর বিশেষ কোন আগ্রহ তাঁর মধ্যে বর্ত্তমান নাই।

ডাঃ সেন, হাইকোর্টের জজ যে মুখভাবে ও কণ্ঠস্বরে পূর্ব্ব-বিচারিত অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডকে পুনর্ঘোষণা করিয়া থাকেন, তেমনই স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া সেই স্বরেই কহিতে লাগিলেন, "এঁর জীবনের আশাও ঠিক তেমনই অনিশ্চিত। একটুখানি সামান্য উত্তেজনা বা অবসাদের মধ্যেই হয় ত সেই জীবনদীপ চির-নির্ব্বাপিত হয়ে যেতে পারে। তাঁর এখন আপনার উপরেই সমস্তটা নির্ভর করে আছে। খুব বেশী সাবধানে, যত্নে

স্নেহে, সম্পূর্ণ স্বার্থ-ত্যাগ ও আত্মত্যাগ করে না চল্‌তে পারলে, কোন্ মুহূর্ত্তে যে কি ঘটে কিছুই বলতে পারা যায় না,—"

ডাঃ সেন আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন ; তাঁহাকে বাধা দিয়াই সরোজ বলিয়া উঠিল—"আমি কি করবো আমায় বলুন ?"

তার কণ্ঠে একটা উৎকণ্ঠিত বেদনা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল, "আমায় যে ভাবে চল্‌তে আদেশ দেবেন, আমি তাই করতে রাজী আছি।"

ডাক্তার বলিলেন "আপাততঃ কিছুদিন আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা করতে পারবেন না, রোগীর সমস্ত ভার আমার হাতে দিয়ে আপনি এবং আপনার মা একেবারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যাবেন, যেন উনি আপনাদের কেউ-ই নন। তার পর আমি যখন যে রকম বল্‌বো।"

"বেশ ত,"—বলিয়া সরোজ ভিতর হইতে একটা রুদ্ধশ্বাসকে অতি স্বচ্ছন্দভাবেই মুক্ত করিয়া দিল।—পুনশ্চ কহিল, "তাই হবে।"

ডাক্তার কহিলেন, "সব চেয়ে ভাল হয়, যদি উনি আমার সেবা-সদনে যেতে রাজী হ'ন ; কিন্তু তা' তিনি হবেন কি ? অন্ততঃ একটী মাসের জন্যে। তা' যদি যান, আমি আপনাকে প্রমিস করছি যে একটী মাসের মধ্যে ওঁকে আমি সেখান থেকে সম্পূর্ণ ভাল করে ফেরত দেবো।"

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী ও সরোজ উভয়েই এবার সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ যদি সম্ভব হয়, তবে তো তিনি খুব খুসী হয়েই যাবেন।"

কিন্তু ডাক্তার সেন এঁদের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না। তিনি কিছু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন,—"আমার কিন্তু তা মনে হয় না, তবে যদি—"

সরোজ কহিল, "সে আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো।—সে ঠিক হয়ে যাবে।"

ডাক্তার শুধু ঈষৎ হাসিলেন। মুখে তিনি আর কিছুই বলিলেন না।

৩

ঐ ঘটনার বছর কতক আগেকার কথা।—

গুরু গুরু গুরু গুরু মেঘের ডমরু ঘোর রোলে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। মহারুদ্রের ঘনঘটাজাল সমস্ত আকাশময় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। দূরে ও নিকটে চারিদিকে ধূসর পর্ব্বতের বিরাট বিপুল মূর্ত্তি মেঘ-কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্টতর। উহারই মধ্যে মধ্যে কোথাও শ্বেত, কৃষ্ণ ও পাংশুবর্ণ মেঘের পুঞ্জ তাদের সজল মূর্ত্তি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া আছে। মাথার উপর ঘন দেবদারুর বন মেঘের কোলে যেন শত শত পেখম ছড়ানো ময়ূরের মতই দেখাইতেছে। বাঁকাচোরা এলোমেলো ভাবে, চকচকে নেপালী কুক্রীর মতই বিদ্যুতের দীপ্ত শিখা ক্ষণে ক্ষণে সেই ক্রমনিবিড় নিকষ কালো মেঘের মধ্য হইতে চকিতে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল।

মুসুরী পাহাড়ের ক্যামেল্‌স্ ব্যাক রোড রাস্তার কিছু নীচে একটী অনতিবৃহৎ কাঠের দোতলা বাড়ীর একতলার বৈঠকখানায় একটী আন্দাজ বছর চৌদ্দ পনর বাঙ্গালীর মেয়ে একটা ছোট টেবিল হারমোনিয়মের সাম্‌নে বসিয়া বাজনা বাজাইয়া গাহিতেছিল,

"এস হে এস সজল ঘন, বাদল বরিষণে"

এস হে, এস, বলিয়া 'বাদল-বরিষণ'কে ঠিক এই সময়েই যে আহ্বান করিয়া ডাকিয়া আনার এই মেয়েটীর তেমন কিছু দরকার পড়িয়াছিল, তা কিন্তু নয়।—বরঞ্চ তার সাম্‌নের জানলা দিয়া মেঘ-বিচ্ছুরিত দিগন্তের দিকে চোখ পড়িতেই তার বুকের ভিতরটায় বেশ একটী অস্বস্তির ধাক্কা আসিয়া ঢেউ তুলিয়া যাইতেছিল। এই সমীপাগত-প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘ-ঝঞ্ঝার মাঝখানে সে তার সারাদিনের অনুপস্থিত বাপের কথাই

ভাবিতেছিল। প্রত্যূষেই তিনি আজ পাহাড় হইতে নামিয়া রাজপুর এবং রাজপুর হইতে মোটরে দেরাদুন গিয়াছেন, সন্ধ্যার পরে তাঁর ফেরার কথা। এই সময়ে তিনি রাজপুরের রাস্তায় কি পাহাড়ের চড়াই-পথে যেখানেই থাকুন, কষ্টভোগ অনিবার্য্যই! তাই মনে করিয়া মেয়েটী বারে বারেই চকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, আবার তখনই চোখ ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্যই বোধ করি ঐ গানটীই—যেটীর ভাবার্থ তার মনের ভাষার সঙ্গে এই মুহূর্ত্তে একেবারেই খাপ খায় না, অত্যন্ত অন্যমনস্কতার দরুণই মনের মধ্যে তার অর্থ পরিগ্রহ মাত্র না করিয়াই—শুধু সময়োচিততার খাতিরে পড়িয়া সেইটীকেই গাহিতে আরম্ভ করিল।

চিড়বনের মধ্যে দিয়া বার্চ্চ বরাশ আন্দোলিত করিয়া বায়ুর মর্ম্মর এইবার তার সরোষ হুঙ্কারে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। অপরাহ্ণের সূর্য্য পাহাড়ের অন্তরালে পূর্ব্বেই লুকাইয়াছিলেন, এখন মেঘ-জটাজূটের আড়ালে দিবসান্তের শেষ আলোটুকু ঢাকা পড়িয়া শ্যামল-স্নিগ্ধ মেঘালোকিতা প্রকৃতি গভীর অন্ধকারের নিকষে ঢাকা পড়িয়া আসিলেন।

কালবৈশাখীর ভীম ঝটিকা অট্টহাস্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

মেয়েটীর থাকা সেই ঘরের মধ্যে বাহিরের অন্ধকার নিবিড়তর হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হারমোনিয়মের সাদা কালো 'রীড'গুলা সে অন্ধকারে মিশিয়া একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। মেয়েটী বারেক গান বন্ধ করিয়া সেই বর্দ্ধমান-বাতাসের শব্দে ভরা অন্ধকারের দিকে ব্যাকুল হইয়া চাহিয়া থাকিয়া, তার পর আবার আস্তে আস্তে বাজনায় 'কর্ড' দিয়া মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল "এসহে এস হৃদয় হরা, এসহে আঁখি শীতল করা"—

রৌদ্রদগ্ধ দিবসান্তের সারা দীর্ঘদিনের তপস্যার ফল স্বরূপে তার সমস্ত তাপদাহ জুড়াইয়া সকল গ্লানি ধোয়াইয়া দিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিয়া

আসিল। হঠাৎ মেয়েটী বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া দরজার সাম্‌নে ছুটিয়া আসিল,—ঘোড়ার পায়ের শব্দ সে এত ঝড়-জলের শব্দের মধ্য হইতেও শুনিতে পাইয়াছিল।

"বাবা!"

"আরতি!"

বৈদ্যুতিক আলোকোচ্ছ্বাসে ঘর ভরিয়া উঠিল।

"ওরে মঞ্জু, বাবা এয়েচেন রে। ওরে শীগ্‌গির করে ছোটুসিংকে চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বল। মামিমা, ও মামিমা! বাবা বড্ড ভিজে এয়েচেন, তুমি খাবারগুলো শীগ্‌গির গরম করতে দাও। উঃ কি রকম ভিজেচ তুমি? আর এই ঝড়ে জলে কোন মানুষে কক্ষনো এমন পাহাড়ে রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে ওঠে? ঘোড়াটা যদি ভড়কিয়ে গিয়ে ছুট্‌তো? এত বড় হ'লে, কিছু ভেবে চিন্তে কাজ করতে পারো না? ভারি অন্যায় কিন্তু এ-সব!"

অতুলবিহারী তাঁর আর্দ্র বেশভূষা পরিত্যাগ ঐ মেয়েরই সাহায্যে করিতে করিতে কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা রে! খুব দোষ হয়ে গ্যাছে। এবারকার মতন থেমে যা' তো! এর পরে আর যদি কোন দিন এ রকম করি, তখন খুব করে বকিস্, কেমন?"

মেয়ে বাপের গা হইতে তাঁর ভিজা কোট খুলিয়া লইয়া অপ্রসন্নমুখে সেটার হাত দুইটা ধরিয়া একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলাইয়া দিবার জন্য লইয়া যাইতে যাইতে এই কথা শুনিয়াই ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা বই কি! হ্যাঁ! তুমি কি না একটুও কিছু মনে রাখো! এই সেদিন টিহিরীর পথে চড়াই উঠবার সময় বল্লে না যে, আর রৌদ্রের সময় পাহাড় হাঁটবে না? আজ আবার এই ঝড়-বৃষ্টিতে ঘোড়ায় চড়ে এলে!—"

এক পায়ের ভিজা বুট খুলিয়া ফেলিয়াই অতুলবিহারীর মনে পড়িয়া

গিয়াছিল যে; অপর পায়েরটা শুদ্ধ খুলিয়া ফেলিলে এখনই তাঁহাকে তাঁর শাসনকর্ত্রী মেয়েটীর কাছে ভর্ৎসনার পাত্র হইয়া পড়িতে হইবে। অগত্যা অসুবিধা যতই হোক না কেন, তিনি আর নিজের অপরাধের মাত্রা বাড়াইয়া ফেলিতে ভরসা করিলেন না। সেই এক পায়ে ভিজা জুতা পরিয়াই সং সাজিয়া থাকিয়া মাত্র সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "সে ত রোদ, আর এ ত জল ;—দুটো তো আর ঠিক এক নয়! তুমি তো আর আমায় এর আগে কোন দিন বলে দাও নি যে জলের সময় ঘোড়ায় চড়তে পাবো না। আচ্ছা বলো, বলেছিলে কি? যদি বল্‌তে, তাহলে রাগ করতে পারতে।"

আরতি যতই রাগ করুক, বাপের এই কথায় না হাসিয়া সে থাকিতে পারিল না। তথাপি পাছে হাসিয়া ফেলিয়া অপরাধীর অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নামাইয়া হাসি লুকাইতে চেষ্টা করিয়া এবং যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে "এবার থেকে তোমায় আমি তাহলে একটা রুটিন বেঁধে দিয়ে, সেগুলো লিখে না দিলে দেখছি হবে না।"—এই বলিতে বলিতে বাপের পায়ের তলায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া তাঁর জুতার ফিতা খুলিতে মন দিল।

"না, সত্যি বাবা! লক্ষীটি! আর কক্ষনো এমন করো না। কি হ'তো বল দেখি! উঃ এই ঝড়-জলে ঘোড়াটা যদি ভড়্‌কাতো?—আর ওই বিদ্যুতের চমকানি আর মেঘের ডাক! তুমি কোন্ দিন না কোন্ দিন, কি যে একটা বিপদ ঘটিয়ে বস্‌বে!"

"না রে মা, না, কিচ্ছু হবে না, তুই যেমন আমায় তোর খোকাটী মনে করিস্, সত্যি তো আর তোর বাবা তা' নয়।"

"হ্যাঁ, তা নয় বই কি! ঠাকু'মা তোমায় এম্‌নি আদর দিয়ে দিয়ে মানুষ করেচে, যে, তুমি এখনও সেই ছোট্টবেলার মতন যত অগোছালো,

ততই অসাবধানী রয়ে গেছ! ঠাকু'মাকে যদি আমি একেবারের জন্যেও হাতে পেতুম!"—

"তাহলে কি করতিস্, মারতিস্?"

"সে তখন দেখাতুম!"

"কে দোর ঠেলচে না! হয় ত, কোন বিপন্ন লোক—"

"উহুঁঃ, ও বাতাস। ওই বলে তুমি কিন্তু কথা ফেরাতে পাচ্চো না, তা বলে দিলুম। এবার যেদিন—"

"না রে বাতাস নয়, মানুষ।—ঐ যে ডাকচে! রোস, দেখি কে হয় ত আশ্রয় চাইচে।—"

"হ্যাঁঃ, বাবার যেমন কথা! এই বৃষ্টিতে বিপন্ন হবার জন্যে কেউ না কি আবার পথে বেরোয়।"

বাস্তবিকই তাই। একটী বিপন্ন পথিক আশ্রয়প্রার্থী হইয়াই আসিয়াছিল। যেমন ভিজিতে হয় লোকটী তেম্‌নই ভিজিয়াছে। পরিধানে ইহারও সাহেবী বেশ। হ্যাট্‌টার হ্যাট্-জন্ম ঘুচিয়া গিয়া পুনশ্চ সোলা-জন্মেই প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আর সব জিনিষের দুরবস্থা যতই যা হোক, ভবিষ্যতে পুনঃসংস্কৃত হইবার তবু একটা ভরসা আছে,—এর আর সেটা নাই।

আরতি ইহাকে তার বাপের আদেশমত তাঁহারই একটা ধুতী পিরাণ গেঞ্জির সেট পাট ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া দিল। কিন্তু তার বাপের পরা জিনিষগুলি যে একজন যে-সে অন্য লোককে পরিতে দিতে হইতেছে, ইহাতে-সে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তার পর মনে মনে এই স্থির করিয়া তার মনটাকে সে ঈষৎ প্রসন্ন করিতে পারিল যে, না হয় এগুলা আর বাবাকে পরিতে দিব না। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী সে এই জিনিষগুলাকে যথাসাধ্য পুরাতন দেখিয়া বাছিয়া আনিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তার এই

অতি-সাবধানতার দরুণ যেটুকু দেরি হইয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাকে এ ঘরে ফিরিয়াই একটু অনুতপ্ত হইতে হইল। লোকটী শীতে কাঁপিতেছিল।

"অরু মা! একজোড়া মোজা, আর একটা ফ্ল্যানেল সার্ট চাই যে। আর একটা মোটা দেখে র‍্যাগ।—"

আরতি বাপের হুকুম যদিও নিঃশব্দে এবং ত্বরিতেই পালন করিল, তথাপি তার মনে হইল, সার্ট ও র‍্যাগ এদুটো যাহোক, গরম পশমী, মোজা দুটার আর কোন গতি করা চলিবে না। ঐ যার তার পায়ে পরা মোজা তো আর বাপকে পরিতে দেওয়া যায় না।

গরম চা দু পেয়ালা এবং তার সঙ্গে গরম গরম ঘরে-ভাজা কচুরি খান-কতক উদরস্থ করিয়া আগন্তুক লোকটী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে আরতির অনেক ছোট ভাই মঞ্জু এঘরে আসিয়া বাপের কোলটি দখল করিয়া লইয়া তাঁহার চায়ের পেয়ালায় ভাগ বসাইয়াছিল, এবং এই অপরাধের জন্য তার দিদির কাছে তিরস্কৃতও হইয়াছিল।

"মঞ্জু! যতই তোমায় খাওয়াই না কেন, বাবার থেকে ভাগ না বসালে তোমার যেন চলেই না, না? তুমি ভারি দুষ্টু হচ্চো!"

"টুমি ভাড়ি ডুষ্টু হট্টো।" বলিয়া মঞ্জু তার এই দিদিরই হাতের সুখসেব্য নধর দেহখানি বাপের কোলে এলাইয়া দিয়া তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিল,—দিদির কাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া একটু চুপিচুপি বলিল,—

"ডিডি বড্ড ডুষ্টু হট্টে, না, বাবা? মনূড় ডক্মী, না, বাবা?"—

"হ্যাঁ তা বই কি! মঞ্জু আবার লক্ষ্মী! একটুও না।" বলিয়া আরতি আসিয়া তার অত্যন্ত আদরের ছোট্ট ভাইটীর নরম ফুলের মতন গাল দুটি টিপিয়া দিয়া তাহাকে বাপের কোল হইতে টানিয়া লইল ও নিজের বুকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রগাঢ় স্নেহে চুম্বন করিল।

আগন্তুক এই মেয়েটীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। তার সরল ভ্রূদুটী ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বোধ করি বা অতবড় মেয়ের এতখানি বালিকাত্ব তার কাছে কিছু অসঙ্গত ও অনাবশ্যক ঠেকিয়া থাকিবে।

ছোট্ট মঞ্জু কিন্তু দিদির এই আদরে একেবারে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। তার সুন্দর মুখখানি ও উজ্জ্বল চোখ দুটী আনন্দে চকমক করিয়া উঠিল। "ডিডি! আমাড় ডিডি বড্ড ডক্ষী না বাবা?"

অতুলবিহারী ছেলের এই প্রশ্নে তাঁর এই দুইটী প্রাণাধিক স্নেহাধারের প্রতি যুগপৎ স্নেহ-গভীর দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দগাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন,—

"তোমার দিদি আমার মা লক্ষী, আর তুমি আমার সোনা।"

আগন্তুকের অধরে একটী ফোঁটা সূক্ষ্ম কৌতুক-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কণ্ঠ হইতে তার একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই উঠিয়া আসিল। হয় ত এমন নিবিড় প্রগাঢ় পিতৃস্নেহ সে কোন দিনই অনুভব করিতে পারে নাই।

সে রাত্রের সেই অজানা পথিকটী ইদানীং আর এ বাড়ীতে কাহারও কাছে অচেনা নাই। সলিলকুমার গুপ্ত সম্প্রতিমাত্র দেরাদুন হইতে মুসুরি পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছে। পথঘাট এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রকৃতির সঙ্গে তখনও তার ভালরূপে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংঘটিত হইতে পারে নাই, এমনই সময়েই হঠাৎ-আসা ওই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া বেচারী দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। 'মলে' কয়েকটা বাজার করিয়া ক্যামেল্‌স্ ব্যাক রোডে একটু বেড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখার পর বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঘটিয়া গেল উল্টা। এই মুক্ত স্থানের সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় একটা দেখিবার বস্তু হইলেও, সেদিন সে সৌভাগ্য এই নূতন আগন্তুকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। তাহাকে প্রথমে প্রচণ্ড ঝড়ে ও পরে প্রবল বৃষ্টিতে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হইতে হইল।

তা'হোক, এর শেষ ফলটা বড় মন্দ হয় নাই! কথায় বলে 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। সলিলেরও এই সলিলার্দ্র শীতার্ত্ততার যে শেষ পরিণামটী ঘটিয়া গেল, তাহাতে তার আর সোলা হ্যাটের দুঃখ বা জলে ভেজার কষ্ট মনে রহিল না। গরম কাপড়ে মুড়িয়া গরম খাবারে তৃপ্ত করিয়া, উত্তপ্ত সহানুভূতি ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে প্রীতি দিয়া অতুলবাবু তাহাকে একেবারে একরাত্রেই নিজের ঘরের লোকটী তৈরি করিয়া ফেলিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছিল। ঝড় জলের সেরাত্রে আর থামিবার মতলব ছিল না। একজন যদিই বা তার অশান্তপনা একটুখানি কমায় তো আর একজন যেন কাউন্সিলের বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তার মত হাত পা নাড়িয়া চীৎকার ছাড়িয়া উঠে। অগত্যাই সলিলকুমারকে বাধ্য হইয়াই সেরাত্রে অচেনা পরিবারের মধ্যেই আশ্রিত থাকিতে হইল! রাত্রের আহারে অতুলবাবু তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়াই বসিয়া থাকেন। সেদিন এই অজানা পথিককে তাদের সঙ্গে বসিতে হওয়ায় আরতি একটুখানি যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে একটুখানি ইতস্ততঃও করিল; কিন্তু শেষটায় তার মনের মধ্যের দ্বিধা সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল সলিলকুমারেরই কুণ্ঠাবিহীন আত্মীয়তায়। সে বোধ করি উহার ঐ চলচিত্ততা লক্ষ্য করিয়া সহজ সরলতায় তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল ও বলিল,—

"আমায় না হয় আলাদা করে খেতে দিন না? এতে হয় ত আপনার পক্ষে একটু অসুবিধা বোধ হচ্চে।"

শুনিয়া অতুলবাবু একান্ত বিস্ময়েরই সুরে কহিয়া উঠিলেন, "অসুবিধে বোধ হচ্চে! কার? আরতির? না না, কে বল্লে? কিচ্ছু অসুবিধে হয় নি তো। হয়েছে রে?"

অগত্যাই আরতি তার বাপের কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি ঈষৎ অসন্তোষ বোধ করিয়াও তাঁর এবং নিজের দুজনকারই মান রাখিতে মৃদু হাসিয়া—

"না অসুবিধে আর কি ?" বলিয়া তাঁদের মধ্যেই নিজের আসনকে স্বীকার করিয়া লইল।

সারারাতের মাতামাতির পর পাগল প্রকৃতি ভোরের বেলায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছিল। প্রবল জলস্রোতে ধুইয়া গিয়া পর্ব্বত-গাত্রের ধূসরতা যেন সুকোমল নীলিমায় ঘন মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। উন্নতশীর্ষ দেবদারুর দল স্নিগ্ধ শ্যামলতায় যেন ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল। বরাশ-গাছগুলার পাতার ও লালফুলের থোকায় আজিকার এই সদ্য জলধৌত সুপ্রসন্না প্রকৃতির অভিনন্দন যেন ভালই সাজিয়াছিল!

অতুলবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়িয়া গেল, তাঁর গত রাত্রের অতিথিকে। একটুখানি ব্যস্তভাবে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া নিচে নামিয়া আসিতেছেন, আরতি আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—"বাবা!"

"কি রে?" বলিয়া অতুলবাবু মুখ ফিরাইলেন। অবশ্য যাওয়া বন্ধ রাখিয়া,—

"চা-টা খেয়ে গেলেই হতো না?"

অতুলবাবু বলিলেন "সলিল রয়েচে যে, একসঙ্গেই দুজনে খাব। দেখি গে' সে উঠেছে কি না।"—এই বলিয়া তিনি পুনশ্চ গমনোদ্যত হইলেন।

আরতি বলিল "অত ব্যস্ত হচ্চো কেন? শোনই না বলি! ঐ উনি আছেন বলেই ত তোমায় আলাদা করে চা' খেতে বলচি, না হলে আর বলচি কেন? তুমি তো জানো যে তোমার বাইরের লোকের সাম্‌নে ভাল খাওয়া হয় না।"

"কে বল্লে? উহুঁঃ, তা কেন হবে না? আর সলিল, ও এম্‌নিই কি বাইরের লোক? ও থাকলে খাবার ব্যাঘাত কেন হবে? তোর যেমন ভাবনা!"

আরতি বাপের কথায় হাসিয়া ফেলিল। "এর মধ্যে উনি বুঝি

তোমার ঘরের লোক হয়ে গ্যাছেন? বাবা তুমি যাকে দেখো তাকেই ঘরের লোক খুব শীগগির তৈরি করে নিতে পারো কিন্তু! একেই বলে 'বসুধৈব কুটুম্বকং' না?"

অতুলবাবু মেয়ের কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "উহুঁঃ, তা কেন? তবে কি না ছেলেটীকে আমার ভালই লেগেচে, খাসা ছেলে! তার উপর স্বজাতি!"

আরতি এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া "তোমার আবার কাকেই বা কবে ভাল না লাগে বাবা?"—এইটুকু বলিয়া এবার তার বিপন্ন বাপকে মুক্তি প্রদান করিল।

সলিলকুমারেরও ইতিমধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। সে তখন যাত্রার জন্য উৎসুক হইয়া তার আতিথ্যকারীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। শুনিয়া অতুলবাবু কহিলেন,—"সে হয় না। সে কি কখন হয় বাপু! আগে চা-টা খাও, ভাল করে আলাপ-টালাপ হোক, তার পর দুজনে তখন বেড়াতে বেড়াতে তোমার বাসায় যাওয়া যাবেখ'ন। তোমার বাসাটা কোথায়?"

সলিল বলিল, "ল্যাণ্ডোর বাজারের খুব কাছেই। ঐ যে খুব বড় একটা পিতলের সাইনবোর্ড আঁটা দোকান আছে, তারই সাম্‌নের ছোট্ট বাড়ীখানায় আপাততঃ এসে উঠেছি।"

অতুলবাবু ইহা শুনিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "সে ত আমার চেনা। কিন্তু ও-যায়গাটা তো তেমন ভাল নয়! বাসাটী বেশ পছন্দমতন হয়েচে ত?"

সলিল কহিল "আজ্ঞে না, ওটা তো আমার বাসা নয়, ও আমার একটী আত্মীয়ের বাড়ী। তাঁরা এখন দেরাদুনে রয়েছেন, বাড়ীটা খালি পাওয়া গেল, তাই এসে উঠেছিলুম। বাসা একটা দেখে শুনে নিতে হবে।"

এই খবরটায় অতুলবাবুকে হঠাৎ অত্যন্ত খুসী করিয়া তুলিল। তিনি সোৎসাহে ও সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন,—

"তাই না কি! তা হলে ত ভালই হয়েচে! আমাদের পাশের এই 'থরন্ ভিলা'য় এলেই তো হয়? খাসা বাড়ী! যেন ছবিখানি! ভিতরটাও ভাল। একদিন আরত্তির খেয়ালে পড়ে ওকে নিয়ে ওর মধ্যে বেড়াতে গেছলুম যে! তারও তো খুব পছন্দ হয়েছিল। এই তারই মুখে শুন্তে পাবে—আরতি! শুনে যা' তো মা!"

"কি বাবা!" বলিয়া আরতি একটু পরেই ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চা তৈরি হয়েচে, এইখানেই কি আন্তে বলব?"

অতুলবাবু কহিলেন "উঁহুঃ, তা কেন? ঐ বারান্দাতেই যাওয়া যাক্ না। ওখান থেকে সূর্য্যোদয়টাও অতি চমৎকার দেখা যায়! আপনি তো এই নতুন এসেচেন, দেখেন নি বোধ হয় এখনও? উত্তরটা সমস্ত খোলা কি না, পাহাড়ের রেঞ্জগুলো যেন ঢেউ তুলে তুলে বয়ে যাচ্চে! খুব দূরে বরফ রেঞ্জের উপর রোদের আভায় মধ্যে মধ্যে যেন শান দেওয়া ইস্পাতের ছুরী কি বিদ্যুতের মতন একটা চোখ-ঝলসানো দীপ্তি স্ফুরিত হয়ে উঠ্‌চে! দেখলে মন যেন কোথায় তলিয়ে যায়!"

কি জন্য মেয়েকে ডাকা হইয়াছিল, সে কথা বাপের আর মনে ছিল না, মেয়েরও উহা বাপকে স্মরণ করাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না। সে জানিত যে তার বাপ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদাই একটা অছিলা লইয়া তাকে ডাকাডাকি করিতে ভালই বাসেন।

"থরন্‌ভিলা" নাম দেওয়া হইলেও, সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ছবিটীর মতন বাড়ীখানিতে কাঁটার মধ্যে শুধু দুএকটা গোলাপ গাছেই যা সঙ্গত মতন কাঁটা ছিল, তার চেয়ে বেশি কোথাও না। যেমন এ দেশের প্রায় সব বাড়ীই হয়,—পিছনে পাহাড়ের উঁচু দেওয়াল, সাম্‌নের দিকে 'খড়ে'র পরিখা। তার মধ্যে দিয়া কতকগুলা উচ্চশীর্ষ বার্চ্চ ও চিড় গাছ খাড়া হইয়া যেন পাহারাওয়ালার মতন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খানিকটা দূরে একটা খুব ঝাঁপ্‌ড়া-ঝোপড়া বরাশ গাছ তার বাসী স্থলপদ্মর মতন ঘন গোলাপী রংয়ের রাশি রাশি ফুলের বাহার খুলিয়া দিয়া খোস-মেজাজে খুসী মনে বাতাসে নড়াচড়া করিতেছে। সেই একটা গাছের ফুলেই যেন ফাল্গুনের ফাগের উৎসব সমাধা হইয়া গিয়াছে। এম্‌নি তার অগুন্তি অসংখ্য ফলন! বাগানের বেড়ার গায়ে একটী সাদা গোলাপের লতা এই সবেমাত্র একটুখানি লতাইয়া উঠিয়াছে; গোটাকয়েকমাত্র কুঁড়ি তাহাতে ধরিয়াছে ফুল এখনও একটাও ফোটে নাই।

অতুলেশ্বর বাবু সলিলের বাসায় গিয়া তাগাদা করিয়া তাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া এই বাড়ীখানাই তাহাকে পছন্দ করিতে বলিলেন।

বাড়ীখানা অ-পছন্দ করিবার মত কোন সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও সলিল একটুখানি ইতস্ততঃ করিল। বাড়ীটার এদিক ওদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিল, "একটু ছোট হবে না?"

অতুলবাবু শুনিয়া যেন অবাক হইলেন, এমনই ভাবেই কহিলেন, "ছোট হবে! বলেন কি? ছোট কেমন করে হবে? ছোট তো

হ'তেই পারে না! এতগুলো ঘর রয়েচে, এতেও আপনার ছোট হবে মনে হচ্চে কেমন করে বলুন তো?"

সলিল একটু কুণ্ঠিত ভাবে কাসিল। তার পর গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিল,—"আমার একলার পক্ষে নিশ্চয়ই ছোট হবে না; বরং বড় হবে, বল্লেও বলা যেতে পারতো। তবে যদি মা কিম্বা দিদি এঁরা কেউ, অথবা দুজনেই আসেন, সেই জন্যেই একটু ভাবচি।"

এতক্ষণে এই ছোট হওয়া কথাটার অর্থবোধ করিতে পারিয়া অতুল-বাবু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, সে আগে তাঁরা আসুনই তো,—তখন তার জন্যেও সুব্যবস্থা হয়ে যেতে আটকাবে না। আপাততঃ ওই ল্যাণ্ডোর-বাজারের ঘিঞ্জি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তো এখানের এই সুন্দর সানন্দ খোলা জায়গাটাতে এসে আত্মরক্ষা করে নিন। শাস্ত্রেই বলে রেখেছে যে,—'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ!' আমি শাস্ত্রবাক্যের আর যত যা' মানি বা না মানি, এইটুকুকে হাড়েহাড়েই মেনে চলি। 'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ'—এটা কিন্তু বড্ডই দরকারী কথা! আত্মরক্ষা না করলে, জগতে আর করতে পারবার রইলো কি? নিজে বজায় থাকলে তবেই না আমার পুত্র, দারা, ধন রইলো! নৈলে কে' কার বলুন তো?"

সলিল হঠাৎ এই দার্শনিক তত্ত্বের জন্য তেমন প্রস্তুত ছিল না; সে তখন উত্তরের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া মুগ্ধচিত্তে সেই অনন্ত তরঙ্গায়িত মেঘপুঞ্জ সদৃশ ঘনায়মান পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছিল। দূরে—দূরে—বহুদূরে উহাদেরই সবচেয়ে শেষ-স্তরে অস্তসূর্য্যের স্বর্ণ কিরণে দূর-প্রসারিত দৃষ্টির তলায় ক্ষণে ক্ষণে এক অপরূপ দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন শত শত সুরকন্যা ঐ দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-সমাবাসিত দেবতাত্মা হিমাচলের ঐ সুদূর প্রান্তে তাঁদের সান্ধ্য-বিচরণ সমাধা

করিতেছেন। উহাঁদেরই স্বর্ণসূত্র-খচিত রজতাম্বরের ঝিলিমিলি, বিশুদ্ধ কাঁতে স্বর্ণ-ভূষণের অজস্র হীরকদ্যুতি এই অপরাহ্নের অস্তরাগে মুগ্ধ দর্শকের নেত্রে অমন করিয়া ঝিলিক্ হানিতেছে! তুষার-পর্ব্বতের শৃঙ্গ বলিয়া উহাদের চেনা না থাকিলে বিস্ময়ে সহসা যেন চমকিয়া উঠিতে হয়।

অতুলেশ্বর বাবুর কথা কাণে ঢুকিলেও সলিলের সেটা ঠিক মনে ঢোকে নাই। সে শুধু তাঁর ঐ শেষ কথাটার, অর্থাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটুকুরই উত্তর সমাধা করিয়া জবাব দিল,—"তা' তো বটেই!" বলিয়া আবার সেই রূপসাগরেই ডুব দিয়া রহিল।

অতুলবাবুও তার দৃষ্টির অনুসরণে ঐ দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। সূর্য্যের আলো ক্রমেই সন্ধ্যা-ছায়ায় মিলাইয়া আসিতে থাকায়, দূরের সেই অপরূপ জ্যোতিচ্ছটা একটা মিশ্রালোকের মধ্যে পড়িয়া যেন ক্রমশই ম্লান হইয়া আসিতেছিল। নূতন উজ্জ্বল পালিশ করা গহনা যেন ব্যবহার-ম্লান, নূতন শাড়ী যেন পরিত্যক্ত পুরাতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। ঐ দিকে চাহিয়াই অতুলবাবু বলিলেন, "ও কি দেখচেন! দেখতে হয় ত সকালে! সে এক গ্র্যাণ্ড দৃশ্য! বিশেষ দিনটী বেশ পরিষ্কার থাকলে ত আর কোন কথাই নেই! এই বাড়ীর ঐ উত্তর দিককার বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতেই হিমালয়ের ঐ সুদূর উন্মুক্ত উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তটাই স্পষ্ট দেখতে পাবেন।"

সলিল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তাহলে এই বাড়ীটাই নেওয়া যাক। ওঁরা যদি আসেনও, কোন রকম করে কুলিয়েও যেতে পারে। কিন্তু যে রকমের গতিক,—মা যে এখানে আসেন, তার ভরসাও খুব বেশী কিছু দেখতে পাই নে।"

অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা বর্ত্তমান?"

সলিল নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। তার মুখে বিষাদের

একটা ক্ষীণ ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সে একটুক্ষণ গম্ভীরভাবে দৃষ্টি নত রাখিয়া পরক্ষণে আবার সেই গন্ধর্ব্ব-লোকের মতই অত্যাশ্চর্য্য স্বর্গপুরীর অভিমুখে প্রত্যাশিত নেত্রদ্বয় ফিরাইল। কিন্তু কোথায় সে সব! মৃগ-তৃষিকার মত, ছায়াবাজির মত সেই অপূর্ব্ব-দর্শন অলকাপুরী, কি স্বর্গ-অপ্সরাদের নৃত্যসভা,—কিম্বা ওই ধরণের সেই আরও কোন কিছু—সে যেন কোথায় অন্তধান করিয়াছে। আছে কেবল, সেই আসন্ন সায়াহ্নের পরিম্লান ধূসর ছায়াতলে, চির-অপরিবর্ত্তিত, ভারতবর্ষের দুর্গতোরণ স্বরূপ বিশাল-মূর্ত্তি নীল-কৃষ্ণ অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী! মহাসমুদ্রের বীচি-বিস্তারের মত তাহার যেন শেষ নাই, সংখ্যা নাই। একের পর আর এক—এম্‌নি করিয়া কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে বার্চ্চ ও চিড়ের শ্যামলতা তখনও সন্ধ্যা অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই, দূরের দেবদারু ও ঝাউবন তাদের ঘন শ্যামলিমার উপর অনন্ত নীলিমার আবরণ ঢাকা দিয়া সেই অসীম নীল সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে।

অতুলবাবু বলিলেন, "তা হলে এই বাড়ীটাই নে'ওয়া ঠিক হলো ত? কাল সকালেই আমি বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে তাহলে 'সেট্‌ল' করে ফেলবো। কদ্দিনের এগ্রিমেণ্ট করা যাবে বলুন তো? পুরো সিজনের ভাড়া নিশ্চয়ই ওরা চেয়ে বসবে। তবে সেটা আমি এবারে আর দিচ্চি নে'। আমার বেলা ওরা তাই করিয়ে নিয়েছে বটে, তা' তখন তো আর এসব জানা ছিল না, তিন মাসের ভাড়া নিয়েও অনেকে দেয়।"

বাড়ীটার ভিতর বাহির দেখিয়া লইয়া দুজনে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। অতুলবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, একটা কাজ করলে তো হয়!"

সলিল জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল। হঠাৎ কি কাজ যে কাহাকে করিতে হইবে, তাহার কিছু আন্দাজ সে পাইয়া উঠিল না। অতুলেশ্বরবাবু

বলিলেন, "একলা আর ওখানে কি করতে ফিরে যাবে? রাতটা এইখানেই কাটিয়ে কাল সকালে একেবারে নিজের নূতন বাসায় গিয়ে উঠ্‌লেই ঢুকে যেতো। সেই ভাল না?"

সলিল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "না না, তার তো কিচ্ছু দরকার নেই। অনর্থক আবার আপনাদের অত বিব্রত হওয়া কেন? আমি ওখানেই যাচ্ছি—"

অতুলবাবু গম্ভীর মুখে বাধা দিলেন,—"দেখুন সলিলবাবু! বিব্রত আপনি আমায় না করতে ইচ্ছুক থাকলে আর হবে কি? আমার স্বভাবটাই কেমন যেন বিব্রত হ'বার জন্যে উৎসুক হয়েই বসে রয়েছে। আপনাকে একলাটী সেই ল্যাণ্ডোর বাজারের কোটরটুকুতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আজকের রাত্রের মতন যা হবো, আপনাকে নিয়ে বিব্রত হওয়া তার চাইতে যে মন্দ, তা ঠিক আমায় চেনা থাকলে আপনার মনে হতো না। আমার আজকাল ওইটেই একটা রোগের মতন হয়ে দাঁড়িয়েচে। মনটা যখন যেদিকে ঝোঁকে, সেদিক থেকে আর তাকে যেন টেনে সরিয়ে আনতে কিছুতে পেরে উঠি নে'! তা' আমার ছোট-মা কিন্তু সে কথাটা মান্‌তে চায় না। সে বলে 'না বাবা! ও তোমার রোগটোগ নয়। একলা মায়ের আদুরে-গোপাল ছেলে ছিলে কি না,—যখন যা' ধরেছ, না করে তো আর ছাড়ো নি। ঠাকুমাটীও তোমার সকল আবদার শুনে শুনে তোমায় একরোখা তৈরি করে তুলেছে। এখন বিশ্বের লোক তো আর আমার ঠাকুমা নয়; তারা তোমার খেয়ালের সঙ্গে সায় দিয়ে চলবে কেন? কাজেই তারা যখন তোমার আবদারের অবাধ্যতা করে, আর তুমি নিরুপায় হয়ে পড়ো, তোমার তখন অনভ্যাসের অস্বাচ্ছন্দ্যটাকে অসুখ বলেই মনে হয়।'"

বলিয়া হাসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তা দেখুন সলিলবাবু! মেয়েটা হয়

ত নেহাৎ মিথ্যে বলে নি। কতকটা তাই বটে! ছোটবেলায় বাপ-মায়ের মরা-হাজা ছেলে ছিলুম, মা বেটী আমায় বড়ই সন্তর্পণে মানুষ করেছিল। সে যে কি যত্নেই রেখেছিল,—গুরুসেবা, ঠাকুরসেবা মানুষে অত ক'রে করে না। স্বভাবটা সেই বিগড়ে দিয়েচে বই কি কতকটা! যখন যা চেয়েছি, অসঙ্গত হলেও যোগান দিয়েচে। লেখা-পড়াও তো ঐ করেই বেশি দূর হয়ে ওঠে নি। এল-এ পাশ করে অনার নিয়ে বি-এ পড়ছিলেম। ঐ সময়ে মা খুব ঘটা করে বিয়ে দিলে। বউ, তা খুব রূপসী বউই মা নিজে দেখে-শুনে দু' বচ্ছর ধরে বেছে বেছে ঘরে এনেছিল। এখন বলতে লজ্জাও করে,—কলেজে গেলে বউএর কাছে থাকতে পাই নে' বলে ছুতোনাতা করে কলেজ যাওয়া বন্ধই ক'রে দিলুম। মাও বল্লে, শরীর যখন ভাল থাকচে না, তখন কাজ কি অমন পাশ করায়। ছেড়ে দে!—শুধু যেদিন কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এসে বসলুম, সেদিন শুধু সেই নতুন বৌটাই কেঁদে ফেলেছিল।—একেই বলে যার জন্যে চুরী করি, সেই বলে চোর! কি বলেন?"

মানুষ যে এতখানি সাদাসিদা হইতে পারে, সলিলের বোধ করি এর আগে তা' জানা ছিল না। সে এই অতি সামান্য সময়ের পরিচিত, অথচ এখনও ভাল করিয়া পরিচয়ে না আসা লোকটীর সরলতা ও অমায়িকতায় প্রশংসা-বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া, ইঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিবার না পাইয়া, ধীরে ধীরে কহিল, "আপনার ওখানেই যাই চলুন। কিন্তু একবারটী যে ভজহরিকে খবরটা দিয়ে আসতে হবে। একে তো কাল রাত্রে না যাওয়াতেই সে কেঁদে কেটে এক করেছে,—আজও খাবার নিয়ে বসে থাকবে।"

অতুলবাবু হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার আপনার আর যাবার দরকার নেই। আমি খবর দিয়ে লোক পাঠাচ্চি।"

৫

বাড়ী ফিরিয়া সাম্‌নের সেই ঘরখানায় পা দিতে না দিতেই ছোট্ট বুটজুতার খুটখাটের সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর শিশুকণ্ঠের কলস্বর শ্রুত হইল, "বাবামণি! ডিডি টোমাটে বড্ড ডাগ করেটে—টুমি কি আড টা ঠাবে না?"

অতুলবাবু সহাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মঞ্জুর আপেলের মতন রাঙ্গা গাল দুটী আদরভরে টিপিয়া দিয়া তার দাড়ী ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "তোমার দিদিকে বলে এস মঞ্জু! আমরা দুজনে চা খাব বলে' একটু দেরি করে এসেছি। বলে এস, সলিলবাবু রাত্রেও এখানে খাবেন।"

মঞ্জু বাপের আদেশ শুনিয়াই তাঁহার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দ্বারের বাহিরে সলিলকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহাকে চিনিতে পারিয়াই সে একটা সু-উচ্চ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল,—

"বাবু! বাবু! টাল্‌টের ঠেই বাবু! ডিডি! ঠোন্"—বলিতে বলিতেই সে ভিতর বাড়ীর দিকে ছুটিল।

"আসুন!" বলিয়া সলিলকে ডাক দিয়া অতুলবাবু চিমনির ধারে একখানা ইজিচেয়ারে হাত পা মেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। "এই যে এই কৌচখানায় ভাল করে বসুন না,—একটা সিগার?"

সলিল, তার টুপিটা ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে, আর ছড়িটা একটা দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া গৃহস্বামীর নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সিগারের নিমন্ত্রণে একবার হাতটা বাড়াইয়াই ঈষৎ যেন কুণ্ঠা-বোধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "না, থাক—"

"চলে তো ?"

সলিল চুপ করিয়া রহিল।

"তা'হলে দোষ কিছু নেই। বয়সে আমি আপনার চাইতে অনেক বড় বটে, তবে এখনকার দিনে নিজের বাপ দাদার সাম্‌নেই চল্‌চে, তা আমি তো কোথাকারই কে! সেকালে তবু নল্‌চে আড়াল দিয়ে খাওয়ার একটা কথা ছিল। এখন সে সবেরও পাট নেই। বেপরোয়া! আর মশাই! বেটাছেলের কথা তো ছেড়েই দিন,—তারা তো চিরদিনই এসব নেশা-ফেশা করেই থাকে। এখনকার হালফ্যাসানে মেয়েরাই সিগারেট, সিগার ধরেছেন। ভদ্রঘরের সব মেয়ে মশাই! দিব্যি সভাস্থলে দাঁত দিয়ে সিগার চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে এলুম। এতে তাঁদের পক্ষে লজ্জার কোন কারণ আছে বলেও তাঁরা মনে করচেন না। তা' আপনার আবার লজ্জা কিসের ?"

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সলিল আর লজ্জার কারণ পাইল না ; কিন্তু একটু সলজ্জ ভাবেই সে আতিথ্যকারীর হাত হইতে তাঁহার প্রস্তাবিত হাভানা সিগার তুলিয়া লইয়া দেশলাই জ্বালিল।

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপানের পর সলিলই এবারে কথা কহিল, "আমারও তাহলে একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে।"

"কি কথা রাখতে হবে বলুন ? আপনার বাসা ঠিক হলে সেখানে গিয়ে চা, চুরুট, কেক, বিস্কিট, পান, তামাক আরও যা যা দেবেন, খাওয়া তো ? তা' তাতে আমি খুব রাজী আছি। সে আপনি আমায় বল্লেও আমি যাব, আর না বল্লেও যে যাব না তা'ও মনে ভরসা করবেন না।" বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সলিল বলিল, "সে তো হবেই, সে আর আমি আপনাকে বেশি করে বল্‌বো কি ? এও যেমন, ও ও তো তেমনি আপনারই বাসা। আপনিই

তো আমায় আন্‌চেন। তা' না, আপনি আমায় আপনি বলচেন কেন ? ওটা তো ঠিক বলা হচ্চে না। তুমি বলাই আমার ভাল লাগবে।"

অতুলবাবু তাঁর মুখ হইতে সজোরে একরাশি ধূম্র নিজের বাঁ পাশের দিকে ছাড়িয়া দিয়া সেদিকটাতে একেবারে পার্ব্বত্য কুজ্মটিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়া তার পর হাসিয়া বলিলেন, "এই! বেশ তো, সেই যদি তোমার কানে ভাল শোনায়, তাই না হয় বলা যাবে। তার জন্যে আর হয়েচে কি ? কি রে আরতি! কই মা, তোর আজ এত দেরি যে!"

"হুঁঃ, দেরি বৈকি! নিজেই সাত ঘণ্টা দেরি করে এলেন! এখন, 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ'!" বলিতে বলিতে গত রাত্রের সেই বিদ্যুচ্চপলা মেয়েটী একটী তড়িৎ শিখার মতই ঘরের মধ্যে স্ফুরিত হইয়াই মুহূর্ত্তে যেন তেমনই করিয়াই স্থির হইয়া গেল। ও মা! মা গো! ছি-ছি-ছি! বাবার সঙ্গে যে অন্য লোক বসে রয়েচেন! হ্যাঁ তো! মঞ্জু যে সে কথা বলিয়াও ছিল! সেই গত রাত্রের বৃষ্টিতে-ভেজা লোকটীই না ? তাই তো! সেই তো বটে! আরতি কাপড়ের আঁচলখানা একটু ঠিক করিয়া লইয়া পিছন দিকে চাহিল—তাদের পাহাড়ী চাকর রাম সিং চায়ের ট্রে লইয়া আসিতেছে কি না।

ইত্যবসরে সলিলকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামী-কন্যাকে স্বাগত জানাইল। তার সেই বিনম্র নমস্কারের উত্তরে আরতিও দু'হাত যোড় করিয়া তাহার অগ্রভাগ নিজের নত মস্তকে ঠেকাইয়াই একটুখানি সলজ্জ হাসিয়া কহিল,—

"বাবা বুঝি আপনাকে টেনে এনেছেন ? বাবার হাতে একবার এসে পড়লে আর রক্ষা নেই।"

সলিল তার চুরোটধরা হাতখানাকে পিছন দিকে লুকাইয়া রাখিয়া খাড়া থাকিয়াই এই কথার উত্তরে ঈষৎ হাসিল, কহিল, "না—উনি টেনে

আনবেন কেন? আমি আপনিই ওঁর স্নেহের টানে ছুটে এসেছি। একটুখানি থামিয়া, আরতির ততক্ষণে চা তৈরির জন্য নিবিষ্টভাবে টেবিলের পাশে দাঁড়ান মূর্ত্তি একটী মুহূর্ত্তের জন্য স্থির চক্ষে চাহিয়া দেখিয়া পুনশ্চ কহিল,

"এসে হয় ত আপনার অনেক কাজ বাড়িয়ে ফেল্লুম! হয় ত এর জন্যে অনেকখানি অসুবিধে আপনাকে সইতে হবে। কিন্তু—"

আরতি বিস্মিত-স্মিতমুখে মুখ তুলিয়া অতিথির মুখের দিকে চাহিল, "আমার আবার কিসের কাজ বাড়ালেন? সে যদি কিছু বেড়ে থাকে তবে সে আপনারই বেড়েচে। না বাবা?"

আরতি এইটুকু বলিয়াই মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল, এবং সেই গূঢ় হাস্যে উদ্‌ভাসিত মুখখানাতে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্যের প্রভাব টানিয়া আনিয়া নতমুখে চা-দানীতে চামচে করিয়া চিনি মিশাইতে লাগিল।

অতুলবাবু বিস্ময়াধিক্যে তাঁর অর্দ্ধ-শয়ানাবস্থা হইতে অর্দ্ধোত্তোলিত গাত্রে কহিয়া উঠিলেন, "আমায় বল্লি? আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লি? হ্যাঁ রে মা! আমি কেমন করে বল্‌বো বল্ ত? কি ওঁর কাজ এখানে আসার জন্যে বাড়লো? হ্যাঁ সলিল! তুমি কিছু বুঝতে পারলে?"

সলিল যদিও কিছুমাত্র বিস্মিত হয় নাই, তথাপি সে চেষ্টা-কল্পিত বিস্ময়েরই সুরে প্রত্যুত্তর দিল, "কেমন করে পারবো বলুন? আমি তো জ্যোতিষ জানি না।"

"নাও বাবা!—উঠে এসে চা খাবে, না ঐখানেই দিয়ে আসবো বল? শুয়ে শুয়ে চা খেলেই কিন্তু তুমি একটা না একটা আক্‌সিডেণ্ট করে বস্‌বে! হয় গরম চায়ে হতে পোড়াবে, না হয় তো স্যুটটায় দাগ ধরাবে, না হয়—"

"তুই বড্ড বেশী বলছিস্ বুলু! অত কিচ্ছু আমি কিন্তু করিনে।

মোটে সেই এক দিন একটুখানি হাত পুড়িয়েছিলুম, আর একটী দিনই না সেই পাঁশুটে সুটটার ওপোর, সেও নেহাৎই সামান্য, তা' ধোপাবাড়ীতে তারও খানিকটা ফিকে করে দিয়েছিল, কিন্তু তবু তুমি দুষ্টু মেয়ে যখন তখন আমায় খোঁটা দিতে ছাড়বে না।"

আরতি হাসিয়া বাপের ইজিচেয়ারের পাশে রাম সিং স্থাপিত ছোট্ট বেতের টেবিলটার উপর তাঁহার চায়ের পিরিচ-পেয়ালা স্থাপন করিতে করিতে তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সহাস্যে কহিয়া উঠিল, "তবে দুঃখের বিষয় যে সেটা আর পরাই চল্লো না। তা যাগ্‌গে—এখন তুমি চা খাও। একে তো এই সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এই যে আপনি নিন্। বিস্কিট আর দুখানা কেক? স্যাণ্ডউইচ একটু? কিচ্ছু না? মঞ্জু! এই মঞ্জু!"

ভিতরের দিক হইতে মঞ্জুর সাড়া আসিল "টি? ডিডি?"

আরতি সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "চা খাবি না?"

"আমি ডে এট্টা ডান টট্টি!—ঠুন্‌বে? টবে ঠোন, 'টটো আঠা ট'ড়ে টোমাড়ই ডুয়াড়ে ভিঠাড়ীড় বেঠে এঠেটি'—টাড়পড় টি ডিডি? 'ঠোল ডাড় ঠোল টোলো মুখ টোল, ডেট ডেট ঠট টেঁডেটি',—টাপড়ে টি ডিডি?—"

"টা'পড়ে টিট্যু নয়! তুই এখন চা খাবি তো আয় দিকিনি?" স্নেহ-স্নিগ্ধ হাস্যের আভায় আরতির মুখখানি যেন মধুরোজ্জ্বল আরতি-প্রদীপের মতই দেখাইতেছিল। সহসা মুখ ফিরাইতেই তার চোখের উপর অপ্রত্যাশিত ভাবে পড়িয়া গেল, তাদের অতিথির চোখের দৃষ্টি। আরতি সে চাহনীতে কিছু যেন বিস্ময় এবং কতকটা যেন লজ্জাও অনুভব করিল। তাহাতে কি ছিল, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু আরতির এই সর্ব্বপ্রথম আজই মনে হইল, সে এখন বড় হইয়াছে। নিজের চোখের দৃষ্টি

সে সহসাই নত করিয়া লইয়া নীরবে ভাইএর জন্য তার ছোট প্লেটে খাবার সাজাইতে লাগিল।

সলিলকুমারও এতক্ষণে তার নিজের চা-পাত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিল; কিন্তু মনের মধ্যে তার তখনও সেই ট'কারের চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল;—

"কত আশা করে, তোমারই দুয়ারে—
ভিখারীর মত এসেছি!"—

যে এই গান লিখিয়াছে, সে কি তার এই গত রাত্রের অবস্থার কথা নখ-দর্পণে দেখিতে পাইয়াই এটা লিখিয়াছিল? ভিখারীর মতন যদি সত্য সত্যই কেহ কাহারও দুয়ারে আসিয়া থাকে, তবে সে নিজেই তাই আসিয়াছে বটে! এর মধ্যে আর কষ্ট-কল্পিত কবি কল্পনা নাই। ভিখারীর মতই আসাটা হইয়াছে বটে, কিন্তু আশা সে কই কিছুই করিয়া আসে নাই, এখনও করিতেছে না। তবে ও রকম একখানি "মুখ" যদি বিধাতা তার জন্য "তুলিয়াই" ধরেন, তা' হইলে সে নিশ্চয়ই যে মুখ ফেরায় না, এ কথাটাও খুব নিশ্চিত। কারণ—মুখখানা খাসা মুখ!

৬

সলিলের মা আসিলেন না; তার দিদি ও ভগ্নিপতি ছেলেমেয়েদের লইয়া ভাইএর কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন। সলিলের মা এই অবসরে দাক্ষিণাত্যের কয়েকটী নামজাদা তীর্থ দর্শনের জন্য জনকতক বাছাইকরা সঙ্গী পাইয়াছিলেন; তাই সে সুযোগটাকে ছাড়িতে পারিলেন না। এদিকে ছেলেটীকে একা কোথাও পাঠাইয়াও তাঁর মনে শান্তি থাকে না।

কাজেই মেয়ে-জামাইকে ধরিয়া, জামাইকে এক মাসের ছুটী লওয়াইয়া, তাদের ছেলের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, তবেই নিশ্চিন্ত মনে নিজেও উল্টা দিকে বাহির হইতে পারিয়াছেন।

সলিল শুনিয়া মুখ ভার করিল। ঐ মতলবেই মা এবার তাহলে আমায় ঠেলেঠুলে একলা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এদিকে বলা হলো—সুন্দরার শরীর খারাপ, আমি তাকে নিয়ে পরে যাচ্চি! বেশ্! আর কখ্খনো কোন কথা কি না তাঁর আমি বিশ্বাস কর্‌বো!

সুন্দরা হাসিয়া ফেলিল, "তা' তুই নাই কর্‌লি,—আপাতক তো মা সেই কুমারিকা পর্য্যন্ত ঘুর্‌তে চল্লেন,—তার পর যখন যা হয় সে হবে।"

সলিল ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "কেনই যে মা এ রকম লুকোচুরি করলেন! আমায় জানিয়ে গেলেই হতো। আমিও তাহলে সঙ্গে যেতুম। আমারও দেখা হয়ে যেত।"

সুন্দরা কহিল, "ঐ ভয়েই তো এত লুকোলুকি রে! তুই যেতে চাইবি, আর মার শুদ্ধ যাওয়া হবে না। মা বল্লে, 'ওকে কোথায় নিয়ে যাব। আমি যাব তীর্থ করতে, পাঁচজন সঙ্গে থাকবে। সুবিধে আছে অসুবিধে আছে,—আজ এখানে কাল সেখানে করে পাঁচ-ঘাটের জল খাইয়ে কি শেষে ছেলেটাকে রোগে ফেলবো! তাই জন্যে আর ওকে এ কথা জানতেই দিইনি। ক'দিন দু'বেলা লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে, নিজে এসে এসে, তোর জামাইবাবুকে ছুটী নিইয়ে, আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি! মা বল্লে 'তোমরা ওর কাছে গিয়ে ওকে দেখলে শুন্‌লে তবেই আমি মন ঠাণ্ডা করে যেতে পারি, না হলে আমার যাওয়া অসম্ভব!' কাজেই আমাদের আসতে হলো।"

মায়ের প্রতি অভিমান মনের মধ্যে যেটুকু জমিয়া উঠিতেছিল, দিদির এই কথায় সেটা তার মন হইতে রোদের তাতে শিশির-বিন্দুর মত নিভিয়া

শুকাইয়া গেল। অধিকন্তু যে স্নেহময়ী মাতা তাঁর সুস্থ সাবালক সন্তানের রক্ষা-ভার তাহারই অপর ও সর্ব্বপ্রধান আত্মীয়দের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া নিজের পুণ্য-লুব্ধ চিত্তকেও তার প্রবল প্রলোভন হইতে বিযুক্ত করিতে চাহিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় সমধিক বিনম্র করিয়া তুলিল। সহসা তাঁহার জন্য প্রাণ তার যেন চিন্তা-ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিল। সে সোদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "আচ্ছা দিদি! মাকে যে তোমরা যেতে দিলে, তাঁকে সেখানে দেখবে কে? নিছক পরের সঙ্গে এমন করে যাওয়াটা কি তাঁর ভাল হলো? যদি অসুখ বিসুখই করে? যদি—"

বাধা দিয়া সুন্দরা কহিল, "ও রে অত 'যদি'র ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। সে কি আমরা না ভেবেই আমাদের মাকে যেতে দিয়েছি। বিধু ঝি, গিরিশ দাদা, তার বৌ, সরকার মশাই, আর পাঁড়েজী দরোয়ান তাঁর সঙ্গে গেছে। তা'ছাড়া আগড়পাড়ার মাসিমা, বাগবাজারের হরিশ জ্যেঠা মশাই, সত্যদাদা—এই-সব আপনা-আপনি লোক রয়েচে। আমাদের সেজ মাসী আর সেজ মেসোও তো ঐ সঙ্গে যাচ্চেন। তাঁরা বল্লেন, কোন অসুবিধে হ'তে দেবেন না। শরীর খারাপ হলেই লোকজন সঙ্গে দিয়ে ফেরৎ পাঠাবেন। দরকার বোধ করলে তাঁদের মধ্যে কেউ চাই কি সঙ্গে করেও আনতে পারেন। তাই না যেতে দিয়েছি। তা'ছাড়া সত্যদা' একজন ভাল ডাক্তার তো,—সে সঙ্গে রয়েচে।"

মায়ের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন ত্রুটী হয় নাই দেখিয়া সলিল অনেকখানিই নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ হইয়া সেদিক হইতে মনটাকে টানিয়া লইল।

"এই যে দুটো ঘর একটু বড়, এর একটা মিষ্টার সেনের, আর একটা তোমার বাচ্ছাদের জন্যে রেখে দিয়েছি। আর এই যে দুটো ছোট ঘর আছে, এর একটায় তোমার কাপড় পরা হবে ত! একটা আমি কিন্তু

ভাই দখল করেচি। এখন মিষ্টার সেনের জন্যে কি করা যায় তারই একটা উপায় উদ্ভাবন করো দেখি! এই বারান্দাটার একটা পাশকে যদি একটা পার্টিসন দিয়ে একটু ঘেরা করে নেওয়া যায়, ওঁর হবে কি? কিন্তু বৃষ্টি হলে তো ঝাট্ আস্‌বে!"

সুন্দরা ভাইয়ের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে ঘরদ্বার দেখা শোনা করিতেছিল। সে তার ভাইয়ের চিন্তাভার লঘু করিয়া দিবার জন্য রহস্য করিয়া বলিল, "কেন, তোমার সেনমশাই কি তোমার দিদিটীকে বয়কট করেছেন? ঐ একখানা ঘরেই আমাদের অচল হবে কিসে? ছোট ঘর দুটো কাপড় পরবার জন্য রইলো বরং, ঐ বড়র একটায় তুই আর সুজিত রঞ্জিত শুতে পারবি নে?"

সলিল ঈষৎ চিন্তিত থাকিয়া প্রশ্ন করিল "আর শিউলি?"

"সে এ,—"বলিয়া সুন্দরা একটুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া তার পর জবাব দিল, "ও আমাদেরই ঘরে থাকবে, 'খন।"

"কিন্তু মিষ্টার সেন তো অত ভিড় সইতে পারেন না।"

"খুব পারবেন রে! খুব পারবেন! ঠিক ঠিক সবই যদি বাড়ীর মতনই হবে, তা হ'লে 'চেঞ্জ'টা কি হলো শুনি?" বলিয়া সুন্দরা দেবী উত্তর ধারের বারান্দাটার দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

"বাঃ, বাঃ! খাসা গ্র্যাণ্ড সিনারী তো! ওসব পাহাড়গুলোর নাম কি রে? বদরীনাথ কেদারনাথের পাহাড় না কি এখান থেকে দেখা যায়? কে যেন বলছিল সেদিন! কোন্ পাহাড়টা বদরীর? দেখিয়ে দে' না।" বলিয়া সুন্দরা কুতূহলী চোখ মেলিয়া সুদূর পর্ব্বত-সীমার প্রতি চাহিয়া রহিল।

সলিল সলিল, "দিদি দেখচি সেই যে 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবরের' কথা না কি যে একটা শোনা যায়, তাই করতে চায়! বদরী কেদার [illegible]

আমাদের জান্‌লার নীচেই বসে রয়েছে! সে এখান থেকে কত শো মাইল্ দূরে, ঘরের মধ্যে বসে আমি তোমায় দেখাই কি করে বল তো?"

সুন্দরা তারা চশমা-জোড়া খুলিয়া, ঘষিয়া, মুছিয়া, পুনশ্চ তাহা চোখে দিতে দিতে ঘন নীল মেঘপুঞ্জ-পরিদৃশ উচ্চাবচ পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "না রে, তুই উড়িয়ে দিলেই তো হবে না। আমি শুনেচি রে, আচ্ছা, এখানকার কোন জানাশোনা লোকের সঙ্গে তোর ভাব হয় নি? তাদের কারুকে জিজ্ঞেস করলেই তো চুকে যাবে! কে? ওঃ! ওই বুঝি তোর বয়? খাসা ফুট্‌ফুটে ছোকরাটা তো! এটা যায় তো আমি এটাকে কলকাতায় নিয়ে যাবো! চায়ের জলটল সব ঠিক হয়েচে! আচ্ছা, তোম চলো, হামলোক আতা হ্যায়।"

পশ্চিম দিকের বারান্দাটীই সব চাইতে চওড়া। ইহাতে কাঁচের দরজা লাগানোও আছে। সেই জন্য এইটেকেই প্রধানতঃ খাবার ঘর করিয়া রাখা হইয়াছে। তবে বাহিরের লোক আসিলে নীচের ঘরে বসার ব্যবস্থা করিয়া রাখাও হইয়াছিল। বারান্দায় একটী মাঝারি টেবিল পাতিয়া ধোপ-দেওয়া টেবিল-ক্লথের উপর চাএর সেট, এবং গরম কাপড়ের ঢাক্‌নীর মধ্যে চা-দানীতে চা ভিজান। সুন্দরা তাড়াতাড়ি আসিয়াই চা তৈরী করিতে ব্যস্ত হইল। সলিল সার্সিবদ্ধ জানালাটা খুলিয়া দিয়া ঠিক ইহারই পাশের বাড়ীখানার উপরের বারান্দার দিকে বারেক আশু প্রত্যাশিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল।

সে বারান্দাটা এ রকম ঘেরা নয়, খোলা বারান্দা। তার এক ধারে একটা ময়লা কাপড় ফেলা বেত ছাওয়া লম্বা বাক্স দাঁড় করানো আছে। তারই পাশে একগাছা কাশ-জাতীয় গাছের ডগায় তৈরী করা ঘর ঝাটানো ঝাঁটা। আর বারান্দার কাঠের ছাদে আঁটা একটা হুকের গায়ে ঝোলানো আছে একটা পাখীর খাঁচা। খাঁচাটা দেখিয়া সলিলের মনে পড়িয়া

গেল, সে এই বাড়ীর ঘরের মধ্যে থাকিয়াও যে মধ্যে মধ্যে মঞ্জুর উচ্চারিত, "আঁট্টাডাম! টীটাডাম কহো!" শব্দ শুনিতে পায়, ইনিই সেই তথা-কথিত আত্মারাম; তবে, সীতারাম যে ইনি কস্মিন্‌কালেও বলিবেন না, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যেহেতু এটী চন্দনা, কাজলা, শুক বা ময়না নয়, একটী কাঠ-ঠোক্‌রা জাতীয় পাহাড়িয়া পাখী। লেজটী খাসা লম্বা, আর ডানা দুটী বেশ চিত্র করা।

"এই যে! তোমরা এইখানে? তোমাদের বাচ্চা-বয়টী গিয়ে বল্লে 'সাব ও মেমসাব হুজুরকো রাস্তে চা পি নেই সেকতা!' আমি বলি শালা বুঝি এখানে একটা মেমসাব টেম্‌সাব জুটিয়েচে! তা' না—তুমি মেমসাব!"

সুন্দরা ক্রূর কটাক্ষ হানিয়া চাপা তর্জ্জনে কহিল, "কি যে রসিকতা করো!"

সলিল ঈষৎ অপ্রস্তত হাস্যে কহিয়া উঠিল, "যান্! আপনার মুখটী চিরকাল সমানই রয়ে গেল দেখ্‌চি!"

মিষ্টার সেন তাঁর স্ত্রীর পাশের চেয়ারে আসন গ্রহণ করিতে করিতে সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ওরে শালা! আমাদের দেশে কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে', আর আমার কি বেঁচে থেকে, এমন কি, এই আটত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সের মধ্যেই যাবে। বৈদ্যকশাস্ত্রে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে ছত্রিশ বৎসর বয়সকে যৌবনকাল, তদূর্দ্ধে ষাট পর্য্যন্তকে মধ্যবয় বা প্রৌঢ়ত্ব এবং ষাট পার হবার পর থেকে বৃদ্ধাবস্থা ধরা হয়। সে হিসাবে আমি মাত্র এই প্রথম বয়স থেকে দ্বিতীয়ে সদ্য পদার্পণ করচি, এর মধ্যে আমার 'চিরকাল' গত হ'তে তুই কখন দেখ্‌লি বল্ তো? তার পর দেখ, তোর দিদির সবেমাত্র এই সেদিন হীরের নেকলেশ গড়ানো হয়েচে! এরই মধ্যেই যদি ওর পতিটীকে চিরকেলে বুড়ো বলে তুমি সনাক্ত করে দা-

তাহলে এবারের ভাইফোঁটার সময়ে যে তোমাকে আপ্‌শোষ করতে হবে, তা' আমি তোমায় এই হলপ্ করেই বলে দিচ্চি।"

সুন্দরা সলিলের চাএর কাপ্‌টা তার দিকে ঠেলিয়া দিয়া সদ্য-সমাগত তার বার বছরের মেয়ে শিউলীকে চা ঢালিয়া দিতে দিতে স্বামীর দিকে পুনশ্চ একটা কৃত্রিম কোপের কুটিল দৃষ্টি হানিয়া বলিয়া উঠিল, "কি যে আবোল-তাবোল বকতে বস্‌লে! থামো ত! বয়েস তা' বলে কিছু তোমার কম হয়নি! সলিল! তোর চায়ে আর মিষ্টি দোব কি না দেখত।"

এ কথা শুনিয়া মিষ্টার সেন বলিলেন, "বাঃ! নিজের ভাইটীর বেলায় মিষ্টির খবর নেওয়া হচ্চে,—অভাগারা বুঝি ও-রসে বঞ্চিত! আহা সলিল! না, না, নাও, নাও, কেন মিথ্যে দিদির কাছে আমায় গাল খাওয়াবে!"

সলিল কহিল, "কত মিথ্যেই যে আপনি বলতে পারেন! আদালতে দাঁড়িয়ে রাতকে দিন, আর দিনকে রাত এ'ত নিত্যই করচেন, তাতেও কুলোয় না? আবার ঘরে বসেও সেই কাজ!"

"কি মিথ্যে বল্লুম রে শালা?"

"আঃ—কি করচো! ছেলেপুলেদের সাম্‌নে!"

মিষ্টার সেন যেন একান্তই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, এমনই ভাবে কহিলেন—"বাঃ! ছেলেপুলেদের সাম্‌নে যদি শালাকে নিমাই-সরকার বলে ডাকি, তা হলেই কি সেটা খুব সভ্যতা হবে? গিন্নির ভাইকে দেশাচার মতে যা বলা হয়ে থাকে, তাই তো বলেচি। এতে তোমরা দুভাই বোনে অত 'সক্‌ড্' হচ্চো কেন শুনি?"

সুন্দরা আর জবাব দিল না। সে ছুরী দিয়া নিবিষ্টভাবে কেক কাটিতে লাগিল। সলিল চাএর কাপ্‌টা নামাইয়া রাখিয়া এক টুকরা কেক মুখে ফেলিয়া বলিল, "জামাইবাবু এদিকে এত সাহেব, কিন্তু মুখখানিতে [illegible]কেলে ঠান্‌দিদিদের হার মানাতে পারেন!"

অমনই মিষ্টার সেন ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি সাহেব! সাধ করে কি আর মুখে আসে,—এ শালা বলে কি? আমার গায়ের পোষাক, মুখের সিগার, পায়ের জুতো, মাথার টুপি এ সাহেবী হ'তে পারে। কিন্তু আমি শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম সেন—আমার সাহেব হবার যো কি যে আমি সাহেব হবো! আমার গায়ের চামড়া সাহেবী নয়, রক্তে সাহেবী ভেজাল নেই, হাড় যে সাহেবী খুঁটি নয়, তা গোরার বুটের লাথি খেলেই প্রমাণ হয়ে যায়। সাহেবীয়ানার খোলোষ পরেছি—যে মুহূর্ত্তে সেটা খুলে ফেলে দেবো, সেকার সেই কালা-বাঙ্গালী! তবে মুখখানাতেও অনর্থক দিনরাত চাবি দিয়ে রেখে দিই কেন বল ত?"—

বয় আসিয়া জানাইল, পাশের বাড়ীর বাবু আর মিস সাব আসিয়াছেন। শুনিয়া সুন্দরা সলিলের দিকে তাকাইল। সলিল তাড়াতাড়ি চাটা চুমুক দিয়া শেষ করিয়াই ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্দ্ধ বিস্ময়ে সে বলিয়া উঠিল—"এরই মধ্যে ওঁরা এসে গেলেন! আমিই যে ভাবছিলুম, চাটা খাওয়া হয়ে গেলে একবার বেড়াতে বেড়াতে তোমাদের নিয়ে ওঁদের ওখানে ঘুরিয়ে আনা যাবে।"

"কে ওঁরা?"

সলিল রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতেই বাহির হইয়া যাইতেছিল, তদবস্থভাবেই সে জবাব দিয়া গেল, "এই পাশের বাড়ীর অতুলবাবু। অতুলেশ্বর সেনগুপ্ত।" তার পর একটুখানি গিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "যদি ওঁরা তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান?"

সুন্দরা কহিল, "বোলো আমরা একটু পরেই আসচি। এই শিলি! অমন করে বিনুনি দুলিয়ে ছুটচো কোথায়? যাও—আয়ার কাছ থেকে চুল ঠিক করিয়ে নিয়ে মুখে একটু ক্রিম আর পাউডার দিয়ে ভদ্রভা

যাও। দেখ, বেবির আয়া যেন তাঁকে ছেড়ে রাখে না, হঠাৎ—গিয়ে ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা উৎপাত ঘটাতে পারে।'

সলিল ও শেফালিকা চলিয়া গেলে মিষ্টার সেন তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, এইবার তোমার আইবুড় কার্ত্তিক ভাইটীর হয় ত বিয়ের ফুলের কুঁড়িটী বা এই পর্ব্বত-সানুদেশে এসে ফুটে উঠ্‌লো !"

সুন্দরা তার পরিবেষণ শেষে আহার কার্য্য সমাধা করিতেছিল, এক-শ্লাইস কেক নিজের প্লেটে তুলিয়া লইয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "বসে বসে খড়ি পাতলে না কি ?"

মিষ্টার সেন উত্তর করিলেন, "ঠাট্টা না, সিরিয়স্‌লীই বলচি ! সেনগুপ্ত সাহেব এলেন, সঙ্গে মিসি বাবা ! ছোকরা পড়ি কি মরি করে দৌড়লেন তাঁদের অভ্যর্থনা করতে ! এই সকল কার্য্য থেকে কারণকে খুঁজে নিতে অন্ধেরও বিলম্ব ঘটে না,—আর আমি তো তবু চক্ষুষ্মান।"

সুন্দরা সংক্ষেপে জবাব দিল, "তা মন্দ কি ! সেনগুপ্ত যখন, তখন তো আর অজাতও নয়। হয় সে, ভালই তো।"

৭

অতুল গুপ্ত আরতিকে সমস্ত দিনে সতরবারই তাগিদ দিয়াছেন। অবশেষে তাঁর তাড়ার চোটে অতিষ্ঠ হইয়া আরতি তার যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ের কতকটা আগে ভাগেই, তাদের জলখাবারের এবং চায়ের ব্যাপার সমাধা করিয়া লইয়া, বাপের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মঞ্জুকে সে সঙ্গে আনে নাই। তার চাকরের সঙ্গে তাকে আর এক দিকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। নূতন যাঁরা আসিয়াছেন, তাঁদের না জানিয়া, তার

দুরন্ত ভাইটীকে সে অপরের সমালোচক দৃষ্টির সাক্ষাতে ধরিয়া দিতে অনিচ্ছুক।

সলিল যখন ত্রস্তব্যস্ত হইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন তাদের ছোট্ট ড্রইংরুমের কয়েকখানা বেতের চেয়ারের মধ্যে দুখানাকে অধিকার করিয়া লইয়া, অতুলবাবু ও আরতি বসিয়া মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সলিলের দ্রুতগতিশীল জুতার শব্দে দুজনেই চুপ করিলেন। অতুলবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এই যে! সলিল! তা' ওঁরা সব বেশ এসেছেন ত? কোন কষ্ট কি অসুবিধে তো হয় নি?"

সলিল তাঁহাকে হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া প্রশ্নোত্তরে কহিল, "না, অসুবিধে বিশেষ হয় নি। তবে দীর্ঘ পথ,—কষ্ট একটু হওয়া তো স্বাভাবিকই।"

অতুলবাবু সম্মতিসূচক মাথা দোলাইয়া কহিলেন, "তা তো সত্যিই! তা' এখানে এসে কারও কিছু যদি অভাব থাকে, কিম্বা যদি কোন রকম অসুবিধা বোধ হয়, তক্ষণি আমাকে বলবে বাবা! মিথ্যে যেন কষ্ট ভোগ করা না হয়—দেখো। কোন রকম সঙ্কোচ যেন কোরো না।"

সলিল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "তা' করিনে ত।"

অতুলবাবু কহিলেন, "আমিও তো তাই বলচি, করবার কিছু দরকার নেই ত। এ-সব জায়গায় আপনার জন বেশী সঙ্গে আসে নি,—আমি তোমার করলুম, তুমি আমার করলে,—এ' না হলে কি টেঁকা যায়? আর তা' ছাড়া দেখ বাপু! সংসারে কেই বা আপন, আর পরই বা কে? নিজের মার পেটের যে সহোদর ভাই, যার বাড়া আপনার আর আমাদের পৃথিবীতে থাকতে পারে না, সামান্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, কিম্বা না নিয়েও, সেই অনায়াসে আমাদের সব্বার চাইতেই পর হয়ে যায়। আবার যার সঙ্গে কোন পুরুষেই কোন রকম রক্ত সম্পর্ক নেই, হঠাৎ একদিনের

যাও। দেখ, বেবির আয়া যেন তাকে ছেড়ে রাখে না, হঠাৎ—গিয়ে ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা উৎপাত ঘটাতে পারে।'

সলিল ও শেফালিকা চলিয়া গেলে মিষ্টার সেন তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, এইবার তোমার আইবুড় কার্ত্তিক ভাইটীর হয় ত বিয়ের ফুলের কুঁড়িটী বা এই পর্ব্বত-সানুদেশে এসে ফুটে উঠ্‌লো!"

সুন্দরা তার পরিবেষণ শেষে আহার কার্য্য সমাধা করিতেছিল, এক-শ্লাইস কেক নিজের প্লেটে তুলিয়া লইয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "বসে বসে খড়ি পাতলে না কি?"

মিষ্টার সেন উত্তর করিলেন, "ঠাট্টা না, সিরিয়স্‌লীই বলচি! সেনগুপ্ত সাহেব এলেন, সঙ্গে মিসি বাবা! ছোকরা পড়ি কি মরি করে দৌড়লেন তাঁদের অভ্যর্থনা করতে! এই সকল কার্য্য থেকে কারণকে খুঁজে নিতে অন্ধেরও বিলম্ব ঘটে না,—আর আমি তো তবু চক্ষুষ্মান।"

সুন্দরা সংক্ষেপে জবাব দিল, "তা মন্দ কি! সেনগুপ্ত যখন, তখন তো আর অজাতও নয়। হয় সে, ভালই তো।"

৭

অতুল গুপ্ত আরতিকে সমস্ত দিনে সতরবারই তাগিদ দিয়াছেন। অবশেষে তাঁর তাড়ার চোটে অতিষ্ঠ হইয়া আরতি তার যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ের কতকটা আগে ভাগেই, তাদের জলখাবারের এবং চায়ের ব্যাপার সমাধা করিয়া লইয়া, বাপের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! মঞ্জুকে সে সঙ্গে আনে নাই। তার চাকরের সঙ্গে তাকে আর এক দিকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। নূতন যাঁরা আসিয়াছেন, তাঁদের না জানিয়া, তার

দুরন্ত ভাইটীকে সে অপরের সমালোচক দৃষ্টির সাক্ষাতে ধরিয়া দিতে অনিচ্ছুক।

সলিল যখন ত্রস্তব্যস্ত হইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন তাদের ছোট্ট ড্রইংরুমের কয়েকখানা বেতের চেয়ারের মধ্যে দুখানাকে অধিকার করিয়া লইয়া, অতুলবাবু ও আরতি বসিয়া মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সলিলের দ্রুতগতিশীল জুতার শব্দে দুজনেই চুপ করিলেন। অতুলবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এই যে! সলিল! তা' ওঁরা সব বেশ এসেছেন ত? কোন কষ্ট কি অসুবিধে তো হয় নি?"

সলিল তাঁহাকে হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া প্রশ্নোত্তরে কহিল, "না, অসুবিধে বিশেষ হয় নি। তবে দীর্ঘ পথ,—কষ্ট একটু হওয়া তো স্বাভাবিকই।"

অতুলবাবু সম্মতিসূচক মাথা দোলাইয়া কহিলেন, "তা তো সত্যিই! তা' এখানে এসে কারও কিছু যদি অভাব থাকে, কিম্বা যদি কোন রকম অসুবিধা বোধ হয়, তক্ষণি আমাকে বলবে বাবা! মিথ্যে যেন কষ্ট ভোগ করা না হয়—দেখো। কোন রকম সঙ্কোচ যেন কোরো না।"

সলিল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "তা' করিনে ত।"

অতুলবাবু কহিলেন, "আমিও তো তাই বলচি, করবার কিছু দরকার নেই ত। এ-সব জায়গায় আপনার জন বেশী সঙ্গে আসে নি,—আমি তোমার করলুম, তুমি আমার করলে,—এ' না হলে কি টেঁকা যায়? আর তা' ছাড়া দেখ বাপু! সংসারে কেই বা আপন, আর পরই বা কে? নিজের মার পেটের যে সহোদর ভাই, যার বাড়া আপনার আর আমাদের পৃথিবীতে থাকতে পারে না, সামান্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, কিম্বা না নিয়েও, সেই অনায়াসে আমাদের সব্বার চাইতেই পর হয়ে যায়। আবার যার সঙ্গে কোন পুরুষেই কোন রকম রক্ত সম্পর্ক নেই, হঠাৎ একদিনের

পরিচয়ে সেই হয় ত আমাদের মনের অর্দ্ধেকখানিই জুড়ে বসে। প্রকৃতির যে এ-সব কি লীলা, সে তিনিই জানেন!"

এই বলিয়া অতুলবাবু সলিলের মুখের উপর স্নিগ্ধ চোখে চাহিয়া এমন একটুখানি হাসি হাসিলেন, যে তাঁর বর্ণিত শেষোক্ত উপমাটা যে তার নিজের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে সলিলের আর দেরী হইল না। সে কৃতজ্ঞতার বিব্রততার মাঝখানে জড়াইয়া পড়িয়া কোন কিছু বলা উচিত বুঝিয়াও কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিল না ; এবং এই না পারার জন্য সে আরও একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে আসিয়া প্রবেশ করিল সুন্দরা এবং তাহার পশ্চাতে আসিল, মিঃ তারকব্রহ্ম সেন এবং এঁদের বড় মেয়ে শিউলি। সলিল নীরব হইতে পাইয়া বাঁচিয়া গেল। তার চেয়েও সে আরও বেশী করিয়া বর্ত্তাইল—অতুলবাবুর দিকে চাহিয়া থাকিতে না হওয়ায়। এতক্ষণের পর সে ভাল করিয়া আরতির দিকে চাহিবার অবসর পাইল।

আরতি আজ একটু যেন বিশেষ ভাবে সাজিয়া আসিয়াছিল। অসজ্জিত যদিও তাহাকে কোন দিনই দেখা যায় নাই, তবু আজ তার গোলাপী শাড়ীখানায়, খোঁপার দুপাশে হীরার-কাজ-করা চিরুণী দুখানায়, গলার একাবলী মুক্তাহারের শেষ প্রান্তের হীরার নক্ষত্রফুলে, পায়ের গোলাপী ভেলভেটের জরির কাজ করা জুতায়, হাতের ফ্রেঞ্চ এসেন্স সুবাসিত এমব্রয়ডারী করা ছোট্ট রুমালে যেন একটা ইচ্ছাকৃত সৌখীনতা প্রকাশ পাইতেছিল। এই হাল্কা সিল্কের ফিকা কাপড়ে তাকে খুলিয়াছিলও ভাল। সলিল কিছু মুগ্ধ চক্ষে বারেবারেই তাহাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এই কয়দিনের পর আজই উহাকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা নিসুপ্ত বাসনা যেন আপনার গোপন অস্তিত্বকে প্রকটিত করিয়া তুলিল। তার মনে হইল, এই আরতি যদি

তার স্ত্রী হয় তো মন্দ হয় না! অত্যন্ত সুন্দরী না হলেও আরতি অনেক সুন্দরীদের চাইতেও অধিকতর লোভনীয়া তাহাতে সংশয় নাই।

সুন্দরা প্রথমে অতুলবাবুকে আপ্যায়িত করিয়া লইয়া অবশেষে আরতির উপর মন দিয়াছিল। ততক্ষণে অতুলবাবু মিঃ সেনের সহিত আলাপ জমাইয়া তুলিতেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁদের দুজনকার মধ্যে বেশ একটুখানি বন্ধুত্বের ভাব আসিয়া পড়িল। দুজনেই মন-খোলা লোক,—পরস্পরের মধ্যে সুখ-দুঃখের অনেকখানিই বিনিময় করিয়া বসিলেন।

আরতিকে প্রথম দর্শনে সুন্দরার মনে হইল, এ মেয়ে তার ভাইএর যোগ্য নয়। মুখের কাট এবং শরীরের গড়ন যদিও এর ভালই, রং কিন্তু খুব ফরসা কোথায়? এ রকম রংয়ের মেয়ে তাদের তো চারিদিকেই গণ্ডাগণ্ডা ছড়াছড়ি যাইতেছে। নাঃ—এ বাপু চলিবে না।

তার পর ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যেও পরিচয় অগ্রসর হইতে থাকিল। সুন্দরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আরতির নিকট হইতে জানিয়া লইল, তার বাপ অতুলেশ্বর বাবুর বাড়ী বরিশাল……পুরে। সেখানে এক সময় এঁরা জমীদার ছিলেন, অতুল বাবুর বাপের দেনায় সে জমিদারী নিলাম হইয়া গিয়াছে। তখন ইনি এবং এঁর ছোট ভাই দুজনেই নাবালক। অনেকটাই যেন অর্থাভাবে অতুল বাবুর পাশকরা বিদ্যা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। ছোট ভাইকে যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া-কিনিয়া বিলাত পাঠান। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়া কোন বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত ভাইএর সঙ্গে আর কোনই সংস্রব নাই। কেবল কখন কখনও টাকা দরকার হইলে চিঠিপত্র আসে। অতুলবাবু কণ্ট্রাক্টরীতে যথেষ্ট অর্থোন্নতি করিয়াছেন। এখন তাঁর অবস্থা তাঁর ম্যাজিষ্ট্রেট ভাইএর চাইতে ভাল ছাড়া মন্দ নয়। মঞ্জুর জন্মের প…

উহাদের মাতৃ-বিয়োগ হয়। এখন এই দুই ছেলে-মেয়ে ছাড়া এঁদের সংসারে আপন বলিতে আর কেহই নাই।

সুন্দরার হঠাৎ মনে হইল, মেয়েটীর মুখখানি কিন্তু মন্দ নয়! ভাব-ভঙ্গীটীও বেশ ভদ্র ছাঁদের আছে। নাঃ, রংটা যদি আর একটী পোঁচও ফরসা হতো!

আরতি যখন বাড়ী ফিরিল, সেও তার মার বয়সী এই পরের দিদিটীকে একটুখানি যেন ভালবাসিয়া ফেলিয়া গেল। সুন্দরার ব্যবহারে কেমন একটু সস্নেহ সহৃদয়তা মাখান ছিল, যাহাতে তার মরা মায়ের কথা তার বারে বারেই মনে পড়িতেছিল। মা তার চারটী বছর মারা গিয়াছেন। মার স্মৃতি তার সমস্ত মনটাকেই জুড়িয়া বসিয়া আছে। গাছের পাতায় জমা শিশির সব সময় দেখা যায় না,—নাড়া পাইলেই ঝরিয়া পড়ে। আরতিরও স্মৃতিভরা চিত্তে ওইটুকু স্নেহের স্পর্শ তার জমানো অশ্রুকে গলাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া তুলিল।

বাড়ী ফিরিয়া অতুলবাবু বলিলেন, "মিঃ সেন মানুষটী খাসা লোক, না রে আরতি?"

আরতি সুন্দরার কথা ভাবিতেছিল,—ভাল করিয়া না শুনিয়াই অন্যমনস্কে জবাব দিল, "কে, মিসেস সেন তো? হ্যাঁ, বড্ড ভাল।"

অতুলবাবু কহিলেন, "আমি মিঃ সেনের কথা বলচি। ওঁর নাম আমার শোনা আছে—বেশ বড় ব্যারিষ্টার; কিন্তু অহঙ্কারের যেন লেশ নেই।"

আরতি অন্য দিন হইলে বাপের কথায় হাসিয়া প্রতিবাদ করিত; বলিয়া বসিত, বাবা তো একদিনেই সবাইকে অমায়িক দেখে বসে থাকেন! প্রথম দেখা হ'তেই কি ছুটে এসে মারবে?—

আজ কিন্তু সে বাপের সঙ্গে তর্ক করিল না। সুন্দরার সুন্দর মূর্ত্তি

এবং তার স্নেহাভাষ তার মাতৃহীন স্নেহপ্রার্থী হৃদয়টীকে এমন একটুখানি স্পর্শ করিয়াছিল যে, তাহার স্বামীকে শুদ্ধ নিরহঙ্কার শুনিতে তার ভালই লাগিল।

অতুলবাবু কন্যার কাছে প্রশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে অনর্গল মিঃ সেনের সুখ্যাতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তার পর প্রস্তাব করিলেন, "কাল ওঁদের এখানে ডিনারে বল্লে হয় না? তুই কি বলিস?"

অন্যমনস্ক আরতি কহিল, "তা বল না বাবা! তোমার তো ওখানে রোজই দু-চারজনকে বলা ছিলই,—এখানে এসে লোকই পাও না।"

অতুলবাবু মেয়েকে আজ এতখানি বাধ্য পাইয়া খুসীও হইলেন, আবার তাঁর একটুখানি আশ্চর্য্যও বোধ হইল। এ-রকম স্থলে আরতি প্রথম একবারটী আপত্তি করিয়া বলিবেই বলিবে, যে, না, রোজ রোজ অত লোক নেমন্তন্ন করে কি হবে? গল্প করতে করতে তুমি কেবলই খেতে ভুলে যাও, আমিও সব্বার সামনে তোমায় কিচ্ছুটী বলতে পারিনে, সে ভারী বিশ্রী হয়। তাই আজ আরতিকে চিরাভ্যস্ত নীতির ব্যতিক্রম করিতে দেখিয়া, তিনিও কিছু বিস্মিত, কিছু সস্মিত মুখে তার মুখের দিকে বারেক চাহিয়া দেখিলেন। তাঁর সেই দৃষ্টিটুকু বেশ একটুখানি অর্থ-সম্বলিত।

আরতিও তাহা দেখিতে পাইয়াছিল,—তার বাবা যেন একটা কি ভাবিয়া লইয়া ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে তার মুখ দেখিলেন। সেইটুকু টের পাইতেই তারও মনের ভিতর দিয়া হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল,—আচ্ছা, বাবা কি আর কিছু, কোন কিছু, অন্য কিছু মনে করিলেন না কি? ওঁর চোখে ও কি-রকম দৃষ্টি? আচ্ছা ঠোঁটের কাছে খুব কম, একটী ফোঁটা ঈষৎ একটু যেন হাসিও ছিল কি? ছিল যেন! আচ্ছা, ও রকম ভাবে চাইবার কি হয়েচে? ওঃ, আচ্ছা তাই কি? উনি যেন

মনে করচেন—ঠিক, আমি এতক্ষণে ও-রকম করে চাইবার মানে বুঝিছি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আঃ, কি বিপদ!

আরতিকে নীরব ও অন্যমনস্ক লক্ষ্য করিয়া অতুলবাবু মনে মনে ঈষৎ স্নেহের হাসি হাসিলেন; এবং তাহাকে একা হইতে দিয়া একটা কোন অছিলায় সেখান হইতে একটুক্ষণের জন্য সরিয়া গেলেন। আরতিও যেন মনে মনে এইটুকুই চাহিতেছিল। সেও তার এই বিপন্ন, বিব্রত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া ঈষৎ স্বস্তি বোধ করিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। হিমকুহেলিকায় যদিও দূরের চারিদিক বাঁধা পড়িয়াছে, তথাপি সেই কোয়াসার নাতিস্থূল শ্বেত আচ্ছাদন জ্যোৎস্নার হেমবর্ণকে একেবারে ঢাকা দিতে পারে নাই। আকাশে নক্ষত্রগুলা চাঁদের আলোয় কিছু হীন-প্রভ। উঁচু-নীচু পাহাড়ের অসংখ্য গৃহ, বিপণী, হোটেল, পানাগার হইতে অসংখ্য নক্ষত্র দীপ্ত আলোকের শ্রেণী সেই ক্ষীণ হিমজাল ভেদ করিয়া জ্বলন্ত হইয়া রহিয়াছে। কোথা হইতে কোন একটা পানোন্মত্ত সাহেবের ভাঙ্গা গলার অসংলগ্ন সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল,—

"I Love you. Love you dear Fanny,—"

আরতি বিছানায় পড়িয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। আজ আর তার চোখে ঘুম আসিতে চাহিতেছিল না। কি যে একটা অস্বস্তিতে তার বিশ্বস্ত হৃদয় আজ এমন অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সেটা সে ঠিকমত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে না পারিলেও, একটা কোন অজ্ঞাত পরিবর্ত্তন যে তার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এই কথাটা মাত্র সে বুঝিয়াছিল। ঠিক যে পরিমিত ধারায় তার জীবনের নদী এতদিন একই লক্ষ্যে ছুটিয়াছে, তার মনে হইল এই যেন তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়! একটা অতৃপ্ত অপ্রাপ্ত কিসের বুভুক্ষায় মনটা উন্মুখ হইয়া

উঠিল। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া, তার পর ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে নিশ্চিন্ত চিত্তে ভাবিতে বসিল, আচ্ছা সুন্দরাদিদিকে দেখতে তো বেশ! আমার ঐ-রকম হাসি মুখটী বেশ ভাল লাগে। উনি যদি সত্যি করে আমার দিদি হতেন তো বেশ হোতো। সুন্দরাদিদির মেয়েটী মায়ের মত সুন্দরী না হোক, মেয়েটীও বেশ ভাল। ওঁরা সব্বাই কিন্তু বেশ! বেশ আছেন সব। আর আমাদের যেন কেউ কোথাওই নেই। নাঃ, এ কিচ্ছুই ভাল না। কেমন মা, বোন, ভাগ্নী, ভগ্নিপতি থাকবে, সব্বাই মিলে হাসি-খুসী করে দিন কাটানো যাবে, তা নয়—শুধু একটী ছোট্ট ভাই নিয়ে—আচ্ছা, মঞ্জু যদি না হতো, আমি কি নিয়ে থাকতুম? ভাগ্যিস্ মা ওকে দিয়ে গিয়েছেন!

আরতি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। তার পর আবার তার চিন্তা স্রোত বহিতে থাকিল।

আচ্ছা অনেকেরই তো বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী মা দিদি ভাগ্নে ভাগ্নী এই সবই হয়,—তারাই তখন কত আপনার হয়ে ওঠে। আমাদের স্কুলে তরুদি'র তো কেউ ছিল না, টিচারী করতেন। হঠাৎ একদিন দেখলুম, তরুদি'র যেখানে বিয়ে হলো, তাঁরা তিন ভাই, তিনজনে খুব ভাবও আছে; আমার কাকার মতন নয়। তরুদি'র শ্বশুরবাড়ীতে কত আপনার লোক হলো। যখনই গেছি, তরুদি' হয় তার ভাসুরপোকে দুধ খাওয়াচ্চেন, না হয় ভাসুরঝির চুল বেঁধে দিচ্চেন। সেবার দেখি, শাশুড়ীর অসুখে নার্স না রাখতে দিয়ে নিজেই রাত জেগে সেবা করচেন! বল্লেন, নিজের মার তো পারিনি,—সেবা করার সাধ যে আমার বাকি আছে। আচ্ছা, আমারও তো ওই রকম করে মা দিদি ভাগ্নী এ-সবই হ'তে পারে? আর ওঁরাই যদি আমার আপনার লোক হ'ন, সে খুব ভালই হয় কিন্তু—

সহসা আরতি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। এ কি কথা সে ভাবিতেছে? সুন্দরারা তার আপনার জন হইলে ভাল হয়? কি সুবাদে? তার সমস্ত মুখ গাঢ় রক্তের আভায় লাল হইয়া উঠিল। সুন্দরাদিদি যদি তার দিদি হন, তবে আর একজনকেও যে তাকে আপন করিতে হইবে! সলিলের মূর্ত্তি তার মনের মধ্যে উদিত হইল। আরতি সবিস্ময়ে দেখিল, এতবড় কথাটাও তাহার মনকে বিস্মিত বা লজ্জিত করিল না; সে যেন মনে মনে এই রকমই একটা ব্যাপারের প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল না কি? অথবা তার বাবার সেই দৃষ্টিটুকুই তাকে এই দিকে তাহার চোখ ফিরাইতে পথ দেখাইয়াছে? সুন্দরাকে দিদি পাইলে তাকে যখন সব্বার প্রথমেই আপনার করিয়া পাইতে হইবে ইহাকেই, তখন তার কথাটাই কি তার সকলের শেষে মনে পড়িল না কি? আরতি বহুক্ষণ নীরব নিশ্চেষ্ট পড়িয়া থাকিয়া আপনাকে আপনিই প্রশ্ন করিল, কেমন, পছন্দ হয়?

আবার আরতি ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া নিজের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর নিজেই নিজেকে প্রদান করিল, আচ্ছা, আমার তো বিশেষ অপছন্দ নয়। তবে ওঁদের আমাকে পছন্দ হয় কি না?

এইবার আরতির মনটা আবার একটু বিমনা হইয়া গেল। সে মনে মনে সলিলের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করিতে লাগিল। আমার চাইতে উনি অনেকটাই ফরসা। আমার সোজা চুল, ওঁর কোঁকড়া। চোখ আমার হয় ত ওঁর চাইতে ভাল। নাক, তা ওঁর এক রকম আমার অন্য রকম। ঠোঁটেও খুব ইতর-বিশেষ ধরা যায় না। কিন্তু আসলেই তো মেরে রেখেছে,—রংয়ে যে অনেক তফাৎ! আচ্ছা, তা কি আর হয় না? কত সুন্দর পুরুষের তো কালো স্ত্রী হয়। আমি তো তবু কালো নই,—মাঝারি। যাঃ—কি বেহায়ার মতন বিয়ের কথা ভাবছি? ভাগ্যে কেউ টের পাবে না,—না হলে বিয়ে-পাগলা বুড়ী বলে ক্যাপাতো!

বাবা কিন্তু ঠিক ঐ কথাটাই ভেবেছেন!

ঘুম আর আসিল না। গায়ে একখানা র‍্যাপার জড়াইয়া শেষকালে আরতি দরজা খুলিয়া তাদের সেই বারান্দাটায় আসিয়া দাঁড়াইল, যেখান হইতে সলিলদের ঘেরা দালানটা দেখা যায়।

কোয়াসা তখন আরও একটুখানি সরিয়া দূরে গিয়াছে। চাঁদের আলো আরও একটুখানি উজ্জ্বল দেখাইতেছে। সেই প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নার মধ্যে সলিলদের বারান্দাটা প্রায় সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আরতি চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সেইখানে সেই চা-টেবিলের একপাশে, খোলা জানালার ধারে একলা কেহ বসিয়া আছে। গায়ে একটা মোটা অলষ্টার; মাথায় নাইট ক্যাপ চড়ানো। একখানা হাত, যেখানে জানালার কাঠের উপর রহিয়াছে, তাহা মোটা কাশ্মীরি দস্তানায় ঢাকা। মূর্ত্তিটা কোন পুরুষের।

আরতি এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ঈষৎ বিপন্ন বোধ করিল। লোকটী এই বাড়ীর বারান্দাটার দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিয়াছে; হয় ত বা তাহার আগমনও সে জানিতে পারিয়া থাকিবে। এ ক্ষেত্রে তার এত কাছের বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গত নহে। অথচ, যদি না দেখিতে পাইয়া থাকে, তাহা হইলে অনর্থক আবার দরজা বন্ধ করিবার শব্দ করিয়া উহার মনোযোগ আকর্ষণের আবশ্যকতাই বা কি? এ কে? মিঃ সেন, না সলিল?

সহসা তার এই মানস-প্রশ্নের উত্তর সমাধানের মতই সেই ব্যক্তি যেন আত্মগতই উচ্চারণ করিল—

I Love you. Love you dear Fanny.

এ কণ্ঠ পানোল্লসিত সাহেবের বিজড়িত কণ্ঠ নয়; তাই চিনিবার কোন অসুবিধা ছিল না; আরতি চিনিল, মিঃ সেন নহেন, এ ব্যক্তি সলিল।

৮

কয়েকদিন গত হইলে একদিন সুন্দরা অতুলবাবুর বাড়ী হইতে বেড়াইয়া আসিয়া সাম্‌নের বারান্দায় চুরোট হস্তে পাইচারী-পরায়ণ ভাইকে দেখিতে পাইয়াই হঠাৎ একনিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ রে, আরতি মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে ?"

সলিল তার দিদির প্রশ্ন শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঈষৎ একটুখানি হাসি তার ঠোঁটের পাশ দিয়া খেলিয়া গেল। সে কহিল, "আমিও ঠিক ঐ কথাটাই তোমায় জিজ্ঞেস করবো করবো ক'দিন থেকেই ভাবছিলুম, শুধু—"

সামান্তক্ষণ প্রতীক্ষা করিবার পর সুন্দরা জিজ্ঞাসা করিল "শুধু কি ? থামলি যে ?"

সলিল এবার প্রকাশ্যেই হাসিয়া উত্তর দিল, "শুধু তুমি বেহায়া বলবে, তাই করিনি।"

সুন্দরা চোখ টানিয়া কহিল "ঈস্! ছোট ভাইটী আমাকে আজ-কাল বড্ডই খাতির করতে শিখেছেন দেখচি যে !"

হাসিতে হাসিতে সলিল কহিল, "বড় হচ্চিনে বুঝি ?"

সুন্দরা কহিল, "হচ্চিস বৈ কি ! তা'বলে তো আর তোর দুচার শো বছর বয়েস একসঙ্গেই হঠাৎ বেড়ে ওঠেনি ? মামুলী হিসেবেই তো বাড়ছিস্! সে হিসাবে আমার বাড়টাই কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বন্ধ আছে ? তখনও যেমন, এখনও তো আমি তোর সেই চিরকেলে দিদিই রয়ে গেছি—না, নেই ?"

সলিল ঈষৎ অপ্রতিভ হইল।

সুন্দরা অগ্রসর হইয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল, সলিলকে বলিল, “আয়।—”

সে সেই আধপোড়া চুরুটটা তেম্‌নিই দুই আঙ্গুলে ধরিয়া রাখিয়াই দিদির পিছন পিছন আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সেটাকে টানিয়া টুনিয়া তার শেষ রসাস্বাদ (ধুমাস্বাদ) গ্রহণ করিয়া ফেলিয়া দিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। দিদির প্রথম প্রশ্নটা তার মনটাকে ধরিয়া এমনই করিয়াই নাড়িয়া দিয়াছে!

একখানা বেতের চেয়ারের ছিটের কুসনের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া সুন্দরা সম্মুখবর্ত্তী ভাইএর ঔৎসুক্য-স্মিত মুখের দিকে চাহিল, কহিল, “মেয়েটীকে আমার বেশ মনে ধরেচে সলিল! ওই জন্যেই তো ওদের সঙ্গে ক’দিন ধরে এতটা মেশামিশি করে দেখলুম। সুন্দরী খুব অপরূপ নাই হোক, ওর চেহারাতে আর স্বভাবেও বেশ একটা ডিগ্‌নিটী আছে; লেখাপড়াও—তাও নেহাৎ মন্দ জানে না। স্কুলে কলেজে অনেক-দূর পড়েনি বটে, তবে মেম-গবর্ণেসের কাছে অনেকটাই ইংরাজী শিখেচে। হাতের সেলাই বোনা এসবও মন্দ নয়। আর গান টানও বেশ গাইতে পারে। তুই অবিশ্যি গান শুনেইচিস?”

আরতির সুখ্যাতিতে মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিয়া সলিল স্মিত-প্রফুল্ল মুখে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, ‘না, সে শুনে নাই।’

সুন্দরা বিস্মিত হইয়া কহিয়া উঠিল, “সে কি রে! এই পাশাপাশি থাকিস্—কান দুটো কোথায় থাকে তোর? এত দিনেও ওর গান শুন্‌তে পেলি নে?”

হাসিয়া সলিল বলিল, “কান, তা যদি বলো, তো ঐদিকেই প্রায় খাড়া থাকে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন দিনই তার কপালে সঙ্গীত-লহরী এসে তাতে প্রবিষ্ট হলো না, করে কি বল? একদিন শোনাও না।”

সুন্দরা কহিল, "একদিন কি, আজই শোনাব'খন। আচ্ছা তার পর, আমি বলছিলুম কি, তোমার পড়া-শোনা তো শেষ হয়েই গ্যাছে, আর মাও বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এইবার তা'হলে আর তোমার বিয়ের বাধাটা কি? বল ত এই আরতি দেবীর সঙ্গেই তোমার ঘটকালিটা করে ফেলি।"

দিদির কথার গাম্ভীর্য্যে ও অভিভাবকোচিত ধরণ-ধারণে সলিলের সুখোচ্ছ্বসিত চিত্ত সমধিক কৌতুক বোধ করিল। সে ঈষৎ সলজ্জ হইয়াও তাই না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "দিদি যে একেবারে 'প্রফেসনাল ম্যাচ্ মেকার' হয়ে উঠেছ দেখচি!"

সুন্দরা ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, "যাঃ, হাসিস্ নি।"

সলিল আরও বেশি হাসিয়া কহিল, "তুমি অত বেশি গম্ভীর হয়ে কথা বল্লে আমি না হেসে থাকতেই পারবো না।" বলিয়া সে সকৌতুকে আপন মনে হাসিতেই লাগিল।

সুন্দরা মুখখানা ভারী করিয়া কহিল, "এসব কথা একটু গম্ভীর হয়েই কইতে হয়। দেখ, সল্লি! তুই যদি অত করে হাস্‌বি, তাহ'লে তোর সঙ্গে আরতির বিয়ের ঘটকালি আমি করবো না কিন্তু, তা' তোকে বলে দিচ্চি! যদি বিয়ে করবার মতলব সত্যি সত্যি থাকে, তাহলে হাসি থামিয়ে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন, আর ঠিক ঠিক জবাবগুলো দিয়ে যা'—বুঝলি?"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের অভিনয়-চেষ্টা করিয়া সহাস্যে সলিল উত্তর করিল, "বুঝেছি বই কি।"

সুন্দরা তার ব্যারিষ্টার স্বামীর অনুকরণে আসামীকে জেরা আরম্ভ করিল, "আরতিকে তোর পছন্দ?"

সলিল ঠোঁট টিপিয়া হাসি চাপিয়া জবাব দিল,—"হ্যাঁ-অ্যাঁ, খুব—।"

"ওকে বিয়ে করতে চাস ?"

সলিল সেই ভাবেই কহিল, "তোমরা দিলেই !"

সুন্দরা এবার নিজেই একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যদি আমরা না দিই ?"

সলিল কহিল "করবো না।"

সুন্দরা কহিল, "আহা! কি সুবোধ বালক রে! যেন সাক্ষাৎ গোপাল।"

সলিল এবার না হাসিয়াই উল্টিয়া গম্ভীর মুখে জবাব করিল, "দিদি এটা বড্ড ভুল বল্লে,—গোপাল যাহা পায় তাহাই খায়, এটা কিন্তু ঠিক খাদ্য নয় !"

সুন্দরা আবারও হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর করিল, "অখাদ্যও তো নয় ! যাহোক, শোন সলিল, আসল কথা যা' তা' তোমায় বলি। অতুল গুপ্তর অবস্থা যতদূর দেখচি ও শুন্‌চি, তা'তে ভালই মনে হয়। লোকও তো খুবই ভদ্র, এবং মেয়েটী শিক্ষিতা এবং সুশ্রী—সবচেয়ে ওর গুণ, খুব নম্র ও শান্ত। তোমার এবং আমার খুবই মনে ধরেচে। সে সবই হলো বটে !—কিন্তু শুধু তুমি আমিই তো আর এ বিয়ের কর্ত্তা নই, তাই আমার একটুখানি দ্বিধা রয়েচে যে, মা যদি না মত করেন ? মা,—আমি যতদূর জানি, খুব ফর্সা রং চান, আর অত ডাগর মেয়ে চান না।"

এ ভয়টা সলিলের মনেও খুব বড় করিয়াই ছিল। কিন্তু সুন্দরাকে সহায় পাইয়া তার বুকের বল বাড়িয়া গিয়াছে। তাই সে দিদির সন্দেহে নিজের সংশয়কে আর যোগ দিতে পারিল না, উপরন্তু উহারই প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "কেন মার ছেলেটী কি একটী কচি খোকা যে

ডাগর মেয়ে তাঁকে গিলে খাবে ? আর গায়ের রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ? পেট তো আর তাতে ভরবে না।"

সুন্দরা কহিল, "মা হয় ত বলবেন,—'রং ধুয়ে না খেলেও, ছেলেমেয়ে ফরসা হবে'। মা আমার যে রকম সৌখীন মানুষ, কালো কালো নাতি নাত্‌নী হলে কি আর ছুঁতে পারবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সলিল সবেগে কহিল, "তোমার ছেলে মেয়েদের বুঝি ছুঁচ্চেন না ? মা যদি অতই রংয়ের ভক্ত, তাহলে কালো জামাইটী করলেন কি বলে ?"

সুন্দরা তার গলায় পরা বেশ বড় জাতের মুক্তামালাটী একটী চাঁপার কলির মত আঙ্গুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া, তাহা ভাইএর দিকে দোলাইয়া দিয়া মৃদু হাস্যের সহিত স্মিতমুখে উত্তর করিল, "মেয়ে এই সব পরবে বলে! তোমার বউ তো আর তোমায় চার হাজার টাকার হীরের চুড়ি, তিন হাজার টাকার মুক্তার মালা, পাঁচ হাজার টাকার হীরের নেকলেস কিনে দেবে না ?"

দুজনেই হাসিল, কিন্তু তাদের হাসির সেই কৌতুক উৎসের মুখ তখন যেন একটুখানি রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে বোধ হইল। হাসির আর তেমন স্বতঃ উৎসারিত প্রাণখোলা সুর নাই।

সুন্দরা কহিল, "অবশ্য আরতির বাবাও যে তোমায় দু'পাঁচ হাজারের হীরের চেন টেন না পরাতে পারেন, তাও নয়। তবে সেদিকে তো মার দৃষ্টি তেমন বেশি তীক্ষ্ণ নয়, বউএর সাদা রংটাতেই তাঁর লোভটা বড্ড বেশি।"

ঈষৎ ম্লান হইয়া গিয়া সলিল কহিল, "তবে কি মা মত করবেন না ? তোমার কি তাই মনে হচ্চে ?"

সুন্দরা ভাইএর আকস্মিক মলিন মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ স্নেহের হাসি হাসিয়া কহিল, "আমার মনে হয় মার মত হয়ে যাবে।"

সলিল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে?"

সুন্দরা কহিল, "তোমার মত বলে। তোমার অত পছন্দ জেনে কি আর অমত করবেন!"

সলিলের মুখের উপরকার সংশয়-মেঘ যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই ত্বরিতেই অপহৃত হইয়া গেল। সে উৎফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল, "তোমায় কিন্তু মত করাতে হবে, তা' বলে রাখচি। কিন্তু যদি না পারো?"

হাসিয়া সুন্দরা উত্তর করিল, "যে রকম তোমার অবস্থা-সঙ্কট দেখচি, তাতে যেমন করেই হোক, পারতেই হবে! যদি পারি, কি দিবি?"

সলিল কহিল, "কি নেবে বল?"

সুন্দরা বলিল, "একটা হীরের ব্রোচ, দিবি ত? না, 'কাজ ফুরুলে পাজি' করবি?"

সলিল হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "সন্দেহ হয়, না হয় আগামই নাও। কি রকম চাই? কত দামের? চেক দোব? না অর্ডার পাঠাব? কা'দের দোকানে? ঠাকুরলালদের?"

সুন্দরা হাসিতে লাগিল, বলিল, "ওঃ, ছেলে একেবারে দাতাকর্ণ! তোর আর তর সইছে না, না? দাঁড়া মা ফিরে আসুন, আমরা ফিরে যাই, তবে তো বলা-কওয়া হবে। তুই যে এখন থেকে ঘুষ খাওয়াবি, তা সে যদি ততদিনে পরে' পরে' পুরনো হয়ে যায়, তার ডাঁটটা ভেঙ্গে পড়ে, বাক্সে রেখে দিয়ে ভুলে যাই, তার চেয়ে সেই সময় দিস, কিম্বা দোব দোব করিস, তাহলে তবু লোভ লাগবে। আর লোভে লোভে কাজ এগিয়ে যাবে।"

সলিল সহাস্যে কহিল, "বেশ, তাই হবে।"

সুন্দরা বলিতে লাগিল, "আর দেখ ভাই, আমার একটা কাজ কিন্তু

তোকে করে দিতে হবে। দুখানা খুব ভাল কাজের সুরাট শাড়ী আমার চাই। তাদের ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি, তোকে কোন রকমে সেটা জোগাড় করে নিয়ে তাদের চিঠি লিখতে হবে। ডিজাইন রং সব আমি বলে দোব শুধু ঠিকানাটার জোগাড় তোকে করে দিতে হবে। অবশ্য এর দাম তোকে দিতে হবে না।”

সলিল ব্যগ্র হইয়া কহিল, “তা’ তাই যদি দিইই তাতেই বা ক্ষতি কি দিদি? দুখানা শাড়ী আর তোমায় তোমার ছোট ভাই দিতে পারে না?”

সুন্দরা কহিল, “ইঃ, আমার ছোট ভাই যেন আজ ‘কিমিচ্ছনে’র বত্ত করেচে গো! যে যা’ ইচ্ছা করবে তাকে তাই দেবে। না’রে একটু ঘটকালি করবো বলে, তোমার ওপোর তা’ বলে আর ডাকাতি করবো না। তবে ঐগুলো একটু একটু শিখে রাখ। দুদিন পরে বউএর ফরমাস তো খাটতে হবে, তখন যদি বলিস্ ‘জানি না তো,’—‘আমি কি ওসব কখন করেচি,’ বউ চটে যাবে। দেখেছিস তো, আরতি মেয়ে খুব সৌখীন। চুল বাঁধাটী, শাড়ী পরাটীর ছাঁদ একটু এদিক-ওদিক হ’তে পায় না! আর পরেও কত রকমের নতুন নতুন ধরণের শাড়ী। অতুল-বাবু ছেলে-মেয়েকে খুব বিলাসিতার মধ্যেই মানুষ করচেন!”

ইহার পর হইতে এই ভাই বোনের মধ্যে আড়াল পাইলেই এই আলোচনা যেন পাইয়া বসিল। মিঃ সেনকে অতুলবাবু প্রায় চৌদ্দ আনাই দখল করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। আর নিষ্কর্ম্মাবস্থায় দিন কাটানো কর্ম্মী সেনের পক্ষেও দুদিনেই দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। ড্রয়িং রুমে বসিয়া স্ত্রী ও শ্যালকের সহিত হাস্য পরিহাসের চেয়ে তাঁর তাই অতুলবাবুর সঙ্গে সমস্ত মুসুরী সহরটা ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের কাজকর্ম্মের সুবিধা অসুবিধার সম্বন্ধে আলোচনা করা মন্দ লাগিতেছিল না। এক সময় তাঁহাকে নিজের কাছে পাইয়া সুন্দরা

উহাকে অনুযোগ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, দিব্যি খাচ্ছো দাচ্ছো, বেড়াচ্ছো, যে লোকটা এত করে খাওয়াচ্চে দাওয়াচ্চে তার ধার শোধ দে'বার কথাটাও তো এক আধবার ভাবতে হয়! সে তো আর তোমার মক্কেল নয়, তার সঙ্গে একটা দেনা-পাওনা আছে বই কি!"

মিঃ সেন একটু যেন চকিত হইয়া উঠিলেন, "অতুলবাবুর কথা বলচো! হ্যাঁ, তা' হচ্চে বই কি! প্রায়ই চা, টা-গুলো খেতেই হয়। শুধু তাই বা কেন? ডিনারেও তো নিত্যি বলচেন! তা' তোমরাও তো পাল্টা বলতে পারো? আর না হয় গোটাকতক বাস্কেট পাঠাতে কল্‌কাতার লিখে দাও না। কিছু মিষ্টি, কিছু ফল, কিছু খেলনা, আর কি দিতে পারা যায়? অবশ্য ইনি কিছু মনে না করেন এম্‌নই ভাবের। ভারি ভদ্রলোক গো!"

সুন্দর মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল "ও তো গেল অতুলবাবুর ঋণের কথা! আর আমার ভাইএর?"

"ওঃ, ওই শালার কথা বলচো! ওর ঋণ কি এ জন্মে আর শোধ দিতে পারি প্রিয়ে! ও যে আমায় মূল্য দিয়ে কিনে রেখেছে: সেই যেদিন তোমাদের মা, আমার হাতে 'মাকু' দিয়ে 'ভ্যা' করতে হুকুম দিয়েছিলেন!"

হাসিয়া ফেলিয়া সুন্দরা কহিল "যাঃ-ও! ওসব কথার প্যাঁচে চলবে না! না, সত্যি, সলিলের কথা তোমরা মোটেই কেউ ভাবো না! ওর কি বয়স হচ্চে না? বয়সের ধর্ম্মটা কোথায় যাবে বল দেখি? মা তো স্বর্গের অপ্সরীর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন,—উর্ব্বশী কবে স্বর্গ থেকে নাচতে নাচতে নেমে আসবেন জানিনে; এদিকে ছেলে তো এই আরতির প্রেমে পড়ে গেছেন। এখন এর—"

স্ত্রীর বাক্য সমাপ্তির জন্য ধৈর্য্য না রাখিয়াই সহাস্য উচ্চকণ্ঠে মিঃ সেন

বলিয়া উঠিলেন "ব্রাভো! থ্রি চিয়ার্স ফর ইওর ব্রাদার্স লভ! নাঃ, ছোঁড়াটার বুদ্ধি এবং পছন্দ আছে! ডানকাটা পরীর পথ চেয়ে না থেকে, সে একটা মানুষের মতন জ্যান্ত মানুষকেই পছন্দ করেচে!"

সুন্দরা তার ঈপ্সিত বিষয়ে স্বামীর সহানুভূতি লাভ করিয়া প্রীত হইল। স্মিত-প্রফুল্ল মুখে মুখ তুলিয়া বলিল, "তা' তো আছে। এখন আমাদের ভাবনা হচ্চে যে, মার মত করাতে পারলে হয়। আরতি তো তেমন ফর্সা নয়।"

মিঃ সেন বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, ফর্সা নয়ই বা কেন? ওকে কি কালো বলে? কালো বলে এই আমাকে!"

সুন্দরা কহিল "তা বলুক,, তার জন্যে তো আর তোমার বিয়ে আটকায়নি, ওর কিন্তু হয় ত আটকাবে। মা যে মেমেদের মতন রং চাইচেন।"

মিঃ সেন অপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "আমাকেও যখন মেয়ে দিয়েচেন, ওকেও ছেলে দিতে আটকাবে না, অবশ্য তোমরা যদি ভাংচি না দাও!"

সুন্দরা ঠোঁট ফুলাইয়া সবেগে কহিল, "এই দেখ! আবার উল্টো চাপ! আমিই বলে প্রথম সম্বন্ধটা বার করলুম, আর আমিই ভাংচি দিতে যাব? আমার রংয়ে অত ঝোঁক নেই।"

মিঃ সেন মৃদু হাসিয়া অদূরস্থ আরসির দিকে চাহিলেন, "তা তো দেখতেই পাচ্চি! নৈলে যে অধীনকে এতদিনে ডিভোর্স্‌ড্‌ হয়ে যেতে হতো।"

সুন্দরা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "আঃ, যাঃ-ও! হিন্দু বিয়ের ডিভোর্স হয় কখন?"

করুণ মুখে সেন কহিলেন, "ওঃ, তাই জন্যেই পারোনি! কিন্তু ভাইয়ের তো তার জন্য আটকাবে না।"

সুন্দরা রাগিয়া কহিল, "ভাল লোকের সাহায্য চেয়েছিলুম! যাও, তোমায় কিছু করতে হবে না। যা পারি আমিই করবো।"

মিঃ সেন হাসিয়া একটা মোটা বর্ম্মা চুরোটের অগ্নিসৎকার করিতে করিতে সহাস্য সপ্রেম-চক্ষে স্ত্রীর কৃত্রিম কোপে ঈষদারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তুমি যখন ইচ্ছা প্রকাশ করেচ, তখনই তো সে আদেশ করা হয়েই গেছে। আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী হবে না। আরতিকে আমার ভালই লেগেছে। তুমি কিছু বলনি বলেই আমি এতদিন কিছু বলতে ভরসা করিনি মাত্র।"

ইহার পর সুন্দরা নিশ্চিন্ত মনেই আরতিকে সলিলের ভাবী বধূ রূপে কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। সলিলকে গিয়া জানাইল যে তার জামাই-বাবুও তাদের পক্ষে। এ ক্ষেত্রে মা নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন না। সে এমনও প্রস্তাব করিল যে আজই এ কথা সে অতুলবাবুকে জানাইবে। সলিল রাজী হইল না। সে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "মা না এলে তো কিছুই স্থির হবে না! অনর্থক এত আগে কথাটা তুলে একটা যেন সঙ্কোচের সৃষ্টি করা হবে না?" তার কোথায় আটকাইতেছে বুঝিয়া সুন্দরা মনে মনে হাসিল। লাজুক-স্বভাব সলিল একে বড় একটা অপর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কখনও মেশে না। তার উপর বিবাহের কথাবার্ত্তা উঠিলে তার আরতির সঙ্গে মেশা সমধিকরূপে অসুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। 'তবে এখন থাক' বলিয়া সে ভাইএর ইচ্ছারই সমর্থন করিল।

"ঐ শোন্ সলিল! আরতির গান কখনো শুনিস্‌নি যে বলিস্— ঐ শোন, গাইচে। বেশ গলা—না? মন্দ গায় কি? সেতারটাও বাজায় ভাল। আর একদিন তোকে শোনাব।"

বাস্তবিকই পাশের বাড়ী হইতে গানের শব্দ শোনা যাইতেছিল। অতুলবাবু এখানে আসিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। একটী মোটর

কোম্পানীর কতকগুলি কাজ তিনি পাইয়াছিলেন—বেশ একটা মোটা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তারই জন্য মধ্যে মধ্যে রাজপুর ও দেরাদুন তাঁকে যাতায়াত করিতে হইত। আজও তাই গিয়াছেন। তিনি আরতিকে বলিয়াছিলেন, মিঃ সেন ও সলিলকেও আজ সঙ্গে লইবেন। কিন্তু আর একটী সঙ্গী জুটিয়া যাওয়ায় সলিলকে আর সঙ্গে লওয়া যে হয় নাই, সে খবরটাই সে জানিত না। তাই নিশ্চিন্ত হইয়া যথেচ্ছভাবে গাহিতে বসিয়া গিয়াছে। নতুবা সলিল পাশের বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত সে গীত সংযম করিয়া ফেলিয়াছিল। গাহিলেও যে সময় সলিলের বাড়ী থাকার সম্ভাবনা নাই, তেমন সময়েই গাহিত।

আজ সে থিয়েটারে শোনা একটা গান গাহিতেছিল,—

> "আজি এসেছে তোমারে বঁধু, দিতে উপহার,—
> গগন পাঠায়ে দে'ছে, তারারই কিরণমালা
> শশি দেছে ঢেলে সুধাধার—"

সুন্দরা কান পাতিয়া শুনিল। তার পর ভাইয়ের দিকে হাসিয়া চাহিল, "ঐ শোন সলিল! তোকেই এ গান ও শোনাচ্চে! নিশ্চয় এই গানের মধ্য দিয়ে ওর নিজের মনের কথাগুলোই ব্যক্ত হচ্চে রে! নাঃ, এ বিয়ে ভাই, দিতেই হবে। আমার মনে হয়, ওরও তোকে খুব পছন্দ হয়েচে। আর তা' না হবেই বা কেন?"

দিদির কথার প্রলোভনে সলিলের এতদিনের নৈষ্ঠিক কৌমার চিত্ত আজ সহসাই তার চিরসংযত আত্ম-প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তন করিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তার সেই উৎসুক চিত্ত গভীর আগ্রহে উন্মথিত হইয়া উঠিল। সরল চিত্তে সে দিদির কথাকেই ধ্রুব জ্ঞান করিয়া লইয়া বিশ্বাস করিল, আরতিও তার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে।

মনে হইল, আরতিকে তার পাওয়া চাই-ই। তার মনে হইল, আরতিকে না পাইলে তার জীবনের সুখ চলিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পুলকাঞ্চিত শরীরে গীত-তন্ময়তায় ডুবিয়া থাকিয়া তার পর চকিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সে দিদির দিকে মুখ ফিরাইল,—"কিন্তু দিদি, যদি মা—"

সুন্দরা তার সংশয় বুজিয়া প্রশ্ন শেষের পূর্ব্বেই মৃদু অনুযোগে বাধা দিল, "কেবল মার জন্যেই ভয় পাস কেন? তুই কি খোকা? মার মত করানর ভার তো বলেইছি, আমার।"

সলিল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

আরতি তখন গাহিতেছিল,—"বঁধুহে ধরহে, পরহে—"

৯

সুন্দরা আশা করিতেছিল, চিরদিন যেমন হয়, কন্যাপক্ষ হইতেই প্রস্তাবটা উঠিবে; কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, সুযোগের পর সুযোগ আসিয়া আসিয়া কতবারই চলিয়া গেল, সে নিজেও কথাটা পাড়িবার মত সুবিধা বারম্বারই করিয়া দিল, তথাপি পাত্রীর পিতা একটী দিনের জন্যও এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিলেন না। তখন অগত্যাই অসন্তুষ্ট চিত্তে পাত্র পক্ষের ইজ্জত খাটো করিয়া সে নিজেই কথা পাড়িল।

দিনটা একটু গরম ছিল, বৈকালে তাই সেদিন অতুল বাবুর বাগানে চা পানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মিঃ সেনকে লইয়া অতুলবাবু মহোৎসাহে রাজনীতির অনধিকার-চর্চ্চা করিতেছিলেন, সুন্দরা আরতিকে একটা ক্রেপ-পেপারের রাঙ্গা গোলাপ তৈরি করিতে শিক্ষা দিতেছিল, আর

সলিল এই দুই দলের কোথাও বিশেষ ভাবে স্থান না পাইয়া শেফালি বিজলী মঞ্জু ও রঞ্জনে মিলিয়া যে দলটী হইয়াছিল, তাহাতেই নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তার কান এবং চোখ এ দুইটাই ছিল তার দুই দিকে। সে কখনও বা রাজনৈতিক ঈষদুষ্ণ তর্ক-চর্চ্চা শুনিতেছিল, কোথাও বা একটুখানি যোগও দিতেছিল ; কিন্তু চোখ দুইটা তার একই ভাবে নিবদ্ধ ছিল আরতির মুখে ও হাতে। তার খাটো খাটো আঙ্গুলগুলি একটী ফুলের পাপড়ী তৈরী করিতে কতবার নড়িয়াছে, সে কথাটা শুদ্ধ সে হয় ত বলিয়া দিতে পারে।

একটী আধফোটা গোলাপ তৈরী করা হইয়া গেল। আশে পাশে যেসব গোলাপ ফুটিয়া আছে তাদের সঙ্গে কিছুই ভেদ নাই! সুন্দরা খুসী হইয়া নির্ম্মাণকারিণীর গাল টিপিয়া দিল,—"ওরে আমার সোনারে!"—

আরতি ঈষৎ সলজ্জ স্মিতহাসে চোখ তুলিয়া চাহিতেই তার দৃষ্টি মিলিয়া গেল সলিলের সস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে।

এম্‌নই সময় সুন্দরা মন্তব্য করিল—"ভাল করে ফুলটা রেখে দিস্ আরতি! তোর ফুলশয্যের দিন মাথায় পরিয়ে দোব।"

আরতি আরক্ত হইয়া উঠিয়া দ্রুত চোখ নামাইয়া লইল—সলিলের ওষ্ঠে একটা উচ্ছ্বসিত কৌতুকহাস্যের উজ্জলতা সে দেখিতে পাইয়াছিল। সুন্দরা হাস্যস্মিত মুখে দুজনকার দিকেই চাহিয়া দেখিল।

অতুলবাবু প্রাণপণে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন ; কিন্তু বিপক্ষ ব্যারিষ্টার তাঁর মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতেছিল। সুন্দরা আসিয়া অসহায়কে সহায়তা করিল। সে জানিত, তার সঙ্গে তর্কে পরিণতির অপেক্ষা পরিণামের প্রতি ব্যারিষ্টার সাহেবের সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে সমধিক নিয়োজিত রাখিতে হইবে। ফলে অল্পক্ষণ পরেই তর্কটা

অমীমাংসিত অবস্থাতেই থামিয়া পড়িল এবং মিঃ সেনকে চোখের ইসারায় উঠাইয়া দিয়া সুন্দরা অতুলবাবুকে দখল করিয়া লইল।

সেন সাহেব ব্যাপারটা বুঝিলেন। তিনি উঠিয়া আসিয়া সলিলকে ডাকিয়া লইয়া আরতির সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন।

"এই ফুলটা আপনি তৈরি করেছেন? বাঃ, বেড়ে হয়েচে ত! তা, রেখে দিন, এর পরে 'বটনহোল' করে দিতে পার্ব্বেন!"

আরতি পুনশ্চ রাঙ্গিয়া উঠিয়া সলজ্জ স্মিত মুখে তৈরি করা ফুলটা মিঃ সেনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল,—"বেশ তো, করুন না বটনহোল।"—

মিঃ সেন অপাঙ্গে একবার আরতির আরক্ত মুখে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ফুলটী হাত পাতিয়া লইলেন। তার পর সেটী সলিলের কোটের বোতামে গুঁজিয়া দিতে দিতে অনুচ্চ স্বরে কি একটা ইংরাজী কথা উচ্চারণ করিলেন।

সলিল সস্মিত ভর্ৎসনায় "যান্" বলিয়া তিরস্কার করিল, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণের সুখস্মিত হাসির ছটাকে সে গোপন করিতে পারিল না, তার উন্মুখ দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই উৎসুক হইয়া আরতির মুখের উপর ছুটিয়া আসিল। সে দেখিল, সকালবেলায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশ যেমন কোমল আরক্তাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠে, এই সুন্দরী কুমারীটীর মুখেও ঠিক তেমনতরই একটী অরুণাভ দীপ্তি! আচ্ছা, এ'ও কি ঐ পূর্ব্বাকাশে উষা প্রকাশেরই মতই পূর্ব্বরাগ? আশায় আনন্দে সলিলের চিত্ত সুখ-স্পন্দিত হইল।

এদিকে সুন্দরা ততক্ষণে ভূমিকাপর্ব্ব সমাধা করিয়া প্রস্তাবনায় পৌছিয়া গিয়াছে।—

"আচ্ছা কাকাবাবু! আরতির বিয়ে দেবেন না?" এই যে প্রশ্নটা সে হঠাৎ করিয়া বসিল, এটা যে এত বড় অকরুণ ও আঘাতপ্রদ হইয়া উঠিতে

পারে, তাহা সে স্বপ্নেও জানিত না। তবে কথা এই, মানুষের শরীরের কোনখানটা যখন অসাড় হইয়া আসে, তখন চিকিৎসককে ব্যাটারী চালাইয়া সাড়া পাইতেও হয়!

সুন্দরার প্রশ্নে অতুলবাবুকে যেন অপরাধীর মত ভীত দেখাইল। যে মানুষটা অমন প্রাণ খুলিয়া অচেনা অজানা পরের সঙ্গে হাসিতে মিশিতে পারে, তার মনের মধ্যের কোনখানে যে কোন একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা লুকানো থাকিতে পারে, সে সন্দেহ কেই বা করিবে!

কিন্তু বাস্তবিকই সেটা ছিল।

অন্যায় হইতেছে, আরতির 'পরে অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে—বুঝিয়াও তিনি নিজেকে দুর্ব্বলতার হাত হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। এতদিন নিজের মনকে এই বলিয়া বুঝাইতেছিলেন যে, কি করিব, ভাল পাত্র না পেলে তো আর মেয়ে দেওয়া যায় না! যখন পাবো, তখন দোব। কিন্তু ইদানীং আর সে যুক্তিটা ঠিক মনের কাছে খাটিতেছিল না বলিয়া এই বিষয়টাকে তিনি তাঁর মনের মধ্য হইতে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিতই সরাইয়া রাখিতেছিলেন। যখনই সেটা জোর করিয়া তাঁর মনের উপর চাপিয়া বসিতেছিল, তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া তাকে শাসন করিতেছিলেন যে, "ছি ছি, তা কি হয়? ওরা কি মনে করিবে? লোভী বলিবে যে! ভাবিবে—এই মতলবে আমাদের এতটা যত্ন খাতির বুঝি!"

অথচ অন্তরের অগাধ পিতৃস্নেহ এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে কোনমতেই ক্ষমা করিতে চাহে না। সে কঠিন কণ্ঠে বলিতে থাকে—এই তোর ভালবাসা? স্বার্থপর আত্ম-প্রয়াসী এ স্নেহ, একান্তই অর্থহীন! নিজের জন্য ভাবিয়া মরিতেছ—মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিতেছ না!

মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া যাইতে হয়।

সুন্দরা আজ আঘাত করিল সেই মর্ম্মাঘাতের উপরেই। অতুলেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সুন্দরা ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল,—মেয়ে বড় করা মন্দ নয় বটে, কিন্তু তা' বলে তার একটা সীমাও তো নির্দ্দিষ্ট থাকা দরকার! বড় করতে হবে বলে তো আর বুড় করতে হবে না। আরতির বিয়ের বয়স তো হয়েই গ্যাছে, এইবার তার বিয়ে দিন না।"

কথাটা একটু কঠিন হইয়া গেল! অতুলবাবু ইহাতে যথেষ্ট লজ্জা পাইলেন। তিনি তখন ঈষৎ অপ্রভিত ও বিপন্ন ভাবে কিছু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলেন,—"বিয়ে ত দিতেই হবে। তবে সুপাত্র না পেলে—" ইত্যাদি আইবুড় মেয়েদের বাপের উপযুক্ত যাহা কিছু যুক্তি আছে, সকলই প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যপথে বাধা পড়িয়া গেল।

অতুলবাবুর এই খাপ-ছাড়া কৈফিয়তে শুধুই বিস্মিত নয়, ঘোরতর অসন্তোষভরা তীব্রকণ্ঠে সুন্দরা বলিয়া উঠিল,—"কি রকমের সুপাত্র চান আপনি? রাজা মহারাজা চান্ না তো?'

প্রশ্নটা যতই বিদ্বেষ জ্বালায় জ্বলন্ত, ততই শ্লেষাত্মক! এই তরুণীটির মনের ভাব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কিছুক্ষণ একটুখানি ব্যথা-বিহ্বল চক্ষে তাহার উত্তেজনারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর—অতুলবাবু ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"রাজা মহারাজা কিসের জোরে চাইতে যাবো মা! তা' নিশ্চয়ই চাইনে। তবে সাধারণতঃ যাকে আমরা সুপাত্র বলে থাকি, তেমনও ত চাইতে হবে?"

সুন্দরার গৌর মুখ অধিকতর রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে ভিতরে ভিতরে প্রচুরতর অবমানিত বোধ করিল।—বটে! তার ভাই এমনই তুচ্ছ! সে যেন "সাধারণ সুপাত্র"দের মধ্যেও গণ্য হইবার অযোগ্য! আচ্ছা— দেখা যাবে, কত বড় সুপাত্র আরতির জন্য তার বাপ জুটাইয়া আনেন।

একটুক্ষণ রাগে গুম হইয়া থাকিয়া অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—"সাধারণ সুপাত্র বল্‌তে আপনি কি রকম বুঝে থাকেন, তা' অবশ্য আমি জানিনে ; তবে আমরা অন্ততঃ যে রকম হলে তাকে সুপাত্র বলে থাকি, তার মতনও কি একজনকেও আপনি দেখতে পান্‌নি ?"

এই বলিয়া সে বিরক্তিভরে অতুলবাবুর বিস্ময়-বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

অতুলবাবুর মাথা, বুদ্ধি যেন কোথায় বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি এদিক-ওদিক আশপাশ হাতড়াইয়া হতাশ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কই মা ! তাই বা আমি পাচ্চি কোথায় ?"

সুন্দরা এবার রীতিমত চটিয়াছিল। তাই তার সেই রাগের মাথায় বাহির হইয়া গেল,—"কেন সলিল কি এতই মন্দ ?"—

এই কথা বলার পর আর তার রাগ করিবার কোনই হেতু রহিল না ! এই কথা শুনিয়াই অতুলবাবু এমন করিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন ও এমনই সুরে বলিয়া উঠিলেন,—"বল কি সুন্দরা ? এ' তো আমি মনে আন্‌তেই পারিনি মা ! এ যে আমার বামন হয়ে চাঁদে হাত !"

তখন সুন্দরার চিত্ত যতই তাতিয়াছিল, ততই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। নাঃ—তার ভাইয়ের মহিমাকে খর্ব্ব করা হয় নাই ; বরং গর্ব্বকে তার বাড়ানই হইয়াছে !

প্রসন্ন স্মিত মুখে উদার চিত্তে সে বলিয়া বসিল,—"অতই বা কেন মনে করেছিলেন ? আপনার মেয়েটী কি এতই তুচ্ছ ?"

কন্যা-গৌরবে ও আনন্দে মুগ্ধ হইয়া অতুলেশ্বর সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহলে আশা করতে পারি ?"

সুন্দরা কহিল—"আশা করা কি,—ভরসা করতে পারেন, এ বিয়ে দিতেই হবে।"

অতুলেশ্বর বিস্ময়াশ্চর্য্যে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁর নাসাপথ দিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—"সত্যি কথাই বল্‌বো মা! তোমায় আমি লুকবো না। আরতির বিয়ে দেবার কথা ভাবতে গেলে আমি জ্ঞান হারাই! তাকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে, আমি যে কেমন করে টেঁকবো, সে আমি ভেবেই পাইনে! তার উপর মঞ্জু—তার কি হবে! অনেকটা এরই জন্যে আমি তার বিয়ের কথা এতদিন ঠিক ভাল করে ভাবিনি। কিন্তু এ যদি সত্যিই হয়, তাহলে এর পরেও এ সম্বন্ধে উদাসীনতা আমার পক্ষে যেমন পাপ, তেমনই অপরাধও। তাহলে মা, তোমার মাকে জানিয়ে তাঁর মতটা পাবার ব্যবস্থাটা—"

সুন্দরা উদ্‌গ্রীবভাবে বাধা দিয়া সুপ্রফুল্লমুখে কহিয়া উঠিল, "সেজন্য ব্যস্ত হচ্চেন কেন? সে ভার আমার, আপনার নয়। মা অমত করবেন না।"

অতুলেশ্বর শিশুর মত চঞ্চল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"করবেন না ত? দেখিস বেটি! গাছে তুলে দিয়ে যেন মই কেড়ে নিস্‌নে। তবে শোন মা! আমারও ওই প্রতিজ্ঞা ছিল যে আরতিকে যে যেচে নেবে তাকেই দোব। ও যে আমার মা কি না, মেয়ে তো নয়, যে, কারু গলগ্রহ করে দোব। আজ আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো।"

বলিয়া হা-হা করিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

দিনগুলা স্বপ্নের মতই কাটিতেছিল, বাতাসের মতই তা বহিয়া চলিয়া গেল। উভয় পক্ষেরই এইবার বাড়ী ফিরিবার পালা। অতুলেশ্বর-বাবুর হৃত স্বাস্থ্য সম্পূর্ণই ফিরিয়া আসিয়াছে। ওদিকে অফিস হইতে শীঘ্র ফেরার জন্য বিশেষ ভাবেই তাগিদ আসিতেছে। মিঃ সেনেরও কাজ-কর্ম্মের তাগাদা আছে। আর সলিলের মার শেষ-পত্র পুরী হইতে পাওয়া গিয়াছে,—তিনি এইবার বাড়ী ফিরিবেন। কাজেই সকলকার পক্ষেই এখন প্রত্যাগমনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রার জন্য একই দিন স্থির হইল।

সেদিন অতুলবাবুর বাড়ী সকলকার নিমন্ত্রণ। রাত্রি সেদিন শুক্ল-পক্ষের। তার উপর মেঘ বা কোয়াসাও তেমন ছিল না। সাম্‌নের বারান্দায় বসিয়া গল্পালোচনার পর, সুন্দরা বলিয়া বসিল, "আজ একটা গান তুমি সলিলকে ভাল করে শোনাও আরতি!"

আরতির মুখ এই আদেশে লাল হইয়া উঠিল। এর ইঙ্গিতটুকু সে বুঝিয়াছিল। সে সলজ্জে দু-একটা ওজর-আপত্তি করিয়া যখন সুন্দরার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখিল না, তখন অগত্যাই উঠিয়া ঘরে গেল। ঘরের মধ্যে সুন্দরার ছোট ছেলের সঙ্গে মঞ্জু তার ছবির বই, টিনের মটর এবং কলের জাহাজ লইয়া খেলা করিতেছিল। আরতি হারমোনিয়ামের ঢাকা খুলিতেই মঞ্জুও ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—

"ডান ডাইবি ডিডি সোনা? 'টট আশাটরে' টা-ড়ানা ভাই!"

আরতি হাসিয়া মঞ্জুকে আদর করিয়া বলিল, "ওটা তুই গাস ভাই, কেমন আমার সোনা ভাইটী? আমি আর একটা কিছু গাইচি।"

এই বলিয়া বাজনার আঙ্গুল রাখিয়া চিন্তিত ভাবে ছোট্ট ভাইটীকে প্রশ্ন করিল,—“বল্‌না রে সোনা ভাই! কোন গানটা গাইবো?”

মঞ্জু এক-মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া উত্তর করিল, “টাহলে সলিল বাবুকে ডিজ্ঞেস ক’রে নাও।” এই বলিয়াই ডাক দিল,—

“সলিলবাবু! সলিলবাবু! একটু ঠুনে ডান্‌টো!”

“এই বাঁদর ছেলে! ও কি কর্‌চিস্‌—শীগ্‌গির থাম—”

বলিতে বলিতেই—“কি বলচো মঞ্জু?” বলিয়া সলিল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। এমন সুযোগটাকে প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে যে এখন একেবারেই সম্ভব নয়।

সলিলকে দেখিয়া আরতি লজ্জা পাইয়া বলিল, “ওর দুষ্টুমী—আর কিচ্ছুই নয়—”

কিন্তু মঞ্জু তার প্রতি আরোপিত এ অপরাধ স্বীকার করিল না। সে দুষ্টু হাসিতে পাতলা ঠোঁট-দুটী ভরাইয়া লইয়া ক্রূর বক্র চক্ষে দিদির দিকে চাহিয়া সলিলকে বলিল, “ডুট্টুমী নয় সলিলবাবু! ডিডি আপনাটে ডিজ্ঞেস টরলে টি ডান ডাইবে? বলে ডিনটো।”

আরতি লজ্জারুণ মুখে “যা বাঁদর!” বলিয়া সবেগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দুষ্টু মঞ্জু ছুটিয়া পলাইল। আরতি তাহাকে একটা কিল দেখাইয়া শাসনভরা কণ্ঠে কহিল,—“আচ্ছা তোলা রইলো,—কাছে কি আর আসবি না না কি?”

“ডুষ্টু ডিড়ি!” বলিয়া দূর হইতে ছোট্ট হাতের কিল উঁচাইয়া ভাইও বোন্‌কে শাসাইল, “আচ্ছা আয় না, আয় না, টুই টি টাছে আসবি না? আয় না।”

তার পর যদি দিদি সত্য-সত্যই মারিতে আসে, সেই ভয়ে পরাভব স্বীকার করিয়া লইয়া মিনতির স্বরে কহিল,—

"সোনা ভাই! না ভাই, লক্ষ্মী ভাই মালিসনে ভাই, আল টট্‌ঠোন সলিলবাবুকে ডাটবোনা, টট্‌ঠনো না।"

ততক্ষণে সলিল একটুখানি অগ্রসর হইয়া বাজনাটার অপর পার্শ্বে আরতির সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভাইবোনের ঝগড়ায় সে নিরপেক্ষ থাকিয়া নিঃশব্দেই হাসিতেছিল। ঝগড়া মিটিতে দেখিয়া কথা কহিল; বিনম্র মিনতির সহিতই কহিল, "কিন্তু আমাদের দেশে যে একটা মেয়েলী-প্রবাদ কথা আছে—'কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই,'— —এলাহাবাদে বসে সে কথাটা তোমার জানা আছে কি না জানিনে।— আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে গিয়ে আমি ঢেরবার সেটা শুনেছি, তার এখন কি উপায় করবে বল ত?"

সুন্দরার প্রমুখাৎ অতুলবাবুর সম্মতির কথা জানিয়া অবধি সলিল এই রকমই দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছিল,—আরতিকে সে নিতান্তই নিজের ভাবিয়া আর আপনি পর্য্যন্ত বলিল না।

ইহাতে আরতির ললাট, গণ্ড ও কর্ণমূল অবধি রাঙ্গিয়া উঠিল। সে তার লজ্জানত নেত্র দুটী বারেকমাত্র তুলিয়া হর্ষ-স্মিত এবং সরম-শঙ্কিত চকিত দৃষ্টিটুকু চপলা-চমকের মতই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণিকমাত্র সলিলের প্রত্যাশা-পন্ন ব্যগ্র নেত্রের উপর স্থাপন করিয়া পরক্ষণে সমধিক লজ্জারুণতায় আরক্ততর হইয়া উঠিলেও মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল,—

"শাকের ক্ষেত আমি তো কাঙ্গালকে দেখাই নি, যে দেখিয়েছে তাকেই বলুন।"

সলিল এই উত্তরে প্রোৎসাহিত হইয়া কহিল,—"নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে টেলিপ্যাথির কাজ হ'য়ে গ্যাছে, নৈলে ও কেন হঠাৎ এমন কথা বলতে গেল? তা যা'হোক, তুমি যা গাইবে আমি তাই আনন্দের সঙ্গেই শুনবো। তবে অবশ্য সেদিনের সেই 'এসেছি তোমারে—দিতে উপহার'

—সেটা যদি আজ আর একবার শুনতে পাওয়া সম্ভব হতো, তাহলে—”

হঠাৎ সলজ্জ-চমকে চকিত হইয়া উঠিয়া আরতি সবেগে কহিয়া উঠিল, “আপনি বুঝি সে গান শুনেছেন? ও মাগো! আমি কোথা ভাবলুম আপনি বাড়ী নেই! না যান্! এ ভারী অন্যায় কিন্তু!—”

সলিল সকৌতুকে হাসিতে লাগিল, “বাঃ! গান শোনালে তুমি, আর দোষটা হলো আমার? বেশ বিচার তো? না—সত্যি, ভারী চমৎকার গলা তোমার! কার কাছে শিখেছিলে?”

লজ্জায় রাঙ্গিয়া আরতি মুখ ফিরাইয়া সব্যঙ্গ পরিহাসে কহিল, “হ্যাঁ তা বৈ কি! ভাল নয় কি না, তাই বলা হচ্চে! আচ্ছা আমিও আপনার গান শুনিনি যেন? হ্যাঁ! আমিও ওই রকম চুরি করেই শুনেছি,—বেশ করেছি।”

সলিল ভান করিয়া নয়, সত্য সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়া সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল,—

“গান? আমি? আমি গান গেয়েছি? কই, না!” তার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, “আমার অতিবড় শত্রুতেও আমায় এতবড় অপবাদ দিতে পারবে না। আর তাছাড়া আমি যদি গান গাইতুম, তাহলে এতক্ষণ আমায় কি এখানে তিষ্ঠে থাকতে দিত, ধোপার বাড়ীর দরজায় দড়ি-দড়া দিয়ে বাঁধা পড়ে যেতুম যে!”

শুনিয়া আরতি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার রাগ, লজ্জা সব কোথায় ভাসিয়া গেল। খানিকক্ষণ হাসিয়া সে হাস্যাস্পদের হাস্য-প্রসন্ন মুখের উপর সহজ কৌতুকে চাহিয়া সহাস্য কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

“তা বৈ কি! আর সেই অনেক রাত্রে সেই—“I love you, love you dear Fanny” সে কে গাইছিল? আমি যেন শুনতে পাই নি, না?”

এবার সলিলের গৌর ললাট সহসা রাঙ্গিয়া উঠিল। তার সপ্রতিভতায় সমুজ্জ্বল দৃষ্টি অপ্রতিভতার লজ্জায় ঈষৎ নত হইয়া আসিল, কিন্তু তার পরক্ষণেই যেন একটা নূতন আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া সে প্রীতি-স্মিত মুখে আরতির আরতি-প্রদীপ সদৃশ চক্ষু দু'টির মধ্যে গভীরভাবে চাহিয়া কোমল স্বরে কহিল,—

"ও তো আমার গান নয় আরতি!"

আরতি না বুঝিয়াই প্রশ্ন করিল, "তবে কি?"

সলিল মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল,—"soliloquy," কণ্ঠে তার আবেগের স্পন্দন ঈষৎ কম্পন আনিল।

আরতি সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, "soliloquy! বাঃ! আর আমার বেলায়ই বুঝি তাহলে সেটা গান? আমারও তবে সে গান নয়!"

সলিল হাসিল। অত্যন্ত সুখের সানন্দ হাস্যে তার সুন্দর মুখ সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রকৃতির মতই সুন্দরতর হইয়া উঠিল। কৌতুক ভরে সে কহিল—

"যাক্, বাঁচা গেল! তোমায় Soliloquy টাও তাহলে শুনে নেওয়া গেছে। গান যে ওটা নয়, সেই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট!"

আপনার ফাঁদে আপনি জড়াইয়া পড়িয়া আরতি তখন লজ্জা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এক হাত জিব কাটিল। সলিল সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে কহিল, "যাক্, তাহলে আর নূতন করে আমার কিছু জানবার দরকার হচ্চে না। যা জানবার ছিল, তা ওই "সলিলকি" থেকেই জানা গিয়েছে!—এখন আমার পাওনা গানটা শুনিয়ে দাও, সেটাই বা আমি ছাড়ি কেন?"

"যান্—আমি গাইবো না"—বলিয়া আরতি মুখ ভার করিল; কিন্তু চোখে তার মুখের ছবি ফুটিল না, ঠোঁট দু'টাই একটু ফুলিল।

সলিল ব্যস্ত হইয়া একটু কাছে আসিল, হাত যোড় করিল, "না না, রাগ করো না, ক্ষমা চাইচি, ও "সলিলকির" কথাটা কারুকে বলবো না,—তোমাকেও আর বলবো না—ও শুধু আমারই একার জানা থাকলো। গাও, একটা লক্ষ্মীটী! যা হয়, তোমার যেমন ইচ্ছে একটা গাও। এমন কি তুমি যদি এখন 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'—বলে গান ধরো, তাতেও আমি ভয় পাবো না। সে ভয়ঙ্কর দিনটাকেও আজ থেকে আমার সুন্দর বলে মনে হবে। আরতি! যেদিন এ বাড়ীতে এই ঘরে প্রথম এসে ঢুকেছিলেম, সে আমি ভিখারীর মতই ঢুকেছিলেম বটে, কিন্তু আজ আর তা' নেই,—আজ আমি আমার আশা স্বপ্নের সপ্তম স্বর্গে অধিষ্ঠিত! আজ আমি রাজা। না না, তুমি রাগ করো না, আর ওসব কথা বলবো না, তুমি গাও। কেবল একটী কথা,—আমাদের সব তো ঠিকই হয়ে গেছে, তুমিও তা নিশ্চয় শুনেছ? আমি তোমার এই ম্যাণ্টালপিসে রাখা ফটোখানা নিয়ে ওর জায়গায় আমার খানা রাখলুম। যদিও দেখতে খারাপ হলো, তবু এটুকু সইতেই তো হবে? উনি দেখলে কিছুই বলবেন না, বুঝতেই পার্ব্বেন। শুধু সামলে নিও ওই দুষ্টু মঞ্জুটাকে।"

এই বলিয়া সলিল ফটো দু'খানা বদল করিয়া, আরতির ফটোখানায় এক মুহূর্ত্তকাল স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া পরে নিজের পকেটে রাখিয়া দিল। আরতিও তার অজ্ঞাতসারেই সলিলের হাস্য-বিকসিত সুন্দর মুখের প্রতিকৃতিখানা চকিত নেত্রে দেখিয়া লইল। সলিল উহা দেখিল এবং মৃদু হাসিল।

"এখন গান হোক্—" বলিয়া সে একটু দূরে সরিয়া আসিয়া একটা চেয়ার লইয়া বসিল, "গাও আরতি! না সত্যি গাও।—"

আরতি নড়িল না। এই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির পর তার সকল মুখরতাই যেন শেষ হইয়া গিয়া একটা সুগভীর অনুরাগে ভরা নিবিড় লজ্জায় তাহার

কুমারী চিত্তকে যেন নবোঢ়ার মত ছাইয়া ফেলিয়াছিল ; সে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিতেছিল না।

তার অবস্থা বুঝিয়া সলিল ডাকিল, "দিদি!"

সুন্দরার কৌতূহলী চিত্তটী তার ভাইয়ের পিছনে পিছনে এই দিকেই ছুটিয়া আসিয়া এতক্ষণ ছটফট করিতেছিল। সে যে উঠিয়া আসিয়া দ্বারের পর্দ্দার বাহিরে আড়ি পাতিতে আসে নাই, সে শুধু অতুল বাবুর খাতিরে। তিনি উপস্থিত না থাকিলে এ সুযোগ সে ছাড়িত না। এখন সলিলের আহ্বান তাহাকে মস্ত সুবিধা করিয়া দিল। স্নেহ মধুর হাসিভরা মুখে সে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"কি রে? ডাকলি যে?"

সলিল অনুযোগপূর্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল—

"গান শোনবার হুকুম দিলে, তা শুনতে পাওয়া গেল কই?"

সুন্দরা অগ্রসর হইয়া কহিল, "সত্যিই তো, আমি বলি তোর কানে কানেই বুঝি শুনিয়ে দিলে, আমাদের কান এড়িয়ে। তুইও তাহলে শুন্‌তে পাস্‌নি?"

সলিল হাসিতে হাসিতে কহিল "উঁহুঁ।"

সুন্দরা আরতির নত মুখ তুলিয়া ধরিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁরে! গানটা শুনিয়ে দে', না শুনে আর তো ও এখন ছাড়বে না, তা' বুঝতেই তো পাচ্ছিস্‌?"

আরতি অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—

"উনি যা, যা' তা, বলচেন, আমি শোনাবো না।"

সুন্দরা ভাইএর দিকে ফিরিয়া কহিল—

"কেন রে তুই ওকে যা' তা' বলচিস্‌? যা' তাই কেন বলচিস্‌ না?" আরতির দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,

"কি যা' তা' বলচে রে আরতি ? আমায় সমস্ত বল তো !"

সলিল প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, "কিচ্ছু যা' তা' বলি নি দিদি ! শুধু গান গাইতে বলছিলুম। জিজ্ঞেস করতো কি বলিছি,—আচ্ছা একটা বলুক।"

আরতি তার ডাগর চোখ আরও বড় করিয়া টানিয়া সবেগে উত্তর করিল "একটা কেন হাজারটা বলতে পারি ; কিন্তু একটাই বলচি,— উনি আমায় 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' গান গাইতে বলচেন।—ও গান আমি জানিও না, আর জানলেও কিন্তু গাইতুম না। বাবা ও-সব গান গাওয়া ভালবাসেন না। বলেন, সে যখন হবে, তখন হবে—এখন থেকে তার ভাবনা কেন ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুন্দরা কৃত্রিম কোপে সলিলের প্রতি সতর্জ্জন তিরস্কার হানিল "ভাগ্! বদছেলে

আরতিকে কহিল, "খবরদার ! ওর ওই-সব বদ আবদার কক্ষন শুনবিনে ! তুই আমার কথা শোন ভাই,—'ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি—' এই গানটা গা,—কি, না, না—ওটা বরং এখন থাকগে—ওটা তোকে সেই আর একদিন তখন গাওয়াবো, আচ্ছা আজ গা দেখি,—

ওহে সাধন দুর্ল্লভ ; ওহে জীবন বল্লভ,
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব ;
শুধু নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেম মূরতি তব।"

এ থেকে আমার ওই মুখ্যু ভাইটী যদি নিজের দিকের উপযোগী কোন মানে বের ক'রে নেয়, তাহলে জানবি, সেটা ওর নিছক বোকামী !— কারণ, এ-সব মানুষের জন্যে নয়। এ-সব বড় বড় ব্রহ্ম সঙ্গীত,—এর ভোক্তা হচ্ছেন স্বয়ং পরব্রহ্ম ! নে', তুই গেয়ে নে' ভাই—অনেক রাত হয়ে যাচ্চে ! সকালে উঠেই তো আবার যাবার উদ্যোগ।"

এই, অনাত্মীয়া কল্পিত-আত্মীয়া যে দুই ভাই বোনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল, সেটা বিশেষ করিয়া ধরা পড়িল এলাহাবাদ যাত্রার জন্য প্রতাপগড়ে কলিকাতাগামী দেরাদুন এক্সপ্রেস বদল করিয়া আরতিদের গাড়ি ছাড়ার পর।

বিদায় কালে অতুলবাবু সুন্দরার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তাহলে তোমার উপরই সব নির্ভর করে রইলো মা আমার! এই আষাঢ়েই যখন তোমাদের ইচ্ছা, তখন সেই রকম ব্যবস্থা করেই আমাকে জানাবে। আমিও এর ভিতর কোম্পানীর কাজকর্ম্ম ঠিক করে ফেলে এদিকের ব্যবস্থায় মন দোব।"

সুন্দরা উঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া কহিল, "সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মার সঙ্গে কথা কয়ে দিনক্ষণ স্থির করে একেবারেই আপনাকে খবর দোব।"

আরতির ছল ছল চোখের দিকে চাহিয়া নিজের সজল নেত্র মুছিতে মুছিতে কহিল,—

"চিঠি পত্র দিস্ ভাই আরতি।"

আরতি ম্লান মুখে ঘাড় নাড়িল। তার পর উহারা নামিয়া গেলে ট্রেন ছাড়িয়া দিলে, প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে ট্রেন চলিয়া গেলেও জানলার মধ্য দিয়া সজল চোখে সুন্দরা ও সলিল নির্নিমেষে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল। আরতির চোখের জলও যেন চাপা থাকিতেছিল না। মাতৃহীনা আরতি সুন্দরার স্নেহে যেন তার চির-অজ্ঞাত একটা নূতন স্বাদ পাইয়াছিল, তার হারানো মাতৃস্নেহেরও একটুখানি আভাষ তার মধ্যে জাগ্রত আছে। আর সলিল,—আরতির উভয় গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল,—কি সুন্দর তার মূর্ত্তি, কত উচ্চ তার শিক্ষা, দীক্ষা, ভব্যতা; আর সেই সঙ্গেই কি তেম্নি স্নেহভরা চিত্ত!

এতবড় একটা প্রচণ্ড আশাকে হৃদয়ে বহন ও পোষণ করিয়া লইয়া ভাই-বোনে যখন হাসিমুখে বাড়ী ফিরিল, তখন স্বপ্নেও তারা ভাবে নাই যে তাদের আশা আকাশ-কুসুমের অবাস্তব ব্যাপারেই শুধু পরিণত হইয়া যাইবে !

মহামায়া ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্যোন্নতি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন, তাঁর তীর্থ-শ্রম-ক্লিষ্ট ক্লান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ইহারা অনুযোগ করিল ; তার পর হঠাৎ কথাটা আপনা-আপনিই উঠিয়া পড়িল।

মহামায়া কহিলেন, "আর কি শরীরটী নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার কাল তোদের মায়ের আছে রে ? এইবার তোরা বড় হয়েচিস্, মায়ের দায়িত্ব কেটে গ্যাছে, বউ আন্ ঘরে, আমি এবার তীর্থধর্ম্ম করে ঘূরে ঘূরেই বেড়াই।"

সলিল স্মিতমুখে হাসিয়া মুখ নত করিল। সুন্দরা সোৎসাহে উত্তর করিল,—"তোমার বউ আমরা ঠিক করেচি মা !"

মহামায়ার মুখ সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইল।—দুই কারণেই ইহা হইতে পারে।—এক, এত সহজেই তাঁর মুক্তির আবেদন মঞ্জুর হইতে দেখিয়া ; —দ্বিতীয়, ছেলেমেয়েরা যে তাঁকে না জানাইয়া নিজেরাই স্বাধীন ভাবে বধূ-নির্ব্বাচন করিল, সেটা হয় ত তাঁর মনে ধরে নাই। অনুৎসুক ভাবে, প্রশ্ন করিতে হয় তাই প্রশ্ন করিলেন,—

"কোথায় ?"

সুন্দরা মায়ের মুখ-ভাবের বা কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিয়াই একান্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল,—

"ঐ মুসুরিতেই তাকে পেয়েছি। মেয়েটীর নাম আরতি। সুন্দর মেয়েটী, মা! চোখ দু'টী যেন ঠিক দু'টী আরতি-প্রদীপ! রং যদিও খুব ধপ্‌ধপে ফরসা নয়, তবু ফরসা বলা চলে। কিন্তু শ্রীটা খুবই বেশি! আর লেখাপড়া, বাজনা, গান, শিল্প—সব বিষয়েই বেশ শিক্ষিতা। স্বভাবটীও আবার তেমনই, নম্র অথচ মিশুক। বউ তোমার যা করে দিচ্চি মা! দেখবে তখন, এ-রকম তোমার বাবাও খুঁজে বার্ করতে পারতো না! আচ্ছা মা! আমায় কি দেবে বল?"

মহামায়া মেয়ের কথায় কোন জবাব করিলেন না,—একবার শুধু অপাঙ্গে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে গভীর ঔৎসুক্যে মার মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। মার চাহনি তার দৃষ্টিকে নত করিয়া দিল; কিন্তু তার ঠোঁটের কোলে মৃদুমন্দ হাসিটুকু ইহাতে ঢাকা পড়িল না।

মহামায়ার গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হইয়া আসিল। ক্ষণকাল তিনি নীরবেই হয় ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। তার পর তাঁর মুখ হইতে যে কথাগুলি বাহির হইয়া আসিল, তাহা শ্রোতা দু'টীর খরতর আশা-স্রোতকে যেন পাহাড় ধ্বসাইয়া একেবারে প্রতিহত করিয়া ফেলিল। মহামায়া উত্তর করিলেন,—

"অত ভাল বউ আমার কপালে লেখা থাকবে তবে তো হবে! আমি সলিলের বিয়ে ঠিক করে, তাদের পাকা কথা দিয়ে, তাদের কাছে সত্যবন্দী হয়ে এসেছি। আসছে মাসের সতেরই তারিখে দিন স্থির পর্য্যন্ত হয়ে গ্যাছে।"

সুন্দরা সভয়কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"সে কি মা!"

সলিল বসিয়া ছিল, চমকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মহামায়া কহিলেন, "খুবই যে অদ্ভুত কাণ্ড কিছু একটা করা হয়ে গ্যাছে তা' তো আমার কই বোধ হচ্চে না সুন্দরা! আমাদের সঙ্গে আর

একদল যাত্রী বেরিয়েছিল। তাদেরই সঙ্গী একটী মেয়ে,—আহা রূপে যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতীর মতন। কোনখানে আর কোন খুঁত ওর মধ্যে নেই। ঘরটাও তাদের খুব ভাল। শুধু ওরা গরীব, এই যা একমাত্র দোষ! আর তারই জন্যে অমন মেয়ের যোগ্য পাত্র পাওয়া যাচ্চে না। আমি তাই ওকেই বউ করবো বলে স্থির করেচি। তীর্থ-স্থানে কথাও দেওয়া হয়ে গ্যাছে। কাজেই দেখচো, এ বিয়ে এখন দিতেই হবে।"

মার স্বভাব ছেলেমেয়ে দু'জনেই জানে। সলিলের মুখ ম্লান হইয়া গেল, সুন্দরা শুষ্ক হইয়া উঠিল। মার কথার উপর কোন দিনই ইহারা কথা কহে নাই; কিন্তু এতবড় বিপদেই বা আর কখন্ তারা পড়িয়াছে? সুন্দরা তাই অবশেষে মনে ঈষৎ সাহস সংগ্রহ করিয়া লইয়া ঈষৎ ভয়ে ভয়ে কহিল,—

"কিন্তু মা, আরতির বাবাকেও যে আমরা কথা দিয়ে ফেলেচি, তার কি হবে? আরতিও খুব স্পষ্ট করে জেনেচে যে, সে আমাদের বউ হবে, এখন কি বিয়ে না দেওয়া ভাল হয়?"

মহামায়া কথাগুলি স্থির হইয়া শুনিলেন। তাঁর মনের ভিতরটা তীব্র অভিমানের দহনে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মেয়ের কথার উত্তরে ছেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্রোধ-প্রচ্ছাদিত গাম্ভীর্য্যের সহিত শান্ত স্বরেই এই প্রশ্নটী করিলেন,—

"তুমি যে নিজের জন্যে নিজেই পাত্রী স্থির করে নিয়েছ, সে কথাটা তোমার আমাকে চিঠি লিখে একটু জানানো উচিত ছিল সলিল! তাহলে আমায় পরের কাছে এতটা হীন হ'তেও হতো না, ধর্ম্মের কাছেও পতিত হ'তে হতো না। আমি যে কথায় খেলাপ করি নে, সেটা তোমার অন্ততঃ জানা উচিত ছিল তো?"

সলিল তার প্রতি আরোপিত এই অভিযোগের বিপক্ষে একটী কথাও কহিল না। ইচ্ছা করিলে সে বলিতে পারিত যে, তুমি যে তীর্থ করিতে গিয়া কনে ঠিক করিবে, সে আমি তো খড়ি পাতিয়া গুণিতে জানি না যে জানিব? তাহা না বলিয়া যেমন তেমনই নির্ব্বাক্ নিশ্চল সে দাঁড়াইয়া রহিল। মনটা কিন্তু তার ঠিক নীরব রহিল না।

তথাপি সুন্দরা পুনশ্চ মিনতি করিয়া বলিল,—"মা, তুমি আরতিকে দেখলে খুসীই হবে। অমন মেয়ে সহজে কেউ পায় না মা! যেমন তোমার একটী বউ, ওই রকমই করতে হয়। তারও মা নেই, সেও তোমায় পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়ে একেবারে তোমার হয়ে যাবে। আর সলিল যে এ বিয়েয় সুখী হবে, এটা খুবই নিশ্চিত—"

মহামায়া আহত বিরক্তির কঠিন চক্ষে চাহিয়া সহসা তীব্রকণ্ঠে বাধা দিলেন,—

"থামো সুন্দরা! সলিলের ভালমন্দ, সুখদুঃখ যদি সলিল ও তুমি এতই বুঝতে শিখে থাক, তা'হলে তোমরাই এবার থেকে সব ভার নিয়ে নাও, আমিও মুক্তি পাই।"

বলিতে বলিতে তাঁর মুখ লাল হইয়া উঠিল, গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চ হইয়া উঠিল, কহিলেন,—

"কিন্তু আমায় পরের কাছে খেলো করে, সত্যের কাছে অপরাধী করে তোমাদের ইচ্ছায় যা ঘটাবে, আমি তা'তে নেই, এটাও এই সঙ্গে জেনে রেখ। তা' হোক, এখন সলিল বড় হয়েচে, সাবালক হয়েচে,—তাকে আর তার বিষয়-সম্পত্তিকে রক্ষা করবার জন্তে আর তার মায়ের দরকার হবে না, অনায়াসেই সে নিজের ভার নিজেই এখন বইতে পারবে। তাই ভাল, আমি কাশী চলে গেলে তোমরা বিয়ে দিয়ে বউ এনো।"

এ রকম কথা সলিল বা সুন্দরা এ পর্য্যন্ত তাদের মায়ের মুখে কোন

দিনই শোনে নাই। তাহারা একই আঘাতে একসঙ্গে দু'জনেই যেন বজ্র-স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মহামায়া উঠিয়া গেলেন।

ব্যাপারটা যে এমন মূর্ত্তিও ধরিতে পারে, এ সম্ভাবনা সুন্দরা একবারের জন্যও মনে করিতে পারে নাই। মাকে সে সন্তানবৎসলা স্নেহময়ীই দেখিয়াছে,—তা-ই সে জানে। সেই বাৎসল্য-স্নেহ-সমুদ্র যে প্রতিহত হইলে এমন তীব্র তুফান তুলিতেও সমর্থ, সে কথা এর আগে কে জানিত? তা' জানিলে এতবড় কাণ্ডটা এমন করিয়া সে কি বাধাইয়া বসিতে ভরসা করে? কিন্তু এখন উপায় কি? এ কি হইল? এ যে হিতে বিপরীত ঘটিয়া গেল? এখন এই যে আগুন সে জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, এ নিবাই-বার উপায় কি? সুন্দরা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিল। তার মনের ভিতরটা আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায় অস্থির হইয়া উঠিল। কেন সে মরিতে এমন দুর্ব্বুদ্ধির কাজ করিতে গিয়াছিল! সলিলের মনটাকে লইয়া সে যে এই খেলাটা খেলিয়াছে, আরতির মনেও হয় ত ইহার একটা দৃঢ় স্থির ভিত্তি গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, এর এখন প্রতিকার কোথায়? ছি ছি ছি, এই অক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কারকে সম্বল করিয়া সে কেন এতবড় একটা ব্যাপারে হাত দিতে গিয়াছিল! এ মতিচ্ছন্ন তার কেন হইল!

নিরুপায় হইয়া স্বামীকে আহ্বান জানাইল। লিখিল, "মা যে এতবড় শক্ত মানুষ, এর আগে তা' বুঝতে পারিনি।"

জামাই আসিলে শাশুড়ী আগে দেখা করিয়া বলিলেন,—

"তুমি এসেছ তারক! ভালই হয়েচে,—আমার একটা ব্যবস্থা তো হওয়া চাই। ছেলের থেকে আমি নোব না,—আমার নিজের নামে যৎসামান্য যা আছে, তাইতেই আমার চলে যাবে। আমি কাশী গিয়ে থাকবো স্থির করেচি, তুমি এদিকের সব যা করতে হয়, করে কর্ম্মে দিও।"

স্ত্রীর মুখে সমস্ত সংবাদ জানিয়া মিষ্টার সেন বিশেষ চিন্তিত হইলেন। সুন্দরা রাগ করিয়া বলিল, —

"মার যাই বল এ বাড়াবাড়ি! ছেলে বড় করে রেখেছেন, এখন ওর অমতে নিজের পছন্দয় বিয়ে দিতে চাইলে ও তা' যদি না মানে? এ রকম যদি চান, তো কম বয়সেই বিয়ে দিলে পারতেন।"

তারকব্রহ্ম কহিলেন, "যেমন তোমার দিয়ে ফ্রি-লভের গোড়া কেটে রেখেছেন!"

সুন্দরা হাসিয়া ফেলিলেও পুনশ্চ গম্ভীর হইয়া কহিল, "তুমি আর জ্বালিও না বাবু,—আমার যা হচ্চে তা' আমিই জানি। কেনই বা মরতে মুসুরি গেছলাম।"

ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হইয়াই উঠিতে লাগিল। মাতাপুত্রে কথাবার্ত্তা তো বন্ধ হইতেই বসিয়াছিল,—মেয়ের সঙ্গেও প্রায় তাই। সুন্দরাকে সলিলের স্বাধীনভাবে বধূ নির্ব্বাচনের প্রধান সহায় বুঝিয়া মহামায়া তার উপরে ছেলের চেয়েও মনে মনে বেশি চটিয়াছিলেন। এক দিন সে ভাবটা বাহিরেও বড় বেশি রকম কড়া ভাবেই প্রকাশ পাইয়া গেল।

সুন্দরা এখনও আশা ছাড়িতে পারে নাই; অতুল বাবুকে সে যে বড় বেশি অহঙ্কার করিয়া কথা দিয়া আসিয়াছে। তার উপর আরতি! তার হয় ত সে চিরদিনের মতই সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিল। এই জন্যই হিন্দু-সমাজ এ সব বিষয়ে এত সাবধান! ওঃ, না বুঝিয়া, না ভাবিয়া সুন্দরা এ কি পাপ করিল। এর প্রায়শ্চিত্ত কি?

সেদিনও দুঃসাহসে ভর করিয়া আর একবার মায়ের কাছে এত্তালা করিতে গেল।

মহামায়া অটল স্বরে উত্তর করিলেন, "আমি তো কোনই আপত্তি

করি নি বাছা! বলেইছি ত তোমাদের যা ভাল বোধ হয় তা' তোমরা করো। তবে শুধু আমাকে কাশীতে একখানা ঘর ঠিক করে নিতে ওইটুকু সময় দাও। চিঠি আমি নেত্যকালীকে লিখেছি,—উত্তরটা আসতে যেটুকু দেরি।"

এত কাকুতি মিনতি ও নিজেদের সঙ্কটাবস্থার সকল কথা জানাইবার পরেও ঠিক সেই একই দৃঢ় সঙ্কল্পের খবর পাইয়া সুন্দরাও আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আশাহত চিত্তের উত্তাপ-তপ্ত ভাষায় কহিয়া উঠিল—

"তুমি ঐ যে এক জিদ ধরে রেখেছ,—কিছুতেই তা ভুলতে পারচো না! ছেলের চিরদিনের সুখ বড়, না তোমার আত্মমর্য্যাদা বড়, সে তুমিই জানো,—আমি হলে কক্ষনো এ-রকম শক্ত হতে পারতুম না।"

একে ছেলের নির্লিপ্ত মৌনতায় সারা চিত্ত আগুনে তাতিয়া আছে, তার উপর মেয়ের মুখে এই কথা! মহামায়া অগ্নিকণাস্পৃষ্ট দাহ্য পদার্থের মতই জ্বলিয়া উঠিয়া জ্বলন্ত স্বরে কহিলেন,—

"তুমি যদি আমার পেটের মেয়ে হতে সুন্দরা! তা'হলে আজ আমায় এতবড় অপমানের মধ্যে টেনে এনে তার উপর আর চোখ রাঙ্গাতে পারতে না। যতই করি, পর কখনও আপন হয় না।"

এই যে কথা অত্যন্ত ক্রোধের বশে জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়া মহামায়া আজ সুন্দরাকে বলিয়া বসিলেন, এর যে কি নিদারুণ পরিণাম হইতে পারে সে কথা তাঁর মনেও হয় নাই। কিন্তু সুন্দরাকে ইহা বজ্রবলে গিয়া বিঁধিল। সে বাক্যাহত কি বাণাহত হইল তা ঠিক যেন বুঝিতে পারিল না। তার মর্ম্মের ভিতরটা যেন অকস্মাৎ গুঁড়া হইয়া গেল, এম্‌নি তার অনুভব হইল। তার পর তেম্‌নই একটা অসহায় দুরন্ত ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান

হারাইয়া সেও আহতের উচ্চ আর্ত্তনাদের মতই ক্রোধার্ত্ত কণ্ঠে সবেগে বলিয়া উঠিল,—

"তাই বটে! তাই বটে! আমি তোমার পর! আমি তোমার পেটের মেয়ে নই! এত দিন পরে এই কথা তোমার মুখ দিয়ে বার করতে তোমার মুখে এতটুকু বাধলোও না ত মা? আমি তোমার সতীনঝি! আমি তোমার মেয়ে নই! পাঁচ মাসের মেয়ে মানুষ করে,—তাও নিজের বোনের মেয়ে—তবু এই আটাশ বছরেও ভুলতে পার নি যে, সে তোমার পেট থেকে জন্মায় নি? এই তুমি মা! এই স্নেহ তোমার! তুমি আবার ছেলেমেয়ের সুখ দুঃখ দেখ্‌বে?"

কথাটা যে অত্যন্ত নির্ম্মম, ও তাঁর যোগ্য যে আদৌ হয় নাই, এ কথাটা মহামায়ারও বুঝিতে বেশি বিলম্ব ঘটে নাই। কিন্তু আত্মমর্য্যাদায় যে এখানেও বাধিতেছিল। বিশেষ যদি ঐ কথা শুনিয়া সুন্দরা অত রাগিয়া ঝাঁঝিয়া না উঠিত, তবে তিনিই হয় ত নরম হইয়া যাইতেন। কিন্তু উল্টা পথে উল্টাই ফল ফলিল। মা ও মেয়েতে এই সুদীর্ঘ অষ্টাবিংশ বর্ষ কাল পরে সহসা বিমাতা ও সতীনঝি সম্পর্কে নূতন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সুন্দরাকে এ আঘাতটা এতই কঠিন হইয়া বাজিয়াছিল, যে, সে শুধু মা নয় সলিলের সঙ্গে শুদ্ধ কথা বন্ধ করিল, বলিল, "কাজ কি ভাই, সৎ বোন তোমার, তোমাকে কুশিক্ষা দিয়ে যদি খারাপ করে দিই, তুমি আর আমার সঙ্গে মিশো না সলিল।"—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

সলিলেরও চোখ দিয়া জল পড়িল। দিদিকে সে তো মার চেয়ে কম ভালবাসে না! আর দিদি যে কত বাসে, সেও তো তার জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি একদিনের জন্যও অজ্ঞাত নয়। সেই দিদি আজ তাহাকে

বলিতেছে—সে তার সৎ বোন্! কত বড় আঘাত খাইয়াই এমন কুকথা তার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিয়াছে!

কঠিন প্রতিজ্ঞার দৃঢ় সঙ্কল্পে নিজেকে কঠোর করিয়া লইয়া সলিল নিজেকে সমস্ত সংসারের বাহিরে একেবারে নির্লিপ্ত করিয়া রাখিল। মনে মনে বলিল, "আরতিকে না পেতে দাও, নাই দেবে, বিয়ে কিন্তু আর করচি না। দেখি তখন কি করো।"

সুন্দরা সেই দিনই নিজের বাড়ী চলিয়া গেল, যাত্রাকালে মায়ের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেল,—

"সলিলের যার সঙ্গেই বিয়ে হয় হোক, আমার তাতে আর কোন কিছুই বলবার নেই, বৌ-ভাতের সময় খবর পেলে এসে বৌ দেখে যাব।"

সুন্দরা যতক্ষণ রহিল, মহামায়া গম্ভীর মুখে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সে চলিয়া গেলে নিজের ঘরে খিল বন্ধ করিয়া প্রৌঢ়া-জননী বালিকার মতই বুক ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। মর্ম্মের মধ্য হইতে অভিমানতপ্ত হাহাকার উৎসারিত হইয়া উঠিয়া কঠিন অনুযোগে বলিতে লাগিল,—

"সুন্দরা! সুন্দরা! তুইও আমার দুঃখ বুঝলিনে! উল্টে অতবড় কঠিন আঘাত দিয়ে রাগ করে চলে গেলি? উঃ, কি তোরা পাষাণ রে! তোদের কাছে কি আমার এতটুকু দাবীও নেই?"

এমন সময় একান্ত অপ্রত্যাশিত বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া সলিল একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এলাহাবাদের জর্জ্জ টাউনে অনেকগুলি জমকালো বাগানবাড়ীর মধ্যের একখানি আরতির পিতা অতুলেশ্বর বাবুর। সুপ্রশস্ত ও সযত্নরক্ষিত পুষ্পোদ্যানে কর্ম্মনিরত মালীচতুষ্টয় কোথাও ঘাস ছাঁটিতেছে, ডাল কাটিতেছে, জিনিয়া ও কস্‌মিয়ার চারা তুলিয়া অন্যত্র বসাইতেছে, কেহ বা ডিউর‍্যাণ্টার গাছকে সিংহ, ময়ূর ও অশ্বারোহীর মূর্ত্তিতে কাটাকুটি করিয়া তৈরি করিতেছে।

সদর দরজার একধারে গৃহস্বামীর নাম লেখা, আর একধারে 'নট অ্যাট হোম' এই প্ল্যাকার্ড টাঙ্গান।

কর্ত্তার তার পাইয়া কর্ম্মচারীরা দু'খানা মোটরই ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিল। মালপত্রের জন্য একখানা লরি তৈরি ছিল। ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া অতুলবাবু মোটরে চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "আবার সেই কাজ আর টাকা, টাকা আর কাজ! ক'টা মাস বেশ ছিলুম! কি বলিস! ছিলুম না রে আরতি?"

আরতি তখনও সুন্দরা ও সলিলের কথাই ভাবিতেছিল। তাদের সঙ্গহারা হইয়াই তার চিরনিঃসঙ্গ মনটা যেন আজ নিজের সঙ্গীহীনতার অভাব একান্ত ভাবে অনুভব করিতেছিল। মনে হইতেছিল, এর পর এত বড় বাড়ীটায় প্রায় একা দিন কাটানোই তার পক্ষে যেন ভার হইবে। তার পর সহসা মনে পড়িয়া গেল,—এই আষাঢ় মাসেই হয় ত তার--- মুখ গভীর লজ্জায় রক্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিল! বাপের প্রশ্নে সহসা চমকিত হইয়া উঠিয়া সে তাঁর দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল, কহিল "ছিলে বই কি বাবা—!"

অতুলবাবু তার এই অনুৎসুক উত্তরটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনশ্চ সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "আর তুই? তুইও কি খুব ভাল ছিলি না? এখানে তো তোর সঙ্গীই নেই। আর কি চমৎকার লোক ওরা? ওই সলিল আর সুন্দরার কথা বলচি! মিষ্টার সেন তো একটী হীরের টুক্‌রো!"

আরতি বাপের অত্যধিক উচ্ছ্বাসে ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর করিল, "তোমার গল্প শোনবার খুব নিরুপদ্রব শ্রোতা বলেই তোমার মিষ্টার সেনকে 'হীরের টুকরো' লেগেছিল। আমার কিন্তু সুন্দরা-দি'কেই বেশ ভাল লাগে।"

অতুলবাবু এবার আরও বেশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বলিতে লাগিলেন, "ওরা সব ভাল, ওরা সব ভাল, আহা, এখন ভগবান যদি দিন দেন!"

বাপের কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া মেয়ের মুখে আবার একটা সলজ্জ আভা দেখা দিল। সে নিজ চিত্তের পুলকোচ্ছ্বাস দমনার্থ পার্শ্ববর্ত্তী মঞ্জুকে দুই হাতে টিপিয়া ধরিল।

দু'পাশের দৃশ্য দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত মঞ্জু দিদির এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত স্নেহের উপদ্রবে বিরক্ত বিপন্নতায় চেঁচাইয়া উঠিল—"উঃ, ডাগে যে ডিডি!"

কিন্তু বাড়ী আসিয়া আর খুব বেশিক্ষণ এই হাসিখুসী চলিল না। অফিসে গিয়া অতুলবাবু যে সংবাদ পাইলেন তাহাতে তাঁহাকে একেবারে সাত হাত মাটির নীচে নামাইয়া দিল। গুপ্ত এবং উইলিয়ামস্ কোম্পানি ফেল,—উইলিয়ামস্ সাহেব গত রাত্রে ফেরার হইয়াছেন। এখন ইহার সমস্ত ঋণভার ও দায়িত্ব সমস্তই অতুলেশ্বরের মাথায় পড়িল!

'সর্ব্বনাশ' কথাটার যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এ ক্ষেত্রে পূর্ণভাবেই ঘটিয়াছিল।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আরতির সাগ্রহ অনুযোগের বিরুদ্ধে শুদ্ধমাত্র,—"শরীর ভাল নেই মা, আজ আর কিছু নয়—শুয়ে পড়তে দে"—বলিয়াই তিনি শয্যা-গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। আরতি বাপের মুখের এমন চেহারা কোন দিন দেখে নাই, কণ্ঠে তাঁর এমন স্বর সে কখন শোনে নাই, তাই সে তাঁহাকে পীড়িত বোধে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল, কাছে বসিয়া শুশ্রূষায় মনোযোগী হইল; কিন্তু মনের এই দুর্ব্বিসহ অবস্থায় স্নেহময় পিতা কোন ক্রমেই আজ তাঁর এই স্নেহ-পুতলী প্রিয়তমা কন্যার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হইতেছিল, এতবড় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর আর কি তিনি সলিলের মত শিক্ষিত ও ধনী পাত্রে কন্যাদান করিতে সমর্থ হইবেন? তাঁর বিষয় বিভব, ভবিষ্যতের আশা, তাঁর সুনাম পর্য্যন্ত সমস্তই যে চিরদিনের মত চলিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে তাঁর বেশি সময় লাগে নাই। অংশীদার উইলিয়াম্‌সের সততায় বিশ্বাস করিয়া, আর নিজের কর্ত্তব্যে ত্রুটী করিয়া তিনি নিজের সর্ব্বনাশ তো করিয়াইছেন, আর সেই সঙ্গে আরও কত লোককে যে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে বসিয়াছেন, তারও কি হিসাব আছে!—তারাই কি তাঁকে ক্ষমা করিবে?

এক সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত হিসাব-নিকাশ তৈরি হইয়া দেখা গেল, প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বাহিরের দেনা শোধ না করিলেই নয়; ইতিমধ্যেই পাওনাদারের দল কোর্টে নালিশ আনিয়াছে। দু'দিনের পরে আদালতের পেয়াদা আসিয়া 'সমন' ধরাইয়া যাইবে!

তার পর?

আরতি আসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

অতুলেশ্বরের সে স্নেহ-সজাগ চিত্ত আজ কোথায় কোন্ অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর অন্ধকার পাথারে তলাইয়া গিয়াছে। সেখানে চক্ষু কর্ণ সমস্তই

যেন শুধু ভবিষ্যতের বিভীষিকা ও সর্ব্বনাশ দর্শন ও শ্রবণ করে, আর কিছুই না। মেয়ের এই সমুৎসুক উদ্বিগ্ন কণ্ঠ স্বর তাঁর কানেও ঢুকিল না, তিনি তাঁর অন্তহীন সুগভীর চিন্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

আরতি কাছে আসিয়া তাঁর পিঠের উপর হাতের ঠেলা দিয়া আবার ডাকিল, "বাবা!"

অতুলবাবু এবার অকস্মাৎ এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিলেন, যে, আরতি বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল;—তার বাপের মুখে এ কি ভয়াবহ বিভীষিকার আতঙ্ক! এ কি! এ কোথা হইতে আসিল? এ কি তার সেই সদানন্দ বাপের চিরপ্রসন্ন মুখ!

একটা অজানিত ভয়ে আরতির বুক কাঁপিয়া উঠিল।—কিছু হইয়াছে, নিশ্চয়ই কিছু একটা হইয়াছে! এই এক সপ্তাহ তারা বাড়ী আসিয়াছে, এখানে আসার প্রথম দিন হইতেই তার পিতার এই রকম ভাবই সে প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্তু ইহার বিশদার্থ সে ঠিক পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। কারবারে প্রচুরতর লোকসান হইয়াছে! হইয়াছে ত কি? কারবারের নিয়মই তো এই। এ বছর না হয় তারা একটু কষ্ট করিয়াই থাকিবে। তাতে কি? আরতির মায়ের অনেক গহনা আছে। রূপার বাসন-কোশন—সেও যথেষ্ট। দরকার হইলে সেই সব কারবারে নামান যাইবে। তার জন্য এত ভাবনাই বা কেন? আরতি আজ সেই কথাই বলিল। কিন্তু তার বোধ হইল, কোন কথাই যেন তার বাপের কানের মধ্যে ঢুকিল না। তিনি শুধু সেই এক রকম বিস্ময়-বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতেই তার দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

আরতি বাপের গলা জড়াইয়া ধরিল; তাঁর বিকৃত, বিবর্ণ মুখে চুম্বন করিল। তার পর তাঁর কানের কাছে মুখ আনিয়া পুনশ্চ ওই সব কথারই পুনরুল্লেখ করিল। শুনিয়া অতুলেশ্বর শুধু ঈষৎ একটুখানি

হাসিলেন। সে কি হাসি! আরতি সে হাসি দেখিয়া ভয়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

সমস্ত দিন পিতার সঙ্গে সঙ্গে সে ছায়ার মতই ফিরিতে লাগিল। পিতা হয় ত তা সকল সময় জানিতেও পারিলেন না। যখনই তাঁর মেয়ের ম্লান শঙ্কিত অকথ্য বেদনায় বিবর্ণ মুখের উপর চোখ পড়িতেছিল, সভয়ে শিহরিয়া তিনি তাঁর চোখের দৃষ্টি নত করিয়া লইতেছিলেন। যে দুরন্ত প্রলোভন তাঁর দুঃখ-দীর্ণ লুব্ধ চিত্তকে আজ সবলে আকর্ষণ করিতেছে, তার হাতে পড়িয়া এর কাছে আজ আর তাঁর মুখ তুলিয়া চাহিবারও শক্তি নাই!

তাঁর এই বাহ্য স্তব্ধতার ভিতরে একটা তুমুল সংগ্রাম অতি নির্দ্দয় ভাবেই চলিতেছিল। লোভের সহিত বিবেকের এই সংঘর্ষের ফলে তাঁর চিন্তাশূন্য, সরল, সানন্দ লঘু চিত্ত আজ যেন ক্ষতবিক্ষত হইতে বসিয়াছিল। বিবেকের ক্ষমাহীন নির্দ্দয় বিচারফলে তাঁর আহত হৃদয় যেন শোণিতাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল! আবার অন্য দিকে লোভের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য যেন তাঁর এখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া কোথাও কোন লোকসমাজে, কোলাহলময় জগতের কোন জনতাপূর্ণ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায়,—ওঃ কোথায় তাঁহার স্থান? কার কাছে গেলে এই দুর্নিবার যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবেন? এই কর্ত্তব্য ত্যাগের মহাপাপে কলঙ্কলিপ্ত, স্বয়ং প্রতারিত হইয়া অন্যকেও প্রতারিত হওয়ার সহায়তাকারী, সাধারণের নিকট তীব্র ঘৃণার পাত্র,—কোথায় কোন্ সহানুভূতি-ভরা চিত্ত এর জন্য প্রসারিত হইয়া আছে?

সলিল? উঃ—না-না-না, আর তো তাকে মুখ দেখানো চলিবে না! কি জানি কি হয়? কি না জানি বলে? যদি সে বলিয়া বসে,—ধ্বংস-

প্রাপ্ত, ঋণগ্রস্ত কলঙ্কীর কন্যা আমি গ্রহণ করিব না!—মা পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও—দ্বিধা হও,—

অতুলেশ্বর ছটফট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার বসিলেন। সমস্ত অন্তঃকরণ তাঁর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল;—আমি সে সইতে পার্ব্বো না! সলিল! সলিল! তুমি আমায় ঘৃণা করবে, তুমি আরতিকে নেবে না, এ আমার সইবে না—ও বাবা! আমার সইবে না!——

আবার সেই বিবেকের জলদ-গম্ভীর বাণী গভীর উচ্চনাদে বলিয়া উঠিল,—

"সইবে বই কি,—সইতেই হবে। পারবে না বল্লে ছাড়বে কে তোমাকে? কাল যখন আদালতের পেয়াদা এসে সমন ধরিয়ে টেনে নিয়ে যাবে, যখন তোমার পাওনাদারেরা তোমায় জেলে পূরে দেবে, তখনও কি 'পার্‌বো না' বলে চীৎকার করলে তারা তোমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছ?

বৈকাল হইতেই দলে দলে পাওনাদার আসিয়া বাড়ী ছাইয়া ফেলিল। সকলের মুখেই তীব্র ভাষা এবং বাড়ী ও সম্পত্তি হইতে সবার আগে পাওনা আদায়ের তীব্র তাগিদ। অনেকেই শাসন করিয়া গেল, টাকা আদায় না হইলে জেল খাটাইয়া শোধ তুলিবে। দু'জনে দু'খানা মোটরকার গ্যারেজ হইতে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। জনকতক ড্রইং-রুমের কয়েকটা দামী রূপার ফার্ণিচার সংগ্রহ করিল। অতুলবাবু শুধু স্তিমিত চক্ষে সেই সমস্ত চাহিয়া দেখিলেন, ভাল মন্দ কোন কথাই কাহাকেও বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, চেষ্টাও করিলেন না।

সবাই চলিয়া গেলে সেই স্তব্ধ বিজন গৃহের নির্ম্মম কঠোরতা তাঁহাকে ভয়ানক ভাবে আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। তিনি প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া যথাসাধ্য বিকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "আরতি!"

পর্দ্দার পাশেই আরতি দাঁড়াইয়া ছিল, ছুটিয়া আসিয়া নিঃশব্দে বাপকে

দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। তার চোখের জলের স্রোতে তার বাপের গা ভিজিয়া গেল, কিন্তু সেই নির্ঝর-সদৃশ অশ্রুধারা তার চিরস্নেহপ্রবণ, কন্যা-বৎসল বাপের শুষ্ক কঠোর নেত্রে একবিন্দু জল আনিয়া দিতেও পারিল না। সমস্ত বুকের ভিতরটা সাহারার তপ্ত বালুরাশির মতই ধূ ধূ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, আর ওষ্ঠ কণ্ঠ জিহ্বা দারুণ বিকারগ্রস্ত রোগীর মতই শুষ্ক হইয়া সাঁটিয়া ধরিল, অথচ একবিন্দু জল চাহিবার কথা মনেও পড়িল না।

এমনই করিয়াই সমস্ত দিন কাটিয়া কখন্ কোথা দিয়া রাত্রি আসিয়া পৌঁছিল, সে রাত্রিও আবার ধীরে ধীরে দিকে দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিল, প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গিয়া প্রায় দেড় প্রহরও উত্তীর্ণ হইতে লাগিল।

এক সময় কোন মতে শরীরে মনে এতটুকু একটু বল সংগ্রহ করিয়া লইয়া অবিশ্রান্ত রোদনাবেগে প্রায়-রুদ্ধ কণ্ঠকে কোন মতে ফুটাইয়া আরতি ডাকিল,

"বাবা!"

দু'বার ডাকিবার পর আত্মবিহ্বল অতুলেশ্বরের শব্দরুদ্ধ কর্ণে সে ডাক প্রবেশ করিল, তিনি সহসা চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিলেন।

মুখে মানুষের মুখের কোন ভাবই যেন আর বর্ত্তমান ছিল না, ছিল শুধু একটা সুগভীর শূন্যতা! পূর্ব্বের সেই দারুণ বিভীষিকার প্রাণঘাতী ছায়া একেবারেই যেন সেখান হইতে বিদায় লইয়াছে। এ মুখটা যেন এক নির্ব্বোধ সংজ্ঞাহারা বালকের মুখ।

দেখিয়া আরতি তবু একটু আশ্বস্ত হইল। বাপের মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে অনতি মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, "খাবার দিয়েচে বাবা!"

অতুলবাবু ক্ষণকাল মেয়ের রোদনারক্ত মুখ ও তার রক্তজবার মত

চক্ষু তাঁর সেই বিহ্বল অর্থশূন্য দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"থাক"—

আরতি গাঢ় কণ্ঠে কহিল "কদিন ধরেই যে খাওয়া দাওয়া নেই বাবা, কেমন করে বাঁচবে? একটু কিছু মুখে দাওসে—"

তার সেই ভাঙ্গা গলায় গভীর মিনতি ও অপরিসীম সান্ত্বনা পূর্ণ শোকের করুণা এমনই নিবিড় হইয়া উঠিল, যে, সহসা অতুলেশ্বরের অশ্রুহীন জ্বালাময় নেত্রও যেন ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু তার চেয়ে বেশি করিয়া প্রকট হইয়া উঠিল তাঁর সেই নিরক্ত পাংশু ওষ্ঠাধরের প্রান্তে এক ফোঁটা হৃদয়বিদারক মন্দহাস্য!

আরতি সভয়ে দৃষ্টি অপসারিত করিল। এ দৃশ্য সে আর সহিতে পারিতেছিল না।

ক্ষণপরে আবার ঐ কথাই ফিরিয়া বলিতে বিরক্ত ভাবে পিতা উত্তর করিলেন, "আঃ—থাক না—"

আর কিছু না বলিয়া আরতি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই এক বাটি গরম দুধ আনিয়া বাপের মুখের কাছে ধরিল। কাতর হইয়া কহিল— "খাও বাবা!"—আর কিছু বলিবার আগেই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

অতুলেশ্বর কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ বিরক্ত ভাবে কহিয়া উঠিলেন,—

"তুমি কেবল কেবলই অমন করে কেঁদ না।" তার পর দুধের বাটিটা টানিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিলেন।

বাপের কথার ধরণে ও মুখচোখের ভাবে আরতির কান্না আপনি থামিয়া গেল,—তার বাপ কি তবে পাগল হইয়া যাইবেন? ভগবান!—

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিরানন্দ গৃহে সে রাত্রি যেমন ক্লান্তিকর

তেমনি অসহ্য! চারিদিক যেন অসম্ভব নির্জ্জন, ঝিঁঝিঁর ডাক যেন কাদের গুমরানো কান্নার মতই মর্ম্মান্তিক, চারিদিকে কেমন যেন একটা ভয়ের ছম্‌ছমানি। কোথাও কিছু না থাকিলেও সকল সময় মনে হয়, ঐ যেন কে চলিয়া গেল! ঐ যেন কেহ দাঁড়াইয়া আছে।

অনেকক্ষণ পরে গভীর চিন্তাস্রোত হইতে আপনাকে যেন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় টানিয়া লইয়া অতুলেশ্বর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলেন, আরতি তাঁর পাশেই একটা চৌকিতে নিঃশব্দে বসিয়া আছে, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

অতুলেশ্বরকে একটু বিপন্ন দেখাইল। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়াই মেয়ের মাথায় হাতটা রাখিলেন; চিরদিনের মতই গভীর স্নেহে বলিলেন, "এখনও তুমি জেগে বসে আছ মা! অনেক রাত হয়েছে—যাও মা, শুতে যাও।"

বাপের এই পূর্ব্বাপর-পরিচিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াই আনন্দের আতিশয্যে আরতির এতক্ষণকার আতঙ্ক-রুদ্ধ সমস্ত অশ্রুধারা যেন একটা তুমুল বর্ষণের উদ্যোগ করিয়া ছুটিয়া আসিতে চাহিল। তাহার সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে কোনমতে সে উত্তর করিল,

"আজ আমি তোমার কাছেই থাকবো, বাবা, ঘুমবো না।"

অতুলবাবুর মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল। ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—"অসুখ করবে আরতি!"

আরতির কান্না আর বাধা মানিতে পারিতেছিল না, মাথা নত করিয়া রুদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে সে উত্তর দিল,—

"না বাবা!"

অতুলবাবু হতাশভাবে আবার তাঁর সেই আট ঘণ্টার অধিকৃত চেয়ারখানার উপরেই ফিরিয়া বসিয়া পড়িলেন, শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন,

"তবে আমিও বসে থাকি,—ঘুমুতে তো তুমি আমায় দেবে না।"

"বাবা!"—বলিয়া ডাকিয়া আরতি আর আপনাকে সামলাইতে না পাড়িয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিয়া গেল। তার বাপের যে এই আকস্মিক মহাবিপৎপাতে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতে বাকি নাই, তাহা মনে করিয়া সে আর তাঁর সাক্ষাতে কান্নাকাটী বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা সঙ্গত বোধ করিতেছিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে পুরাতন খানসামা রামরূপকে পাঠাইয়া দিল। রাত্রিবাস পরার সাহায্যাদি সেই করিত।

পর্দ্দার পিছনে দাঁড়াইয়া সে দেখিল, তার বাপ রামরূপকেও প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রবেশ কালে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখিস্ আমায় একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুতে দিস্। ছেলেমেয়েরা কিম্বা বাইরের কোন লোক এসে যেন ডাকাডাকি না করে। বলিস্ আমার বারণ অছে।"

ঘরের মধ্য হইতেই আবার ডাকিলেন, "রামরূপ!"

"জি হুজুর!" বলিয়া ভৃত্য উত্তর দিয়া রুদ্ধদ্বারের সমীপস্থ হইল।

"তুই এই ঘরেই থাকিস্, রাত দু'টো হয়ে গ্যাছে, তারা হয় ত ভোর থেকেই আসতে আরম্ভ করবে। বেলা আটটার আগে কেউ যেন আমায় ডাকে না।"

ঈষৎ একটুখানি যেন হাঁফ ছাড়িয়া আরতি নিঃশব্দ পদে এই ঘরে ফিরিয়া আসিল। রামরূপ তাহাকে সম্বোধন করিতে গেলে সে ত্রস্ত হইয়া ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া নিষেধ সূচক মাথা নাড়িল, তার পর সেই রুদ্ধ দ্বারের যতটা সম্ভব কাছাকাছি একখানা কৌচে শুইয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে মর্ম্মান্তিক ভয় ভাবনা এবং শোক দুঃখের মধ্যেও ভোরের দিকে কোন সময় ক্লান্ত হইয়া একটুখানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল জানিতেও পারিল না।

১৩

আরতির হঠাৎ যখন সেই দুঃস্বপ্নাচ্ছন্ন ক্লেশকর নিদ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল, তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমের দক্ষিণায়নের সূর্য্য তখনই প্রাচ্যের আকাশকে সুবর্ণ-সিক্ত লোহিতাভায় সমুজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। চমকিয়া আরতি উঠিয়া বসিল। ঘামে তার অঙ্গ বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে,—কপালের উপর চুলের মধ্যের ঘর্ম্মধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। সেগুলাকে মুছিবারও তার অবসর হইল না। সে ব্যাকুল চক্ষে তার বাপের রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল। দ্বার যথাপূর্ব্ব বন্ধই আছে। দরজার সাম্‌নে হলঘরেরই আস্তৃত কার্পেটের উপর রামরূপ পড়িয়া পড়িয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। দেখিয়া প্রথমটা আশ্বস্ত হইলেও, ক্ষণকাল পরেই সে আবার আর একটা নূতন অস্বস্তি অনুভব করিল। এতক্ষণ পরে তার মনে হইল—আচ্ছা, বাবা আজ দোর বন্ধ করে শুলেন কেন? কথ্‌খন তো করেন না!

তার পর মনে পড়িল, আজ তার বাবার জীবনে যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে, এ দিনও তো আর কোন দিনই আসে নাই! পাওনাদারদের ভয়েই এ দ্বার রোধ।

ভাবিতে তার বুকের পাঁজরা খসিয়া পড়িতে চাহিল। ওঃ ভগবান! তার নির্দ্দোষ, নিরপরাধ বাপ, যিনি এত দিন দশের কাছে শ্রদ্ধায়, সম্মানে সম্পূজিত ছিলেন, তাঁকে এখন পরের কাছে এমনই করিয়াই চোরের মত মুখ লুকাইয়া ফিরিতে হইবে?

আকুল হইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু বেশী ক্ষণ তার কান্নারও অবসর হইল না। আবার কিসের যেন একটা অশান্তি,

একটা অপরিজ্ঞাত ভয় তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুর্ব্বল চিত্তটাকে ধরিয়া সবলে নাড়া দিতে আরম্ভ করিল। তখন আর আত্ম-সম্বরণে অপারগ হইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখীন হইল,—ঘুমন্ত রামরূপ তাহা জানিতে পারিল না।

চাবির ঘরের সামান্য একটা ছিদ্র আছে,—তার মধ্য দিয়া কিছুই দেখা যায় না। ঘর নিস্তব্ধ, গভীর নিস্তব্ধ! কিন্তু কেন? ঘুমাইলে তার বাপের তো নাকের শব্দ হয়! তবে কেন আজ তিনি এত স্তব্ধ রহিয়াছেন? তবে কি তিনি ঘুমান নাই? সারারাত জাগিয়া একা অসহায় অনাথের মত সেই নিদারুণ যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন? ওঃ, কেন, কেন, কেন এমন করিলেন? কেন তাঁর চিরস্নেহের আরতিকে আজ তাঁর এতবড় দুঃখের অংশ ভাগ করিয়া বাঁটিয়া দিলেন না? এ যে তাঁর চির-নিয়মের ব্যতিক্রম! ওঃ এতবড় অনিয়ম আজ কেন করিলেন?

নিঃশব্দ অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতে হইতে আরতির মনে পড়িয়া গেল, এ তার বৃথা অভিমান! তার বাপ তাকে তাঁর সকল সুখের অংশই প্রদান করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু দুঃখ তো আজ পর্য্যন্ত তাঁর জীবনে আসিয়া পৌঁছায় নাই,—এই যে তার প্রথম দেখা! আর, ওঃ—কি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াই সে দেখা দিল!

আরতি গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার মাকে মনে পড়িল। আজ তার মা থাকিলে হয় ত তার বাপ এতটাই অধীর হইয়া পড়িতেন না। তিনি হয় ত আরতির চেয়ে ঢের বেশী সান্ত্বনা দিতে, শান্ত করিতে পারিতেন! কোথা মা! কোথা মা! স্বর্গেও কি তুমি নেই? সেখান থেকে কি এখানের জন্যে কিছুই করা যায় না? তবে স্বর্গই বা লোকে চায় কেন? একেবারে এমন করেই পর হয়ে যাবার জন্যে?

হঠাৎ আরতির মনে পড়িয়া গেল যে, তার বাবার স্নানের ঘরের মধ্য

দিয়া একটা দরজা আছে,—হয় ত সেটা খোলা থাকিতে পারে। এই আশ্বাসে সে সেইখানেই ছুটিল; এবং গিয়া দেখিল, তার অনুমানই যথার্থ,—দরজাটা ভেজান ছিল, একটুখানি ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।

আরতির বুক কাঁপিয়া উঠিল। কি জানি, যদিই জাগিয়া থাকেন, হয় ত খুব রাগ করিবেন, হয় ত এখনই তাহাকে বিদায় করিয়া দিবেন। সে মনে মনে বল সংগ্রহ করিয়া দৃঢ় হইয়া বলিল, তা দেন দেবেন। তবু তো একটিবার দেখে যাই,—আমি যে থাকতে পাচ্ছি নে।

নিঃশব্দে পদে চোরের মতই স্পন্দিত বক্ষে সে ঘরে ঢুকিয়া সতর্ক লঘু চরণে পিতার সুপ্রশস্ত মেহগ্নি পালঙ্কের অভিমুখে অগ্রসর হইল। মশারী ফেলা হয় নাই। বক-শুভ্র সেই সুকোমল শয্যাতলে তার ফ্রেঞ্চ সাটিনের বেড-কভারটা আগাগোড়া ঢাকা দিয়া তার বাপ শুইয়া আছেন। ঘরখানা যেন পাতাল-পুরীর মতই নিঃস্তব্ধ। তার সর্ব্বশরীর কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল। বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড শব্দ করিতে লাগিল ধপ্, ধপ্, ধপ্।

শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনা যায় না। সম্ভবতঃ জাগিয়া আছেন। আরতি নিজের সমুদায় অদম্য ইচ্ছাকে সবলে দমন-চেষ্টা করিয়া ফিরিতে গেল; কিন্তু তার ফেরা হইল না। সেই মুহূর্ত্তে তার দৃষ্টি পতিত হইল, তার বাপের মাথার কাছের ছোট্ট টেবিলটার উপরকার একখানা কাগজের উপর। সেখানা যেন একখানা চিঠি। তার সম্বোধনে খুব বড় বড় হরপে লেখা তার নিজেরই নাম—আরতি। হাতের লেখা তার বাপেরই। এবার বিস্ময়ে ও আশঙ্কায় আরতির বুকের মধ্যের সমস্ত রক্তস্রোত যেন একসঙ্গে কালবৈশাখীর ঝড়-খাওয়া নদী-তরঙ্গের মতই আর্ত্তরোলে উদ্দাম হইয়া উঠিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। চিঠি! তার বাবা তাকে এক বাড়ীতে থাকিয়া, একসঙ্গে থাকিয়া, এখনিই দেখা হইবে জানিয়া, ডাকিয়া না

জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছেন! এ'কি চিঠি! কেন—কিসের জন্য এ চিঠি?

সে কম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া, ততোঽধিক কম্পন-বিবশ অসাড় হস্তে পত্র তুলিয়া লইল। তার চোখের তারা দুইটাও যেন তার সেই সর্ব্বশরীরের প্রবল কম্পন-বেগে বিপর্য্যস্ত, দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছিল। তবু কোন মতে রুদ্ধশ্বাসে, ব্যাকুল চোখে সে সেই চির-পঠিত, জন্ম-পরিচিত, সুস্পষ্ট অক্ষরগুলাকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া লাইন কয়টা পড়িল—

"কল্যাণীয়া আরতি!

'মা' বলেই তোমাকে চিরদিন ডেকেচি, মা-ই তোমায় আমি বরাবর ভেবে এসেছি, আজ কিন্তু ও নাম নিতে পারলুম না। আমি আজ যা করতে বসলুম, তাতে তোমায় 'মা' বলে ডাকবার অধিকার আমার আর নেই,—এ কাজ সন্তানের যোগ্য নয়।

কিন্তু 'মা' বলি আর যাই বলি, তুমি আমার সন্তান। আমার মনুষ্য-জীবনের এখন একমাত্র শেষ কর্ত্তব্য তোমায়,—তোমাদের সুখী করা। তা না করতে পারলে আমি সমাজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে, আর ঈশ্বরের কাছেও অপরাধী হবো। আজ আমার সেই কর্ত্তব্য পালনের আর কোন দিকেই কোন পথ নেই দেখে, এই শেষ পন্থাই তাই অবলম্বন করলুম। একান্ত নিরুপায়, অভাগা জেনে, যদি পার তো বাপকে তোমার ক্ষমা করো।—

বেঁচে থেকে যে আমি তোমাদের কোন কাজে লাগবো না, সে তো আমার মত তুমিও জানতে পারচো। আমার ঘাড়ে আড়াই লাখ টাকা দেনা! এই বাড়ী-ঘর বেচে বড় জোর পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকাই না হয় শোধ যাবে, তোমার মার ও তোমার গহনার দাম—সেও ধরচি, পাঁচ-

সাত হাজারই হোক। আর তো আমার কোথাও কোনও সম্বল নেই। আমার ম্যাজিষ্ট্রেট ভাই? এ ব্যর্থ আলোচনার কি কিছু দরকার আছে? তা'ছাড়া, অত টাকা তারই বা কোথা? ইনসলভেন্সি আমি নোব না।

না—বেঁচে থেকে আমি তোমাদের কিছু করতে পারবো না। বরং দুদিন পরে জেলের কয়েদীর মেয়ে বলে হয় ত সলিল তোমাকে বিয়ে করতেও অসম্মত হবে। অথচ অন্নবস্ত্রের সংস্থান, বা একটু মাথা গুঁজে পড়ে থাকবার জায়গা একটা তোমাদের দিয়েও আমি যেতে পারবো না। এ বরং আমি সরে গেলে সুন্দরা আর সলিল তোমায় অসহায় দেখে দয়া করেও কাছে টেনে নেবে। তাদের আমি অন্ততঃ ভুল বুঝি নি।—তার পর মঞ্জু? মঞ্জুকে তার মা তো তোমার হাতেই দিয়ে গ্যাছেন, তার জন্যে তুমি রৈলে। আমি জানি সলিলও তাকে স্নেহের চোখে দেখেন, তার অবস্থা বুঝে এখন আরও বেশি করেই দেখবেন।

তার পর আমার নিজের কথাও একবারটী ভেবে দেখ,—তুমি তো জানো অরু! আমার মা আমাকে কি স্নেহে, কি আদরে পালন করেছিলেন? ধনের উচ্ছৃঙ্খলতা এ বাড়ীতে আমার জন্মের আগে থেকেই চলেছে। আমার বাপ মারা গেলে আমরা দিন কতক একটুখানি অভাবে পড়েছিলুম বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহে সেটা ভাল করে জানতেও পারিনি। তার পর ভাগ্যদেবীও প্রসন্না হয়ে উঠলেন, গৃহদেবীও সেবার ভার হাতে তুলে নিলেন! আর তুমি? তুমিই কি তোমার এ অভাগা ছেলেকে কম স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছিলে? এর পর জেলের লপ্‌সি খেয়ে বেড়ি পরে' কি বেঁচে থাকতে পারবো? সাভই বা কি অমন করে বেঁচে থেকে? তোমাদের আমি কখনও এক দিন ছেড়ে থাকি নি,—বেঁচে থেকে সে আমার প্রাণে সইবে না। তার চেয়ে—হাঁ—তার চেয়ে সব দিক

বিবেচনা করে দেখলে এই ভাল। আর্সিনিক আমার হার্টট্রবলের জন্য এক ফোঁটা করে খেতে ডাক্তার দিয়েছিল, সেটা যেমন তেমনই ভরাই আছে। আজ সেই ডাক্তারকেই আমি সব্বার চাইতে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে গেলুম,—পরম সুহৃদের কাজ সে করে রেখেছে। সুন্দরাকে একটা তার পাঠিও। সেও আমার আর এক মেয়ে। আমি অন্তর থেকে জানতে পারচি, সে তোমায় ভাসাবে না। আর সলিল? সে মহৎ!

বিদায় মা আমার! না না আরতি! আর সময় নেই। হয় ত ভোর না হতে তারা এসে, প্রাণ বেরুতে বাকি থাকলে, লাঞ্ছনার শেষ রাখবে না। তার আগেই আমায় সরতে হবে। ওঃ, কি অপমানই এই জীবনের শেষ দিনে সয়েছি! আর না—

তোমার হতভাগা বাপ
অতুলেশ্বর গুপ্ত

খানিক পড়িয়াই আরতি ছুটিয়া আসিয়া উপরের আচ্ছাদন-বস্ত্রখানা ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া তুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথার প্রত্যেক কেশটী খাড়া হইয়া উঠিল। তার শব্দোচ্চারণে উদ্যত জিহ্বা নির্ব্বাক হইয়া গিয়া, সবলে তার কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিয়া তার শ্বাসরোধের উপক্রম করিল।

এই বিচিত্র আচ্ছাদনের তলায় তার পিতার মৃত দেহ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাঁর সেই বর্ণবিহীন মুখে তখনও হাসির আভাটুকু গ্রীষ্ম-সায়াহ্নে অস্তগত তপনের শেষ রশ্মিটুকুর মতই ক্ষীণ দেখাইতেছিল। হাত দুখানি দুইটী কর্ত্তিত বৃক্ষশাখার মতই দুপাশে স্থির হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষ্মতলে স্নেহ-গভীর চোখের তারকা দুইটী চিরদিনের জন্যই নিমীলিত।

এ দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর! কি অসাধারণ আর কি অপ্রত্যাশিত!

আরতি উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—

"বাবা !"—

এতক্ষণে তার সেই রুদ্ধ কণ্ঠ তাহাকে শব্দোচ্চারণের হৃত শক্তি একটী-বারের জন্যই শুধু ফিরাইয়া দিয়াছিল।

ক্ষণকাল নিশ্চল থাকিয়া সে সেই শয্যা-পাতিত দেহের উপর নত হইয়া তাঁর সেই পাষাণ-কঠিন ও তেমনই শীতল ললাট ধীরে ধীরে নিজের কম্পিত অধর দিয়া বারেক স্পর্শ করিল, তার পর মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহারই পাশে পড়িয়া গেল।

সময়ের গতি যে একই ভাবে চলে সেটা মনে করা ভুল। সুখীর নিকটে তার গতি যতই দ্রুত হোক না কেন, দুর্ভাগার সময় আবার তেমনই দীর্ঘচ্ছন্দ! এই একধারে মৃত্যু এবং একধারে নির্ব্বাক্ শোকের অসহ্যতায় ভরা ভারাক্রান্ত গৃহে আসিয়া সময়ের চপল গতি যেন একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মৃত্যুর মত গভীর এবং শোকের মত আচ্ছন্ন-চেতন হইয়া সে যেন সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে।

আরতি সেই যে একটা হৃদয়-বিদারক ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছিল, তার পর হইতে সে আর একটা কথাও কহে নাই। তার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তার স্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তার সমস্ত শক্তি তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি দেহে তার প্রাণ আছে কি না, তাহাও তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় মাত্র ছিল না।

পিতা তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন! তার জীবনের সুখ শান্তি, আশা আনন্দ, তার বাঁচিয়া থাকার গৌরব, আবশ্যকতা চিরদিনের মতই শেষ হইয়া গিয়াছে!

তার চোখে জল আসিল না, বক্ষে একটা দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত জমিয়া উঠিল না। তার সব শূন্য, সমস্তই শূন্যময় হইয়া গেল! উঃ, নিদারুণ বিধাতা! আর কি কঠোর তাঁর নিয়তির লিখিত বিধান!

অতুলবাবুর বাড়ীর পিছনে তাঁরই একটী কর্ম্মচারী ভূধর মুস্তোফির ছোট্ট বাংলো। বাড়ীতে মুস্তোফির স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন মধ্যে মধ্যে তার বড় বোন মিস মাধবীলতা মুস্তোফিও আসা-যাওয়া করিত। মাধবী লেডী ডাক্তার, বয়স তার এখন চল্লিশের কাছাকাছি। চাকরী ছাড়িয়া দিয়া সে আজকাল কাশীতে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে। দু' পয়সা রোজগার করিয়া নিজেরও গুজরাণ করে, ভাইএর সংসারেও অল্পসল্প কিছু সাহায্য পাঠায়।

মঞ্জুর জন্মকালে মঞ্জুর মা মাধবীকে আনাইয়া লইয়াছিলেন; তার হাতেই মঞ্জুর জন্ম। সেই হইতে মাধবী এই পরিবারের একজন আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুসংবাদ শুনিয়া সে আপনিই ছুটিয়া আসিল।

মুস্তোফির চাকরী গিয়াছে, এখানকার বাস ইহাদের উঠাইতে হইবে, তাহারই উদ্যোগ চলিতেছে। মাধবী গিয়া আরতিকে উঠাইল, তার সঙ্গে একত্র বসিয়া অকৃত্রিম অশ্রুবর্ষণ করিল, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তা'হলে কি রকম হবে দিদি ?"

আরতি এ পর্য্যন্ত এই কথাটাই শুধু ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। আর যত কথা—তার জ্ঞানোদয় হইতে যখন যা ঘটিয়াছে সবই—সে দিন-রাত এই কয়টা দিন ধরিয়াই ভাবিয়াছে,—শুধু তার নিজের কথাটাই ভাবিবার অবসর তার হয় নাই। প্রতিবেশীরাও তাহাকে এই প্রশ্ন করিতেছিলেন, পাওনাদারদের তো কথাই নাই। কিন্তু আরতির বিকল মনের ভিতর অতীতের গণ্ডী কাটাইয়া ভবিষ্যৎ এখনও নিজের বিকট মূর্ত্তি তাহাকে প্রদর্শন করিতে পারে নাই। তার গভীর শোকাহত চিত্তে

কেবল এই একটী মাত্র আঘাতই হাহাশব্দে অহোরাত্র বাজিতেছিল,—তার বাবা চলিয়া গিয়াছেন,—ভগবানের অবিচারে নয়, মানুষের অত্যাচারে! এর চেয়ে বেশি করিয়া আর কিছুই যে তার ভাবিবার আছে, সে কথা তার পাওনাদারের দল, অথবা অসহিষ্ণু প্রতিবেশিগণ বারে বারেই মনে পড়াইয়া দিলেও, তার মনে পড়ে নাই। মাধবী আসিয়াও সেই কথাই বলিল।

বাড়ী বিক্রী হইয়া গিয়াছে। নূতন মালিক দশ দিন সময় দিয়াছিল। দশ ছাড়িয়া পনের দিন হইয়া গেল, আর না উঠিলেই নয়। পিতৃকৃত্য মাধবীর চেষ্টায় কোন মতে সে সারিয়াছে। এই সব কঠিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া তার বিহ্বলতাও খানিকটা কাটিয়া আসিয়াছিল। বাড়ীওয়ালা নিতান্ত অভদ্র নয়,—অবস্থা বুঝিয়া আরও পাঁচ দিন সময় দিয়া গেল। বলিয়া গেল, এর পরে আর যেন তাহাকে অপ্রিয়ভাবে এ বিষয়ে কিছু না বলিতে হয়। আরতি সম্মতিসূচক মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, তাহা হইবে না।

মাধবী বলিল, "একটা কাজ করো না ভাই,—তোমার কাকাবাবু তো ধনী লোক,—তাঁকেই কেন চিঠি দাও না। তিনি হয় ত জানেন না।"

শুনিয়া আরতির মনটা সেই দিকেই ছুটিতে চাহিল; কিন্তু সে সন্দিগ্ধ স্বরে উত্তর করিল, "তাঁদের ভাল করে চিনিই না যে ভাই, বিশেষ কাকীমাকে!"

মাধবী বলিল, "তবু হাজার হোক নিজেরই কাকা তো, দু'দিন কাছে থাকলেই চেনা হয়ে যাবে কি না," বলিয়া সে আরতির নাম দিয়া নিজেই সব কথা বেশ করিয়া গুছাইয়া একখানা পত্র লিখিল, এবং ডাইরেক্টরী খুঁজিয়া ঠিকানা বাহির করিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। আরতি ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিল না। তার আজ হঠাৎ সলিলকে

মনে পড়িল ; এবং আরও মনে পড়িল, তার বাবা এই সলিলের উপরেই তাদের ভার ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিয়াছেন,—কই, কাকার কথা তো একটীবারের জন্যও তিনি তাঁর সেই শেষপত্রে কোথাও উল্লেখমাত্র করেন নাই ! আরতির মনের মধ্যটায় কেমন একটা দারুণ অস্বস্তি জমিয়া উঠিতে লাগিল, সে তো কই তা'হলে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিল না ! সলিলকে তো কোন খবর দেওয়াই হয় নাই।

তার পর সহসা তার মনে পড়িল, কই তাঁরাও তো গিয়া অবধি একটা পৌঁছান খবর পর্য্যন্ত তাদের দেন নাই। একখানা পত্র বা একটা কার্ড পর্য্যন্ত সে দিক হইতে এ পর্য্যন্ত আসে নাই। ইহারই বা কারণ কি ? তাহারা না হয় এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই বিব্রত। কিন্তু তাঁরা তো এ-সব জানিতেন না। কথা ছিল—বাড়ী পৌঁছিয়াই সুন্দরা তাঁদের মায়ের অনুমতি লইয়া পত্র লিখিবেন। কিন্তু,—তার পর অসমাপ্ত চিন্তাস্রোতকে মধ্যপথেই থামাইয়া সে পুনশ্চ এই কথা ভাবিল, হয় ত বাবার কাছে চিঠিপত্র এসেই থাকবে,—তাঁর তো এসে অবধি মনের স্থিরতা ছিল না, নিশ্চয়ই অনুমতি পাওয়া চিঠি এসেছিল ; না হলে আমার সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চিন্ত কি হ'তে পারতেন ?

তার চোখ দিয়া আবার ক্ষণ-প্রশমিত অশ্রু-স্রোত দ্বিগুণ হইয়া বহিতে লাগিল। হায়, হায়, যদি ওঁরা অনুমতি না দিতেন, যদি তার সঙ্গে সলিলের বিবাহের কথা না হইত, হয় ত তাদের নিরুপায় ভাবিয়া এমন করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না !

যে কান্নার কোন দিনই বিরাম নাই, যে অনুশোচনার কোন দিনই নিবৃত্তি নাই, সেই ক্রন্দনের ও হাহাকারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আরতির আরও তিন দিন কাটিয়া গেল। জন্মের মত তাদের শত সুখ-দুঃখের চির-নিকেতন ছাড়িয়া দিবার আর দুইটী মাত্র দিন তার বাকি।

সলিলকে তো সম্ভবই নয়, সুন্দরাকে পত্র লিখিবার কথা আরতির এ তিন দিনে অনেকবারই মনে পড়িতেছিল। কিন্তু কি বলিয়া আরম্ভ করিবে, কেমন করিয়া লিখিবে, এই কথাটা কোন মতেই সে স্থির করিতে পারিয়া উঠে নাই। মাধবীকেও এ সমস্ত কথা যে বসিয়া বসিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিতে পারে, তত বড় মনের বলও তার মনের মধ্যে ছিল না। একটির বেশি দুইটা কথাই তার কহিতে ভাল লাগে না, গলা দিয়া বাহিরও সহজে হয় না।

মিষ্টার ভুবনেশ্বর গুপ্ত, বা বি, গুপ্ত—আরতির কাকা—পত্রোত্তর দিয়াছেন। তাহাতে ভাইএর অকাল মৃত্যুর জন্ম দুঃখ এবং বিরক্তি দুই-ই জানাইয়াছেন। এ কার্য্য যে তাঁর নিতান্তই কাপুরুষোচিত হইয়াছে, তাহাও লিখিতে ভুল করেন নাই। অবশেষে জানাইয়াছেন যে, আরতির কাকীমা এখন বিশেষ অসুস্থ; তাই তাদের ভার লওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আরতি ও মঞ্জু কোন বোর্ডিংয়ে থাকিলে তিনি তাদের জন্ম মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া সাহায্য পাঠাইতে পারেন। পত্রের উত্তর পাইলেই টাকা আগাম পাঠাইতেও প্রস্তুত আছেন।

মাধবী বলিল, "পঁচিশ টাকা যে বাবুর খানসামারই মাইনে ছিল! পঁচিশ টাকায় তোমাদের দুজনের কখন চলে? ঢের টাকা তো মাইনে পান, কি বলে বল্লেন পঁচিশ টাকা করে দেবেন! তা হ্যাঁ দিদি, কাকীর অসুখ তাতে তোমরা এমন কি ভিড় বাড়াবে যাতে বাড়ীতে জায়গা দেওয়া যায় না? হ্যাঁ ভাই! এ আবার কি রকম?"

আরতি শূন্য দৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া ছিল। সে তেমনই থাকিয়াই উদাস কণ্ঠে কহিল, "হয় ত ভালই হলো,—আমারও এখন অত অচেনা লোকের মধ্যে থাকতে যেতে ভয় করছিল।"

তার আবার একবার সুন্দরাকে মনে পড়িয়া গেল, আঃ—সুন্দরা-দিদি,—তার পর তার মনে হইল, যদি সলিলের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া যাইত! উঃ! এই কয়টা দিনও কেন তিনি পাওনাদারদের হাতে ধরিয়া সময় লইলেন না!

সন্ধার একটু পূর্ব্বে মাধবী ভাইয়ের বাড়ী ফিরিয়া গেল, পরদিন সন্ধ্যার ট্রেণে তারা এখানকার বাস উঠাইয়া দিয়া কাশী যাত্রা করিবে। আরতির কোন একটা ব্যবস্থা না হইলেই বা সে কেমন করিয়া তাহাকে ফেলিয়া যায়? ভাবিয়া ভাবিয়া তারও যেন মাথা খারাপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। উঠিবার পূর্ব্বে নিশ্চেষ্ট আরতিকে আর একবার চেতাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া সে আবার বলিল, "আমি বলি, তুমি বরং খোকাকে নিয়ে কাকার ওখানে গিয়েই পড়ো, গেলে কি আর অযত্ন করতে পারবে? যতই হোক রক্তের টান তো আছে—"

আরতির রোদনারক্ত মুখ এই কথায় আরক্ততর হইয়া উঠিল। সে সহসা দৃপ্ত কণ্ঠে বাধা দিল,—"না মাধবীদি, সেখানে আমাদের জায়গা নেই। যেখানে প্রাণের টান নেই, সেখানে রক্তের টানে মায়া জাগিয়ে ঢুকতে পারবো না।"

মাধবী ক্ষুব্ধ চিত্তে ফিরিয়া গেল। এই ভিখারিণী রাজকন্যাকে এরও পরে তার প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলিয়া দেখাইতে সে ভরসা করিল না,—মায়াও হইল।

প্রকাণ্ড জনহীন বাড়ীখানা আরতির বুকের মতই অহরহঃ হাহা শব্দ করিয়া উঠিতেছে। আলোর ঝাড় চারিদিকে নীরব ব্যথায় ঝুলিয়া আছে বটে, কিন্তু আলো কোথাও নাই। দাসদাসী, আর্দ্দালী সবাই বিদায় লইয়াছে, শুধু যাইতে পারে নাই, রামরূপ। ছেলেমানুষের মত সেও থাকিয়া থাকিয়া আরতির সঙ্গে কাঁদিতে বসে, আর সর্ব্বদা মঞ্জুকে লইয়া

থাকে। বিচ্ছেদের দিন যতই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ততই যেন সে এই শিশুটীকে নিবিড় করিয়া বুকে টানিতেছিল।

এমন সময় সংবাদপত্রে এই দুঃসংবাদ পড়িয়া সলিল আসিয়া পৌঁছিল। সলিল যখন এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিল, তখন অতুলবাবুর ঘর-বাড়ী জিনিসপত্র সমুদায় নিলামে চড়িয়া গিয়াছে,—চারিদিক হইতে মৃত ব্যক্তির উপর গালিবর্ষণ করিতে করিতে যে যেটুকু পারে দখল করিয়াছে। আরতি ও মঞ্জুকে উঠাইয়া দিবার জন্য দিনের মধ্যে পঁচিশবার তাগিদ চলিতেছে, আরতি শুধু জোর করিয়াই সেখানে পড়িয়া আছে,—এই সমস্ত সংবাদই সে ষ্টেসনে নামিয়াই পাইয়া আসিল।

পাড়াপ্রতিবেশীরা খোঁজ খবর না লইয়াছেন এমন নয়। তবে এ সব অবস্থাপন্ন সৌখীন গৃহস্থরা সেকেলে ভাবাপন্নদের মতন পরের দায়ে মাথা খারাপ করিতে সময় ও সুবিধা পান না। কিছু আরতির নিশ্চেষ্টতার এবং দুঃসংবাদের নিন্দাটা সকলেই কম বেশী করিতেছিলেন। সে যে কাকার ঘাড়ে জোর করিয়া গিয়া চাপিতে অসম্মত হইয়াছে, সে কথাটা এর মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সকলেই মনে মনে ভয় করিতেছিলেন,—হয় ত বা আগামী পরশ্ব বাড়ীর নূতন অধিকারী তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিলে, তাঁদের বাড়ীতেই বা সে আসিয়া চড়াও করিয়া বসে!

ইঁহাদের ভিতরেই কেহ কেহ মন্তব্য করিতেছিলেন, "বাব্বা, হীরের টায়রা, হীরের নেকলেশ, বছর বছর মেয়ের জন্মদিনের উপহার! মেয়ে চলতেন যেন কোন্ জারের প্রিন্সেস্—এখন কে বাপু ঐ সৌখীন ভিকিরীকে জায়গা দিয়ে জায়গা জোড়া করবে?"

মঞ্জু ভাল করিয়া কিছুই বুঝে না, অথচ কিছু কিছু বুঝিতেও পারে। বাপের জন্য যখন তখন বায়না ধরিয়া সে কান্নাকাটি করিতে থাকে। দিদির মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বা বিরাগে কাছে যায় না। রামরূপ তার সকল

উপদ্রব সহ্য করিয়া তাহাকে বুকে করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যার পর সে কাঁদিয়া রাগিয়া রামরূপকে মারিয়া মহা হুলস্থূল বাধাইয়াছিল। খাওয়া পছন্দ হয় না। দুধ খাইবে না। ডিম, চকোলেট্, আইসক্রীম কিছুই নাই, ছাই খেতে দেয়! তার পর কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে রামরূপ তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আসিয়া দরজার কাছে বসিয়া নিজেই নীরবে কাঁদিতেছিল, "কোই হ্যায়"—বলিয়া বাহিরের বারান্দা হইতে কেহ ডাক দিল।

সসঙ্কোচে রামরূপ আসিয়া ডাকিল, "দিদিমণি! একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইচেন।"—

নূতন কোন পাওনাদার হইবে মনে করিয়াই আরতি শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "বলে দাও কাল সকালে আসতে, আজ আর পারবো না।"

আবার তাহাকে কতকগুলো কথা কহিতে হইবে,—অনর্থক, অনাবশ্যক বাজে কথা—এই ভাবিয়াই তার মনটা ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিল।

রামরূপ বলিল, "আমি তাঁকে বলেছিলুম, দিদির শরীর ভাল নেই, দেখা হবে না,—তাতে তিনি বল্লেন, তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন, এক্ষণই একবারটী দেখা করতে চান, বেশিক্ষণ বিরক্ত করবেন না।"

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই পরা শাড়ীটাকে গুছাইয়া লইয়া আরতি রামরূপের পিছনে পিছনে সেই কালরাত্রির পরে এই প্রথমবার তাদের সুচারুরূপে সজ্জিত ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরিপূর্ণ গৃহসজ্জার একটী অবশেষও আজ ইহাতে পড়িয়া নাই! একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার আর্ত্ত চিত্তকে বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়া আসিল।

ঘরের প্রায় মাঝখানে একজন একখানা টুলের উপর বসিয়া ছিল,— আরতি আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা ঝুঁকাইয়া তাহাকে নমস্কার

জানাইল। আরতি প্রতি-নমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া শুধু একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু অনবরত কান্নায় কান্নায় তার চোখ দুইটা এত বেশি ফুলিয়া উঠিয়াছিল যে, ভাল করিয়া আর চোখ চাহিবারও তার ক্ষমতা ছিল না, সে আগন্তুককে চিনিতে পারিল না।

আর একখানা টুল রামরূপ আরতির জন্য রাখিয়া গিয়াছিল। সেইটা হাত দিয়া একটু সরাইয়া দিয়া কোমল মমতামথিত ব্যথিত কণ্ঠে সলিল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বসো আরতি!"

এর আগে কোন দিনই সে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া কথা কহে নাই।

আরতি সলিলের গলার স্বর চিনিয়া চমকাইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে তার বেদনার উপর প্লাষ্টারের মতই আত্মচিন্তার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাটা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার ভগ্ন চিত্তকে গভীর ভারাক্রমণ হইতে মুক্তি দিয়া কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়া তার প্রবল শোকোচ্ছ্বাসকে একেবারেই যেন বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল।

টুলের উপর নয়, সেইখানের গালিচাহীন মুক্ত শুভ্র মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া আরতি তখন বাঁধভাঙ্গা নদীর মতই আকুল উচ্ছ্বাসে একেবারে অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সলিল অল্পক্ষণ তাহাকে কাঁদিবার অবসর দিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া সে তার কাছে আসিল। মেঝের উপর তার পাশে বসিয়া নিজের অশ্রু পুনঃপুনঃ মুছিতে মুছিতে সে অকৃত্রিম স্নেহে, সহানুভূতিতে ও বেদনায় একান্ত ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—

"নিরুপায়! আরতি! কেঁদে তো কিছুই আর করতে পারা যাবে

না। ওঃ কি যে হয়ে গ্যাল! কি হয়ে গ্যাল! আমার এখনও যেন বিশ্বাস হচ্চে না!"

এমন করিয়া কেহই তো তাহাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই! আরতির আর যেন কাঁদিবার শক্তি ছিল না, তথাপি সে আবার পূর্ণোচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এ রোদনে তার অসহায় শূন্য চিত্ত যেন অনেকখানি লঘু, অনেকটাই শান্ত হইয়া আসিতেছিল। যতই যা হোক, আরতি তো নির্ব্বোধ নয়, একটী অপোগণ্ড শিশু লইয়া এই বয়সে একা অসহায় অবস্থায় সংসার সমুদ্রে ভাসা যে কি, তার সবটা না হোক, কিছু তো সে বুঝিতে পারিতেছে! এখন তার এটুকু অন্ততঃ মনের মধ্যে জাগিতেছে সে আর একা নয়। তার বাপ তাকে যার হাতে দিয়া গিয়াছেন, সে তার ভার লইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে আসিয়াছে!—

অনেকক্ষণ পরে সলিল ডাকিল—"আরতি!"

আরতি অনেক কষ্টে মুখের উপরকার অশ্রু-আর্দ্র আঁচলটা সরাইল, কথা সে কহিতে পারিল না।

"আমায় কেন আগেই খবর দাও নি? ঠিকানা তো তোমরা জানতে।"

আরতি নীরব রহিল। তার মনের মধ্যে কত কথাই গুমরিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু বলিবার উপায় বা ভাষা খুঁজিয়া পাইল না যে বলে,—

'তোমায় কেমন করিয়া খবর দিব? কি সুবাদে খবর দিব? তুমি তো আমার সত্যকার কেহই নও যে খবর দিব। তবে মন আমার একমাত্র তোমারই পথ চাহিয়া ছিল, আমি মনে মনে জানিতাম, তুমি আসিবে;—খবর না দিলেও আসিবে।'

তার অশ্রু-স্ফীত অরুণবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সলিলের বুক বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই আনন্দময়ী বালিকা! তাদের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাতের

দিনের কথা তার মনে পড়িতে লাগিল। তার পর মনে পড়িল মঞ্জুর সেই গান—

"কত আশা করে, তোমারই দুয়ারে,
ভিখারীর মত এসেছি—"

সলিলের দু'চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাত্রি গভীর হইতেছিল। রামরূপ অদূরে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ইহাকেই আরতির একমাত্র নিকটতম আত্মীয় বুঝিয়া সেও আজ অনেক দিন পরে ঈষৎ যেন আশ্বস্ত হইয়াছিল।

জনহীন পুরী স্তব্ধ, ঘর নিস্তব্ধ। শুধু সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে সলিলের হাতে বাঁধা রিষ্ট ওয়াচের একটুখানি অতি ক্ষীণ ধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছিল,—ঝিক্ ঝিক্—ঝিক্ ঝিক্।

"আরতি!" বলিয়া সলিল এবার তার হাত ধরিল,—

"কিছুই তো আর তাঁর জন্যে আমার করবার বাকি নেই, আরতি! এখন শুধু, তাঁর যেটুকু ইচ্ছা ছিল, সেইটুকু পূরণ আমায় করতেই হবে। কিন্তু এক্ষণই তো আর তা' হতে পারে না। তাই আমি ভাবচি, আপাততঃ আমার সঙ্গেই তোমাদের নিয়ে গিয়ে হয় দিদির বাড়ী—না হয় অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিই গে'। তার পর দেশাচার আর শাস্ত্র যে রকম মত দেয়,—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সলিল আরতির মুখের দিকে চাহিল। নিজের মনের শেষ দ্বিধাটুকুই হয় ত সেই একান্ত সকরুণ বিষাদ-বিকৃত মুখের ছবিতে বিসর্জ্জন দিয়া এবার দৃঢ় কণ্ঠেই সে তার কথা শেষ করিল,—

"যত শীঘ্র হয় তোমাকে আমার নিজের করে নিয়ে তাঁর যতটুকু পারি স্নেহের ঋণ শোধ করবো। তার পর মঞ্জু আমাদেরই,—"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিল,—

"আমারও তো আর নিজের ভাই নেই'।"

এইবার আরতি তার রক্তজবার মত চোখ খুলিয়া সলিলের স্নেহ-করুণ মুখের দিকে নীরবে চাহিল। তার সেই আরক্ত, স্তিমিত, রুদ্ধপ্রায় নেত্র হইতে একটা সুগভীর কৃতজ্ঞতার উষ্ণ ধারা সেইক্ষণে যেন উহার উদ্দেশ্যে ঝরিয়া পড়িল। মঞ্জুকে সে যে এমন করিয়া লইতে চাহিল, এইটুকুতেই তার সমস্ত চিত্ত যেন কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। তার মনের মধ্যে হয় ত ঈষৎ সংশয় ছিল যে, হয় ত উহাকে সে গলগ্রহ বোধ করিবে। তার দুরন্ত আবদারে ভাইকে সে তো জানে।

আরতির হাত সলিলের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, সে কথা দুজনকারই মনে ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সলিলই প্রথম সেটা জানিতে পারিয়া আস্তে আস্তে সেই ধৃত হাত ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ একটু সরিয়া বসিল। দুজনকার বুক চিরিয়া এক সঙ্গেই আতপ্ত দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া আসিল। হয় ত একই কথা দুজনকার চিত্তে একসঙ্গেই উদিত হইয়াছিল,—যদি আজ তাহারা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হইত!

পিতার মৃত্যুর পর এই সর্ব্বপ্রথম আরতি রামরূপকে ডাকিয়া সলিলের জন্য বিছানা পাতিয়া দিতে আদেশ করিল। সলিলকে খাওয়ার কথা বলাও যে দরকার, তাহাও তার মনে পড়িল। কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—

"অনেক রাত হয়ে গেল, আপনার তো খাওয়া হয় নি।"

সলিল বলিল, "আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না আরতি! আমি ট্রেণেই খেয়ে নিয়েছি, আমি এখন শুতে যাই; তুমি ঘুমোও। কাল পাঞ্জাব মেলেই আমরা বেরিয়ে পড়ি, কি বল?"

আরতির বুক যেন হঠাৎ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এ বাড়ী তাহাকে ছাড়িতে হইবে সে জানা কথা; তথাপি সে যে এতই শীঘ্র ছাড়িতে হইবে, নিশ্চিতই ছাড়িতে হইবে, ছাড়িবার আর বিলম্বমাত্র নাই, এই

মনে করিতে তার মন যেন আকুল হইয়া উঠিল। তার মা বাপের স্মৃতি-পূত এই বাড়ী! এ যেমনই ভীষণ, তেমনই মধুর! গরল এবং অমৃত এর মধ্যে যেন পাশাপাশি স্তূপীকৃত রাখা আছে, দুইই তার পক্ষে সমান লোভনীয়।

আমাদের প্রিয়জনের স্মৃতি—সে যত মর্ম্মান্তিকই হোক, তবু সে বিশ্বের সমুদায় আনন্দের চেয়েও লোভের বস্তু।

ক্ষণকাল পরেই আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল,—

"আচ্ছা।"

সলিল তাহাকে যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কোন অসুবিধা হবে না? তা হলে পরশুই যাবো।"

আরতির মনে পড়িল, পরশু তার বাড়ী ছাড়ার কথা। সে এবার অনেকটা সহজভাবেই বলিল—

"না, কালই যাব।"

"আচ্ছা, কালই যাওয়া যাবে।" বলিয়া সলিল আরতির কাছে বিদায় লইয়া রামরূপের সঙ্গে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

আরতির এই ক্লেশ-কাতর মূর্ত্তি, তার ভীষণ দুর্দ্দশাপন্ন অসহায় অবস্থা, তার প্রতি তাহার একান্ত বিশ্বস্ত নির্ভরতা সলিলের সংশয়াবর্ত্তে নিপতিত সংগ্রাম-বিধ্বস্ত চিত্তকে অধিকতর দৃঢ় রূপেই স্থির সঙ্কল্পের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। নতুবা এখানে আসার সময়েও সে মায়ের অসম্মতিতে এ বিবাহ করা সম্ভব মনে করে নাই। মায়ের কাছে এবার নিজেই অনুমতি চাহিতে গিয়াছিল। আরতিকে তার ভালবাসার কথা, আরতির পিতাকে বাগ্‌দান করার কথা, আরতিকেও তার আভাষ দেওয়ার কথা কিছুই সে মার কাছে গোপন করে নাই। তার পর সংবাদপত্রে প্রচারিত অতুলবাবুর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আকস্মিক আত্মঘাতের

কথাও জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতেও কি তুমি মত দেবে না? এখন যদি আমি তাকে বিয়ে না করি, তার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখ ত।"

মহামায়া যুক্তি-তর্কে ভুলিলেন না, তিনি বলিলেন,—

"যতই যা হোক, আমি যে তীর্থস্থানে ঠাকুর মন্দিরে বসে সত্য করলেম, সে আমার কি দিয়ে কাটাবো বলে দাও? আমার তো আর একটা ছেলে নেই যে তাকে গছাবো। তা—"

তার পর আবার বলিলেন, "তার পর এ'ও বলি সলিল! ওই যে রাজ্যের লোককে পথে বসিয়ে বিষ খেয়ে মরা, এই বা ইচ্ছাসাধে আমার বংশের রক্তে আমি ডেকে আনি কেন? এ কি ভীষণ জুয়াচুরি নয়?"

সলিল মনের মধ্যে এ কথায় আঘাত পাইল। অতুলবাবুর স্নেহ স্মরণ করিয়া তাঁর এই শোচনীয় ও অকাল মরণে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া বলিল, "না না, তিনি জুয়াচোর ক্লাশের লোকই ছিলেন না মা, আমার দুর্ভাগ্য যে তুমি তাঁকে দেখ নি। কাগজে যে রকম লিখেছে—টাকা শোধ করবার কোন উপায়ই তাঁর ছিল না, তাই তাঁকে বাধ্য হয়েই এমন করে মরতে হয়েচে। না হলে হয় ত জেলে যেতে হ'তো,—মানী লোক, অতটা সইতে পারেন নি।"

মহামায়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "বলিস্ কি! শোধ না দিতে পারে দণ্ড সয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতো,—ভীরুর মত মরে গিয়ে ফাঁকি দেওয়া! তার পর তোমরা উল্টে আবার আমার ছেলে মেয়ের গতি কর। না—আমার মত নয়, আমি কখন মত দোব না। বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষের মেয়ে আমার ঘরে আসবে না।"

শেষ আশা ভঙ্গে ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া সলিল জীবনে এই প্রথমবার জননীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"বিয়ে না দেবে নাই দেবে, দিও না—তবুও আমায় একবার তাদের এতবড় দুঃসময়ে খবর নিতে যেতেই হবে। অনেক তারা আমায় যত্ন করেচে, তারও তো একটা শোধ আছে,—মানুষের চামড়া তো গায়ে আছে আমার"—

এই বলিয়া সে জোর পায়ে জুতার শব্দ বাজাইয়া চলিয়া গেল। মা পিছন হইতে শ্লেষ-গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন,—

"তুমি এখন সাবালক হয়েছ, নিজের ইচ্ছামত চলবে বই কি!"

কথা দুইটা আগুনে তাতানো লোহার শলার মতই সলিলের কান দুইটার মধ্যে গিয়া তাকে বেঁধার ব্যথা এবং পোড়ার জ্বালা একসঙ্গেই প্রদান করিল। এই যে শেষ কথাটা মা বড় দুঃখের সুরেই উচ্চারণ করিলেন, এর মধ্যে সলিলের সমস্ত জীবনের অতীত ইতিহাসটাই যে প্রলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

"তুমি এখন সাবালক হয়েছ, ইচ্ছামত চলবে বই কি!"

নির্ম্মম, কিন্তু সত্যের প্রত্যাঘাত! গভীর দ্বিধার দ্বন্দ্বে সলিলের সমস্ত মনটাই দুলিতে লাগিল।

১৫

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই আরতির সর্ব্বপ্রথম মনে পড়িয়া গেল, আজ তাকে এলাহাবাদ ছাড়িতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তার পর তার স্মরণে আসিল, এর আগে যতবারই সে তার বাবার সঙ্গে এলাহাবাদের বাহিরে গিয়াছে, সে সব যাত্রার সঙ্গে তার আজিকার দিনের এ যাত্রার একটুখানিও মিল নাই। সে সব দিনের সেই উৎসাহ-ব্যস্ততা' কর্ম্মোত্তেজনা, আর আয়োজনের

বিপুলতা মনে পড়িতেই সে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ক্রমাগত মাল কমাইবার চেষ্টা করিতে করিতেও তখনও তার চারটে ছোট বড় স্যুটকেশ ও অ্যাটাসিকেশ, তার বাবার চার পাঁচটা, মঞ্জুরই তিনটে,—তা' ছাড়া, হ্যাটবক্স, জুতার বাক্স, টেনিশ ও ব্যাড্মিণ্টন খেলার সরঞ্জাম. দু' তিনটে হোল্ডঅল, টিফিন বাস্কেট্স্, টিফিনকেশ, আর ঘরকরনা পাতার কত কি-ই না ছোট বড় মোটে ঘাটে বাঁধান ভরাণ, তোলান করাকরিই করিতে হইয়াছে। আর আজ? কি আছে আজ তাদের? তার সমস্ত গহনা, দামী শাড়ীগুলি পর্য্যন্ত সে তার বাপের পাওনাদারদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। সাধাসিধা শাড়ী ব্লাউসের দুইটা পুরাতন স্যুটকেস আর মঞ্জুর কতকগুলি স্যুট—এই পড়িয়া আছে, যা তারা নিতান্ত দয়া করিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। আর আছে রান্না ও খাওয়ার যোগ্য তাদেরই বাছ ফেলিয়া দেওয়া দুপাঁচখানা ফুটাফাটা বাসনপত্র। আরতির সমস্ত মন যেন সঙ্কোচে গুটাইয়া এতটুকু ছোট্ট হইয়া গেল,—এই কি তার শ্বশুরঘর করিতে যাওয়ার ঘরবসত? সে যে দুদিন আগে একজন লক্ষপতির মেয়ে ছিল!

একটা নিদারুণ ক্লান্তিকর নির্ব্বেদের বশে সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না,—আবার গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। তার পর কান্না। এ কান্নার তো আর তার শেষ নাই!

মাধবী সেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে কাশী যাইবে, অথচ আরতিকে এমন অসহায় দেখিয়া যাওয়াও তার পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংসারে এক একটা লোকের স্বভাবে এমন একটা জিনিষ থাকে, তারা পরের জন্য না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। মাধবীরও সেই দশা ছিল। আজ ভোরের বেলাই সে আরতির কাছে ছুটিয়া আসিল। সে জানিত, ঘুম আরতির চোখে নাই। রাত্রেও সে প্রায়ই ঘুমাইতে পারে না।

মাধবী আসিয়া কাছে বসিল। তার মুখ একান্ত মলিন, দৃষ্টি প্রশ্নময়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তার বুকে নাই। উত্তর যখন জানা থাকে, তখন প্রশ্ন করার বিড়ম্বনা বড় সহজ নয়, অথচ না করিলেও স্থির থাকা যায় না।

আরতি নিজে হইতে কোন দিন কথা কয় না,—আজ সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কহিল,—

"মাধবীদিদি, আমরা আজকের পাঞ্জাবমেলেই কলকাতা যাচ্ছি ভাই,—তোমার সঙ্গে হয় ত আর কখন দেখাও হবে না।"

তার কণ্ঠে একটা আর্দ্র করুণতা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবার আসিয়া পর্য্যন্ত এ-রকম স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর তার গলায় মাধবী একদিনও শুনিতে পায় নাই। সে ঈষৎ বিস্মিত এবং একটু আশ্বস্ত হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কোথায় দিদিমণি? কাকা বুঝি তার করেছেন? বলেছি তো, যতই হোক আপনার লোক ত বটে! বেশ হয়েচে!"

আরতি মুখ নত করিয়া কহিল "না, কাকা কিছু লেখেন নি, সেখানে তো যাচ্ছি না।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল "তবে কোথায় ভাই? মামার বাড়ী কি?"

আরতি কহিল, "মামার বাড়ী তো আমার নেই। মা দিদিমার এক সন্তান ছিলেন,—দিদিমাও তাই।"

মাধবী কহিল "তবে?"

আরতি একটুখানি নীরব থাকিল। তার পাণ্ডু মুখে ঈষৎ রংয়ের আভাষ মৃদু হইয়া দেখা দিল। সে একটা ঢোঁক গিলিয়া নিজেকে ঈষৎ শক্ত করিয়া লইয়া ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল "সলিলবাবু আমায় নিতে এসেছেন, বাবার একজন জানা লোক—"

মাধবী সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল—"কই, আগে' ত তাঁর কথা কিছু বল নি ? ভাল করে চেনো ত ?"

আরতির কয় দিনের সেই বর্ষাকাশের মতই যেন নিবিড় মেঘাচ্ছন্নবৎ মুখে একটুখানি মৃদু হাস্যরেখা ক্ষণেকের বিদ্যুতের মতই ফুটিয়া উঠিল। সে মাধবীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিয়া কহিল,

"খুব চিনি, বাবা তাঁর হাতেই আমায়—আমাদের দিয়ে গ্যাছেন !"

বলিতে বলিতেই তার গলা কাঁপিয়া স্বর ভাঙ্গিয়া আসিল ; এবং সেই এতটুকু হাসির স্থানে একটা ঝরণা-ধারার মতই খানিকটা তপ্ত জলের ধারা তার আকুল দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিয়া ঝরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেকখানি সুস্থির হইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল মাধবী। সে সলিলের সঙ্গে দেখা করিয়া, তার অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তৃপ্ত হইয়াই ফিরিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "সত্যই কি আর ঈশ্বর নেই ?"

বেলা যখন প্রায় দশটা—সলিল বাহিরের যতটা সম্ভব এ কয় দিনের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিয়া, রামরূপের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অতুলবাবুর শেষ সময়ের সমস্ত কাহিনী জানিয়া লইয়া, যাত্রার জন্য যেটুকু ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজন সেগুলি সারিয়া, তার পর আরতির সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। রামরূপকে সে তার ঠিকানা দিয়াছিল, বাড়ীতে কিছু কাজকর্ম্ম সারিয়া রামরূপ তাঁদের কাছে গিয়াই থাকিবে স্থির হইয়াছিল,—নতুবা মঞ্জুর কষ্ট হইতে পারে।

আরতিকে আজ যেন কালকের অপেক্ষা একটুখানি সজীব বোধ হইল। তার শরীর মন সমস্তটাই যদিও শোকে যেন আচ্ছন্ন হইয়াই রহিয়াছে, তবু তার মধ্যেও একটু জীবনের নিবন্তপ্রায় জ্যোতির আভাষ সেই অশ্রুস্ফীত চোখে মুখে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইয়া

পড়িতেছিল। সলিলকে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল, বলিল "আজই যাবেন ত?"

সলিল তার খাটের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সস্নেহে উত্তর করিল,—"যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

আরতি একটা দীর্ঘনিশ্বাসকে ছোট্ট করিয়া ফেলিল। ক্ষীণ হাস্যের সহিত কহিল,

"চলুন, আজই যাই—কাল তো আর থাকতে দেবেও না।" এবার একটা খুব বড় দীর্ঘশ্বাস আর তার সেই কৃত্রিম হাসির দুর্ব্বল বাধা মানিল না।

বেলা যখন প্রায় একটা,—অনেকখানি দ্বিধাকে দমন করিয়া ফেলিয়া, সমস্ত রাত্রি এবং এই সমুদায় দ্বিপ্রহর বেলার সকল দ্বন্দ্বকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিয়া, এক সময় সলিল আসিয়া আরতিকে বলিল,

"আমার একটা কথা বলবার আছে আরতি! অনেকবারই ভেবেছি এখন বলতে পার্ব্বো না; কিন্তু হয় ত সে কথা তোমায় না জানিয়ে তোমায় আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে একটু অন্যায় করা হবে। তাই মনে করচি, সব কথা তোমায় খুলে বলাই হয় ত আমার পক্ষে কর্ত্তব্য।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সলিল আপনার কথায় আপনিই মনে মনে আহত হইয়া গিয়া থামিয়া পড়িল। ভূমিকার ধরণে আরতিরও বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। তার হঠাৎ মনে হইল, আবার যেন তাকে তার বাপের সেই মর্ম্মান্তিক শেষ পত্রের মতই নির্ম্মম কোন কিছু একটা অকথ্য কথা শুনিতে হইবে! তার ভিতরটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সলিল তার দিকে না চাহিয়াই কোন মতে বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমার মার এ বিয়েতে মত হয় নি,—তিনি বলেছেন, কিছুতেই তিনি

মত দেবেন না। এমন কি,—আর একজনের সঙ্গে ঠিকও করে রেখেছেন। তাই আমি তোমায় এখন তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবো না, দিদিও হয় ত রাজী হবে না,—তাই সকালেই আমার এক বন্ধুকে বাড়ী ঠিক করতে তার করেছি। সেইখানে তোমায় রেখে, সেইখান থেকেই তোমায় বিয়ে করে, তার পর মার কাছে নিয়ে যাব। মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে ত্যাগ করে নিশ্চয়ই থাকতে পারবেন না।

আরতির বুকের সে কম্পন থামিয়া গিয়া তাহার স্থলে গভীরতর একটা নিশ্চল স্তব্ধতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এবার দেখিতে দেখিতে তার ঈষৎ আশালোকে অনুরঞ্জিত শোকাচ্ছন্ন দীন মূর্ত্তি একটা স্তব্ধ-গম্ভীর পাষাণ-মূর্ত্তির রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। তার সমস্ত ভবিষ্যতের সমুদায় মুক্ত দ্বারগুলা, যেখান দিয়া গত সন্ধ্যা হইতে আবার চন্দ্রকিরণ ও উষালোক প্রকট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সহসা যেন এক নিমেষেরই একটা নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে এক সঙ্গেই প্রবল বেগে রুদ্ধ হইয়া গেল।

সলিল বলিতে লাগিল,—কি বলিবে, ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিবারও শক্তি তার ছিল না, অপরাধীর মতই নত মস্তকে ভগ্ন ও জড়িত কণ্ঠে সে কোনমতে খাপছাড়া ভাবে শুধু যা-তা করিয়া বলিতে লাগিল,—

"দিদি যদি মার ভয়ে রাজী না হয়, তাই এ রকম ব্যবস্থা করেছি। আমি অবশ্য সেখানে থাকবো না,—আমার মাষ্টার মশাই বুড় মানুষ, তিনিই তোমার কাছে আপাততঃ থাকবেন। আর এই রামরূপ তিন চার দিন পরেই যাবে। বেশি দিন তো নয়, তিন মাসেই হয় ত হতে পারবে,—তখন মার কাছে,—মা তোমায় দেখলে রাগ ভুলে যাবেন,—নিশ্চয়ই যাবেন। মা খুব ভাল, তবে ঐ কোথায় এক সত্য করে এসেই এতটা শক্ত হয়ে উঠেছেন। না হলে আর এত আপত্তি হতো না। তুমি কিছু মনে করো না আরতি, এর পরে দেখ, মা কি

৯

রকম স্নেহময়ী—কত যত্ন করতে জানেন।—নিশ্চয় জেনো সে দিন আসবে।"

তার পর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তার কুণ্ঠাভরা চিত্ত যেন আর এত বড় নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে পারিল না। সে যেন মনের মধ্যে হাঁফাইয়া উঠিয়া একটা অছিলা করিয়াই সরিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,—

"যাই, গাড়ি এলো কি না দেখি গে—"

আধ ঘণ্টা পরে যাত্রার পোষাকে সাজিয়া আসিয়া সে আরতির ঘরে ঢুকিল। তার নিজের লজ্জাকে চাপা দিবার জন্য বিশেষ চঞ্চলতা দেখাইয়া, তখনও ঠিক সেই একই ভাবে উপবিষ্ট আরতির উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—

"এ কি! এখনও তুমি তৈরী হও নি? নাও, নাও—উঠে পড়ো আরতি! আর যে মোটে দেরি নেই,—একটা বেজে গ্যাছে,—ঠিক দুটোয় যে ট্রেণ ছাড়বে। একটা কিছু পরে তৈরী হয়ে নাও।"

আরতি এতক্ষণের পর তার সেই প্রস্তরীভূত দেহ মধ্য হইতে তেমনই প্রায়-নিশ্চল চিত্তকে টানিয়া তুলিয়া, সলিলের আগ্রহ-ব্যস্ত মুখের উপর তার কয় দিনকার অবিশ্রান্ত রোদনের ফলে আরক্ত ও স্ফীত হইলেও এক্ষণে মেঘ বিমুক্ত সূর্য্যের মতই তীক্ষ্ণ রশ্মিমান দুই নেত্রকে স্থির করিয়া রাখিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর করিল,—

"আপনি যান,—আমি যাবো না।"

সলিলকে এই উত্তর যেন এনার্কিষ্টের বোমার মতই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আঘাত করিল। সে সুস্পষ্ট চমকে চমকাইয়া উঠিয়া যেন ঘোর বিস্ময়ে এবং সাতঙ্কে উচ্চারণ করিয়া উঠিল,—

"অ্যাঁ, কি বল্লে আরতি? যাবে না? আমার সঙ্গে তুমি যাবে না?"

আরতি তার সেই দৃষ্টিকেই সমান স্থির রাখিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিল, "না,—"

সলিল এক মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তার পর বাক্যোচ্চারণের শক্তি ফিরিয়া পাইলে, ব্যথিত ভর্ৎসনার সহিত কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমার কি অপরাধ আরতি? আমায় তুমি কি দোষে ত্যাগ করতে চাইচো? ঠকিয়ে তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারতুম, আমার বিবেক তাতে সায় দেয় নি; কিন্তু সে যে সমস্যা, সে ত একা আমার,—তোমার তো নয়! তোমার বাবা তোমায় আমাকেই দিয়ে গেছেন, তুমি আমার, এই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হলো না?"

আরতি একবারের জন্য ঈষৎ বিমনা হইল। পরক্ষণেই সেটুকু সে সামলাইয়া লইয়া পূর্ব্বের মতই সঙ্কল্প-কঠিন স্বরে কহিল,

"আপনার মা যখন অন্যকে কথা দিয়ে সত্যবন্দী হয়েচেন, তখন আপনাদের পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করে সেখানে আপনাদের গলগ্রহ হ'তে আমি কিছুতেই যাব না। আপনি ফিরে গিয়ে তাঁকেই বিয়ে করে আপনার মাকে সুখী করুন।"

কথাগুলা সত্য হইলেও, বিশেষতঃ আরতির নিজের মুখে—যে আরতি কোন দিন লজ্জায় ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া বেশি কথাই কহে নাই,—বড় বেশি কঠিন শুনাইল। সলিল আহতের ভাবে ত্বরিৎস্বরে কহিয়া উঠিল,

"আরতি! না—না, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না,—আমি তোমায় গলগ্রহ ভেবে নিচ্চি? এ কি কথা তুমি বললে? এরই মধ্যে তুমি মুসুরির সব কথা কি ভুলে গেলে? তুমি আমার গলগ্রহ! কি বলচো আরতি? ছিঃ!"

অকথ্য তিরস্কারের সঙ্গে অব্যক্ত একটা যন্ত্রণার তরঙ্গ তার বুকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—ছি, ছি,—এত বড় অবিচার!

কিন্তু আরতি তাহা বুঝিতে চাহিল না। সে মৌন দৃঢ় নতমুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—কথাও কহিল না, কোনরূপ বিচলিততাও দেখাইল না। সলিল তার এই অবিচলতায় অস্থির হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে নিজের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তার যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিতণ্ডা কিছুতেই কিছু হইল না,—আরতির সেই একই কথা,—"আপনি যান, আমি যাবো না।"

অবশেষে তাহার এই একান্ত অবাধ্যতায় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া সলিল, রূঢ় হইবে জানিয়াও না বলিয়া পারিল না—"আমার সঙ্গে যাবে না তো এখানে থাকবে কোথায়? এরা তো কাল সকালেই বাড়ী দখল করতে আসবে।"

সে মনে করিয়াছিল আঘাতটা নির্ম্মম হইলেও নিশ্চয়ই এটা ডাক্তারের হাতের ল্যান্‌সেটের কাজ করিবে। অবাধ্য আরতি এই বিস্মৃত স্মৃতির নির্ম্মম স্মরণে নিশ্চয়ই পোষ মানিবে। কিন্তু ফলে তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যেমন ছিল ঠিক তেমনই অনমিত অচঞ্চল থাকিয়া দৃঢ় স্বরে আরতি উত্তর করিল,—

"সে আমার ভাবনা, আপনার নয়। আপনি ফিরে যান, আমার জন্য ভাববেন না।"

আরতির এই অন্যায় অসঙ্গত জিদে ও অকৃতজ্ঞতায় এবার সলিলের মনের মধ্যে একটা অপমানিত ক্রোধের মৃদু তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে ঠোঁটের উপর দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইবার অবসর লইল। তার পর কতকটা কৃতকার্য্য হইয়া আবার সলিল তাকে মিনতি করিল,

"আচ্ছা বিয়ের কথা—সে পরেও তো হ'তে পারবে। আপাততঃ বন্ধু বলে, আত্মীয় মনে করে আমার সঙ্গে এসো। আমার বাড়ী না হোক্,

দিদির বাড়ীতেই আমি তোমায় পৌঁছে দিই গে, এইটুকু শুধু আমায় দয়া করে করতে দাও, লক্ষ্মীটী! তার পর যা তুমি ভাল মনে করবে করো, যা আমায় হুকুম করবে আমি শুনবো। নিজে এ বিষয়ে আমি তোমায় আর কিছুই বলবো না এই কথা দিচ্চি। উঠে এস।"

আরতি কথা কহিল না।

সলিল তার দিকে ঠায় চাহিয়া ছিল। মুখের অপরিবর্ত্তিত ভাবে কোন আশাই সে দেখিতে পাইল না—তবু আশার ভান করিয়াই কহিল,—

"সময় আর মোটে নেই,—এস আরতি, আর দেরি করলে ট্রেন ফেল করতে হবে।"

আরতি নড়িল না, জবাবও সে দিল না। যেমন তেমনই রহিল।

সলিল তখন কাছে সরিয়া আসিয়া, তার সাম্‌নে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, একেবারে হতাশ ক্লান্ত করুণ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—

"তোমার পায়ে পড়চি আরতি! দয়া করে আর আমায় কষ্ট দিও না! মিথ্যে ট্রেনটা ফেল হলে অসুবিধের একশেষ হবে, তা কি বুঝতে পারচো না? উঠে পড়ো। তোমার কাছে এইটুকু দয়া চাইচি, তাও আমায় তুমি করবে না?"

আরতি এম্‌নই ভাবে চাহিয়া রহিল, যেন সে একটা মানুষের হাতে গড়া পাথর-কাটা মূর্ত্তিই বা! মানুষের হাজার ডাকেও সাড়া দিবার ক্ষমতা তার যেন নাই, সে যেন নিরুপায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষকালে সলিল তার সেই নিতান্ত হীন অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মুখ তখন বিরক্তিতে, অপমানে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। হাতটা তুলিয়া ঘড়ি দেখিল। তার পর আরতির

দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "ট্রেন ছেড়ে গ্যাছে!—যাক্, কতকগুলো বিড়ম্বনা ভোগ করা দুজনেরই ভাগ্যে আছে,—হোক, তাহলে আজ থাকতেই হলো।"...

বলিয়া অসন্তোষের সহিত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়া ভাড়াটে গাড়ি দুখানাকে বিদায় করিয়া দিল। খানিকক্ষণ মনের অস্থিরতায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল। তার পর আবার আর একখানা গাড়ী রামরূপকে দিয়া ডাকাইয়া আনিয়া তাহাতে করিয়া বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

গেল সে প্রথমে অতুলবাবুর আফিসে। সেখানে সন্ধান লইয়া বাড়ীর নূতন ক্রেতার সঙ্গে দেখা করিয়া অনেক কষ্টে এই পর্য্যন্ত করিতে পারিল যে নগদ এক শত টাকা হাতে লইয়া সে তাহাকে তিনটী দিনের সময় দিল। এ তিন দিনের মধ্যে আরতির বিমুখ চিত্তকে যেমন করিয়াই হো'ক জয় করিয়া ফেলিতেই হইবে, এই স্থির নিশ্চিত করিয়া সলিল যখন বাড়ী ফিরিল, তখন মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য অস্তাচলের অভিমুখে অনেকখানিই অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। বেলাশেষের তান মাঠে বাটে, গৃহে বাহিরে সর্ব্বত্র হইতেই বাদিত হইতেছিল। সমস্ত পৃথিবী তখনও গ্রীষ্ম সূর্য্যের উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হইয়া আছে।

ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট শরীর মন লইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় একমাত্র অবশেষ লোহার বেঞ্চিখানার উপর এলাইয়া বসিয়া পড়িল। অনিয়মে পরিশ্রমে তার সঙ্গে দুর্ভাবনায় তার সুখ-পালিত দেহ মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সঙ্কট তাকে যেন সব দিক দিয়াই ঘেরিয়া ফেলিতেছে। মায়ের দিকটাতেই সে সবচেয়ে প্রবল বাধা বোধ করিয়া একে ত যথেষ্ট বিপন্ন হইয়াই রহিয়াছিল, আবার তার ঠিক উল্টা দিক হইতেও যে তত বড় প্রচণ্ড আরও একটা ঝড় উঠিতে পারে, এ যেন তার ধারণাতেও

ছিল না। এ' যে যার জন্য চুরি করা সেই তাকে আজ চোর অপবাদ দিতে বসিয়াছে !

রামরূপ আসিয়া এক পেয়ালা চা আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

"নাঃ, দরকার নেই",—বলিয়া সলিল, তার ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত শরীরটার উপরই সবাইকার অবিচারের শোধ তুলিতে চাহিয়া তাকে আরও একটুখানি পীড়ন করিতে চাহিল।

শোধ লইবার প্রকৃত পাত্রের উপর শোধ লওয়ার যখন সুযোগ পাওয়া যায় না, তখন নিরুপায় মানুষ নিজের উপরেই অন্যের অপরাধের শোধ তোলে, এ প্রায় দেখা যায়।

মঞ্জু ছুটিয়া আসিয়া এক সময় তাকে জড়াইয়া ধরিল, "সলিলদাদা ! টই আমরা টো ডেলুম না ?"

সলিলের এবার গলার কাছে একটা কি যেন ঠেলিয়া আসিল। সে মঞ্জুকে কাছে টানিয়া লইয়া তার পুরন্ত নরম গাল দুটীতে হাত দিয়া আদর করিতে করিতে গাঢ়স্বরে উত্তর করিল,—

"না ভাই, আজ গেলুম না।"

"টাল ডাবো ?"

"হুঁ"—বলিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া সলিল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাসের শব্দে মঞ্জু সাশ্চর্য্যে তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মুখ একটু ভার হইল। এই কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের জ্বালায় দিদির কাছে সে তো যাইতেই ভয় পায়। আবার ইহাকেও সেই রোগে ধরিল না কি ? এমন ধারাই যেন একটা অনুভূতি তার ক্ষুদ্র মনের মধ্যে হয় ত বা আসিয়া থাকিবে !

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও বেশি গাঢ় হয় নাই। আরতি ধীর পদে আসিয়া তাহার পায়ের কাছে দূর হইতে একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া মঞ্জুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

সলিল চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মনের ভিতর ভাঁটায় পড়া আশাস্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। সে বিস্ময়-স্মিতমুখে মুখ তুলিয়া চকিত চঞ্চল স্বরে বলিয়া উঠিল,—

"এ কি আরতি ! হঠাৎ এত ভক্তি কেন ?"

তার বোধ হইল আরতি হয় ত প্রণামান্তে নিজের ভুল স্বীকারোদ্দেশ্যেই ক্ষমা লইতে আসিয়াছে।

আরতি ততক্ষণে মাথা তুলিয়াছিল। মুখ তুলিয়া সেই প্রায়ান্ধকারে সলিলের দিকে চাহিয়া সে শান্তকণ্ঠেই উত্তর দিল,—

"হঠাৎ নয় তো,—আমরা যাচ্চি কি না, তাই আপনাকে বলে যেতে এলুম।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে সলিলের গলা যেন বুজিয়া গেল,—

"তোমরা যাচ্চো ! কোথায় যাচ্চ আরতি ?"

সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন দুটী করিয়াই সে অবাক হইয়া আরতির দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যাছায়ার মধ্যে যতটুকু দেখা যায়, দেখা গেল, আরতির চোখে মুখের আগের সেই শোকার্ত্ত ভাবটা আর যেন সেখানে মোটেই নাই, তার বদলে খুব স্পষ্ট একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা কঠিন হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটা যেন তার আসল মুখের উপর ঢাকা দেওয়া একটা লোহার মুখস্। সে বলিল,—

"কোথায় যাচ্চি, সে আপনার শুনে কাজ নেই, তবে মাধবী দিদিদের সঙ্গেই যাচ্চি, এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। থাক্—আর দেরি করবো না, আমি তাহলে চল্লুম।"

এই বলিয়া সে চলিয়া যায়,—সলিল ছুটিয়া আসিয়া তখন তার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"আরতি ! আরতি ! এত নির্ম্মম তুমি ! কোথাকার কে পর—

তাদের সঙ্গে যাবে, তবু আমার সঙ্গে যাবে না? এই তোমার বিচার হলো?"

আরতি দাঁড়াইল। মঞ্জুর হাত ছাড়িয়া দিয়া তাকে আদেশ করিল,—"তুই ওদের ওখানে যা,—" তার পর সলিলের উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি মৃদু হাসিল,—

"আপনিই বা আমার এদের চেয়ে বেশি আপন কিসে?—কিন্তু সে সব কথা যাক,—আমাদের জন্য আপনাকে অনেক কষ্ট পেতে হলো, দয়া করে ক্ষমা করবেন,—এখন তাহলে আমি চল্লুম"—

হল ঘরের যে দরজাটার সাম্নে পথ রোধ করিবার জন্যই সলিল দাঁড়াইয়া ছিল, সেটাকে পরিহার করিয়া আর একটা দরজা দিয়া আরতি ঘরের মধ্যে ঢুকিল, সলিল যে তার সঙ্গে আসিতেছে সে যেন তা দেখিয়াও দেখিল না।

"আরতি!" আবার সলিল আসিয়া তার পথরোধ করিয়া, সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"না, না, এমন করে যেও না আরতি! আমি তোমার পর—আমার মুখ না চাও, না-ই চাইলে! নিজের কথা, মঞ্জুর কথা—সেও একটুখানি ভেবে দেখ। কি ভাবে তোমরা মানুষ হয়েছ, এর মধ্যে অত কষ্ট কি সইতে পারবে? কেন এমন অবুঝের মত কাজ করচো? কি অপরাধ আমি করেছি যে আমার সংশ্রবও সইতে পারচো না? যদি কোন দোষ করে থাকি, ক্ষমাও কি করা যায় না? এত কঠিন সে অপরাধ? এত কঠিন তুমি?"

আরতি নীরব রহিল।

উত্তেজিত কণ্ঠে সলিল জিজ্ঞাসা করিল, "বল, বলে যাও, কি দোষ আমি করেছি যে আমায় তুমি এমন করেই বর্জ্জন করচো?

আচ্ছা, আরও একটা কথা বল,—কোন দিনই কি তুমি আমায় ভালবাসনি?”

এবার আরতি কথা কহিল, অনুত্তেজিত কোমল কণ্ঠে কহিল, “অপরাধ আপনার নয়। আমি যদি আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ হই, আমারই সে একান্ত অপরাধ হবে। তাই আমি সরে যাচ্চি। আপনিই বরং আমায় ক্ষমা করবেন।”

সলিল কঠিন কণ্ঠে কহিল “না, এর ক্ষমা নেই। এ অত্যাচার—এ দয়ার অত্যাচার আমার ’পরে না করে, শুধু একটুখানি দয়া করতেও তুমি ইচ্ছা করলে পারতে। অন্ততঃ আমার সঙ্গে গিয়ে, তার পর যে রকম হয়—”

আরতি হাসিল। অতি করুণ সে হাসি। কিন্তু হাসিয়াই সে উত্তর করিল, “তার পর আপনার দয়ার প্রত্যাশা ভিন্ন আর আমার কিছুই বড় বেশি বাকি থাকতো না,—আমি শুধু সেইটেই চাইনে’। আমি বেশ থাকবো সলিলবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমার ভার আমি নিজেই যখন নিচ্ছি, তখন অনর্থক আপনার এত ভাবনা কেন? আমি ওদের কাছে খুব সুখেই থাকবো আমার বিশ্বাস, আর তা’ আমি থাকবোই।”

অনেকক্ষণ নীরব থাকিবার পর সলিল একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক অভিমান-গূঢ় প্রগাঢ় স্বরে কহিল, “তবে আমার আর কিছুই তোমায় বলবার রইলো না, নিজের সম্বন্ধে তুমি যখন এতই স্থির নিশ্চিন্ত হতে পেরেছ।”

সে ধীরে ধীরে হলটা পার হইয়া আবার সেই সামনের বারান্দাটায় ফিরিয়া চলিয়া গেল। সেখানে এখন আগের চেয়ে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। সেই লোহার বেঞ্চিখানার উপর তখনকার চেয়েও বেশি

ক্লান্তভাবে সে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার বাগানের পানে উদাস চক্ষে চাহিয়া রহিল। সেখানে কতকগুলা জোনাকী ঝিলমিল করিতেছিল, আর সব অন্ধকার।

আরতি একা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া এইবারে যেন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সলিলকে সে ত হাসিমুখেই বিদায় দিয়াছে, কিন্তু এখন সে-দেখিল, এইবার চোখে তার জল ঠেলিয়া আসিতেছে। চোখের জল সে খুব দৃঢ় করিয়াই মুছিয়াছিল,—সহজে ফেলিবে না এই তার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তাহাকে আটকানোও তার সহজ বোধ হইল না। জীবনটা যেন তার তালে তালে চলিতেছে। এ অশ্রু একটুখানি আগের সেই হাসিটুকুর বিনিময়! এতদিন তার স্থদিন ছিল বলিয়াই আজ তার জীবনে এত বড় দুর্দ্দিনের অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে যদিই কখনও পারে, তবেই আবার তার মনুষ্যত্ব বাঁচিয়া উঠিবে, নতুবা এইখানেই যে সব শেষ!

১৬

সলিল চলিয়া যাইবার পর ছুটিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া নিকটবর্ত্তী আসনটায় বসিয়া পড়িয়া আরতি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। তার হাত দুখানি অবশভাবে দুপাশে ছিন্ন লতার মতই ঝুলিয়া পড়িল। তার অবসন্ন মাথাটা দেওয়ালের উপরে সে অলসভাবে লুটাইয়া দিল। এমন করিয়া আপনাকে একেবারে শিথিল অবসাদগ্রস্ত করিয়া দিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়াই অনেক কান্না কাঁদিল। তার সুবৃহৎ পাষাণ ভারের মতই প্রচণ্ড দুঃখের প্রকাণ্ড বোঝাটা এই কান্নার সঙ্গে এক একটা অগ্নিগর্ভ ধূমায়মান

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা করিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। নতুবা এত বড় দুঃখে তার বুক হয় ত বা ফাটিয়া যাইত! তার সেই অশ্রুধারা অভিষেকান্ধ অজস্র বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণ মেঘের মত গভীর কালো চোখের তারায় গভীর ব্যথার সঙ্গে ফুটিয়া রহিল একখানা মুখ, আর তাঁর চোখের সেই সকরুণ ব্যথাভরা শেষ মৌন দৃষ্টিটুকু।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত আরতি তেমন করিয়াই বসিয়া রহিল। কি কঠিন, কি নির্ম্মম ব্যবহারই তাকে দিয়া আজ তার অদৃষ্টদেবতা করাইয়া লইলেন! সে কি কোন দিন তার নিজের এত বড় অকরুণচিত্ততার কল্পনাও করিয়াছিল?

সলিল,—সলিল তাকে যথার্থই ভালবাসে। হ্যাঁ, তার সেই হতাশাক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তিতেই সুস্পষ্ট এই কথা ব্যক্ত হইতেছে। এর মধ্যে শুধু দয়া বা আর কিছু নাই, এ নির্ম্মল পবিত্র প্রেমচিহ্ন! আরতি বারেক উতলা হইয়া উঠিল, তবে কি—কিন্তু না,—সলিলের মা যখন তাহাকে ঘরে লইতে অনিচ্ছুক, তখন সে তাঁহাদের মাতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ জাগাইয়া দস্যুর মত মার বুক হইতে ছেলে ছিনাইয়া লইবে না। হোক, তার জন্য তার যত দুর্দ্দশা হয় হোক,—সলিলের ঐ কষ্ট চিরস্থায়ী নয়। দুদিন পরে সে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, তার নূতন পাওয়া সুন্দরী স্ত্রীকে সে আরও বেশি করিয়াই ভালবাসিবে। আরতির এমন কিছু নাই যে, তার জন্য অমন একটা পুরুষ চিরবিরহাকুল হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আজ যদি সে তার এই যৌবনোত্তেজিত জিদের মাথায় মায়ের অসম্মতিতে আরতিকে বিবাহ করে, দু'দিন পরে যখন তাদের মধ্যে নূতন প্রাপ্তির মোহটা একটুখানি কমিয়া যাইবে, তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যকার সন্তানের প্রাণ মার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, হয় ত মার মনে দুঃখ দিয়া আরতিকে লওয়ার জন্য মনে মনে সে অনুতপ্ত হইবে।—হয় ত

তার সে অনুতাপ ক্রমে ঈষৎ বিরাগে পরিণত হইয়া উঠাও খুবই অসম্ভব বা অসঙ্গতও নয়।

আরতি মনে মনে বলিল, বিপদ তখনই যথার্থ তার নিজের রূপে দেখা দেয়, মানুষ যখনই আত্মশক্তিতে সচেতন হয়ে না উঠে, অচেতন হয়ে পড়ে। মানুষের মনের মধ্যের ভালমন্দ শক্তিই তার মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান সহায়। এই বিবেকের প্রকাশ যেখানে যত কম, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশও সেইখানে তত বাধা প্রাপ্ত। আমার তো সবই গেছে, এইটুকুই যেন শুধু বাকি থাকে। আমি যা হারিয়েছি তার কাছে এখন আমার আর কোন ক্ষতিই ক্ষতিবোধ হবে না ;—দুঃখ যত আসে আসুক, আমার সবই সইবে। শুধু নিজের দুঃখ যেন অন্যের ঘাড়ে চাপাতে না লুব্ধ হই!

মাধবীর ছোট্ট বাসাবাড়ীতে প্রথম দিন পা দিয়াই আরতি যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এর আগে দূরে হইতেই সে অভাব ও দারিদ্র্য যতটুকু দেখিয়াছে, সেও এত কম যে, আজকের এর সঙ্গে তার একেবারেই মিল পাওয়া যায় না। সে নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া শুধু নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। এতক্ষণে সে বুঝিল, কেন মাধবী তাহাকে সঙ্গে না লইবার জন্য অত জিদ করিয়াছিল,—কেন তাহাকে আনিতে অতই কুণ্ঠিত হইতেছিল, কেনই সে সলিলকে ত্যাগ করাতে দুঃখিত এবং বিরক্তও হইয়াছিল!

কিন্তু পথ কই? এই অভাবগ্রস্ত পরিবারের অভাব বৃদ্ধি করিয়া এদের অন্নের অংশ গ্রহণ বাস্তবিকই অপরাধ, অথচ না করিলেই বা সে করে কি? তার ভাগ্যই যে তাকে নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিতে দিতে প্রস্তুত নয়, সে করে কি?

অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত সে মাধবীকে গিয়া বলিল,—"আমায় কোন রকম একটা চাকরীর জোগাড় করে দিতে পার না ভাই—"

মাধবী কহিল, "এই সেদিন পর্য্যন্ত আপনি রাজার মেয়ে ছিলেন,

ইচ্ছে করলেই এখনই রাজরাণী হতে পারেন, আপনি চাকরী করবেন ?"

আরতি নতনেত্রে কহিল, "কি ছিলুম, কি হতে পারি তা মনে করলে ত আর পেট ভরে না মাধবী দিদি! তোমার উপর এত বড় সংসার পড়লো, আবার আমরা দু'জন শুদ্ধ তো আর চেপে বসতে পারিনে,—"

বাধা দিয়া মাধবী কহিল, "অমন কথা বলবেন না দিদিমণি। দু'দিন যদি আমার এই কুঁড়েয় আপনারা দু'টীতে থাকেন, তাতে আমি মারা যাব না; আর ভাইও তো চাকরী খুঁজচে, যা হয় একটা পাবেই। যদি আমাদের জোটে আপনারও দু'মুঠো জুটবে। তবে আমার মনে হয়, উপায় থাকতে কেনই বা এত দুর্দ্দশা ভোগ করবেন; এত কষ্ট কি আপনাদের সুখী শরীরে বরদাস্ত হবে ?—"

আরতি সজল চোখে অথচ কষ্টে আহরিত ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রত্যুত্তর করিল, "খুব সইবে মাধবী দিদি! যখন এত সয়েছে তখন এই সামান্য খাওয়া পরার কষ্টটুকু আর সইবে না!"

কিন্তু চিরদিনের সংস্কারকে জয় করা বড় সহজ নয়। আরতি মুখে যাই বলুক, মনের মধ্যে সে প্রতি পদেই অভাব ও দৈন্য অনুভব খুবই করিতে লাগিল। বিশেষতঃ মঞ্জুর জন্য। মঞ্জুর তো কথাই নাই! তার উপর আর একটা বিষয়ে সে পদে পদেই কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল,—তাদের জন্য এই পরিবারের সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত পরিচর্য্যার ভাব দেখিয়া,—তাদের কাছে এদের সাধ্যাতীত সেবায়োজন পাইয়া। যে আত্মসম্মান রক্ষার্থ সে অত বড় স্বার্থত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই যদি না বজায় রহিল, তবে আর তার ত্যাগের মূল্য রহিল কই ?

অনেক চেষ্টা যত্নে আরতির একটা কাজ জুটিল। কাশীর বাঙ্গালী-

টোলায় কয়েকটী মহিলাশ্রম আছে, ইহার একটী হিন্দু অনাথা মহিলা শিল্পাশ্রমের শিল্প-বিভাগে সে সেলাই শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হইল। মাহিনা কিন্তু এতই কম যে, সে কথা শুনিয়া প্রথমে আরতির ঠোঁটে ঈষৎ হাসি দেখা দিলেও শেষটায় তার চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। আরতির গবর্ণেসের মাহিনা ছিল দেড়শো টাকা। সে বেচারী হয় ত স্বপ্নেও জানিতে পারিল না যে, তার কাছে শেখা তারই একটী ছাত্রী ১০৲ টাকা মাহিনায় একটী দৈন্যগ্রস্ত আশ্রমের দীনহীনা মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইল!

আরতি এ ছাড়াও রাত জাগিয়া রেশমের, পশমের ও পুঁতির কাজ তৈরি করিয়া আশ্রমের কর্ত্রীর হাতে বিক্রির জন্য দিতে লাগিল। এ কার্য্যে তার পরিশ্রমের উপযুক্ত লাভ কিন্তু হইল না। লোকে, বিশেষতঃ আমাদের দেশের লোকে বাজারে কেনা জিনিস বেশী দামে লওয়া সহ্য করিতে পারে, কিন্তু গৃহস্থ-কন্যার হাতে তৈরি যাচিয়া-পাওয়া জিনিস হাজার ভাল হইলেও 'গরজ' বুঝিয়া পয়সা দিয়া লইতে নারাজ হয়। দাম লইয়া একান্ত অভদ্রের মতই কষাকষি করিতেও তাদের বাধে না, নগদ দাম দিতেও ইচ্ছা হয় না,—খুব শস্তা পাইতেই মন চায়। কাজেই খরচ ও শ্রমের যোগ্য দাম ওঠে না।

তবুও আরতি নিজের দিকে না চাহিয়াই প্রাণপণ যত্নে রাতদিন খাটিয়া এদিক দিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল। নিজের কষ্ট ক্রমেই তার সহিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মঞ্জুর কষ্ট সে কিছুতেই সহিতে পারিতেছিল না। যে ছেলে লক্ষপতি 'হা পুত্রে'র ঘরের দুলাল-রূপে আসিয়াছিল, সে আজ ভিখারীর মতই দুঃখ দৈন্যের অকরুণ চক্রতলে এই যে নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল, এ কি দেখা যায়?

ভাল স্যুটের জন্য সে নিত্য বায়না ধরে, সকালে বাসি রুটী ও ফিকা

চা পাতে পড়িলে, চা বিস্কুট, চকোলেট কেক, রসগোল্লা সন্দেশ ও স্যাণ্ডউইচের জন্য হাঙ্গামা করে, ভাতের সঙ্গে মাংস মাছ ডিমের অভাব তাহাকে দিনের পর দিনই উপবাসী রাখিয়া দেয়, আরতির চোখের মধ্যে শুষ্ক অশ্রু আগুনের দাহ আনিয়া দেয়। এক এক দিন তার এ যন্ত্রণা এতই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল যে, সলিলকে পত্র লেখার কথাও এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হইতে লাগিল। নিজের কষ্ট সে হাসিমুখে সহিতে পারে, কিন্তু মঞ্জুর দুঃখ তার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া উঠিতেছিল। দিন দিন বালক দুর্ব্বল কৃশ অস্থিসার হইয়া পড়িতেছে, নিত্য তার সর্দ্দি কাশি জ্বর পেটের অসুখ লাগিয়াই আছে, অমন সুন্দর পুষ্ট নধর কান্তি তার ছায়ামাত্র অবশেষ হইয়াছে। এমন করিয়া সে কি বাঁচিবে?

সলিলকে সেদিন সে সহজ অহঙ্কারেই বিদায় দিয়াছিল, কিন্তু এইবার সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে দেখিল, মঞ্জুর দিকে চাহিলেই চোখে তার জল ঠেলিয়া আসে। চোখের জল ফেলা তার স্বভাব নয়, সহজে সে ফেলেও না, কিন্তু এ অশ্রুকে আটকাইয়া রাখা দিনে দিনেই তার কঠিন বোধ হইতে লাগিল।

এই জীবন যেন সংগ্রামক্ষেত্র! এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারা কি কঠিন!—ওঃ কি কঠিন! সে কি তা পারিবে! অথবা এইখানেই তার সব শেষ?

হ্যাঁ সব শেষ! জয়ী হওয়ার আশা তার যেন দিনে দিনেই শেষ হইয়া আসিতেছে। নিজের দুঃখ তার যত অসহ্যই হোক, সে সহিতে প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু মঞ্জু—তার বাপ যে তারই উপর নির্ভর করিয়া মঞ্জুকে ফেলিয়া গিয়াছেন, সে মঞ্জুকে যদি সে না বাঁচাইতে পারে?

আরতি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও একান্ত অসহায় বোধ করিতে

লাগিল। নিজের উপর একবিন্দু বিশ্বাস আর তার রহিল না। এই মানসিক বিপ্লবের মধ্যে আত্মনির্ভরতা তার যেন সম্পূর্ণ-ই ফুরাইয়া গিয়া একটা সুগভীর আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল। কেন সে সলিলের সঙ্গে গেল না! যত বড় অপমান উহাতে নিহিত থাক, মঞ্জু তো ভাল থাকিত।

অবশেষে হৃতস্বাস্থ্য ভগ্নচিত্ত বালক কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইল। আরতির প্রাণ উড়িয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, সিরিয়স টাইপের টাইফয়েড!

যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাহাকে বলে ঠিক তেমনই করিয়া শুধু অক্লান্ত সেবা দিয়া আর নিজেকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অবশেষে চল্লিশ দিনের চেষ্টায় মাধবীই তাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। আরতি শুধু কাঠের পুতুলের মত মাধবীর নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিয়াই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত রোগীর শিয়রে বসিয়া কাটাইল। তার মধ্যে এমন শক্তি ছিল না যে, সে এতবড় বিপদে নিজের মাথা, বুদ্ধির কোনই ব্যবহার করিতে পারে। শেষ যেদিন ডাক্তার মঞ্জুকে 'আউট অব ডেন্‌জার' বলিয়া মত দিলেন, সেইদিন আরতির চাপা দেওয়া জ্বর প্রবল মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকটিত হইল,—সে বিছানা লইল। তিন দিনের দিন তার রোগ ভীষণতর হইয়া উঠিল। একসঙ্গে এতবড় দুইটী রোগী লইয়া মাধবী যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল।

মঞ্জুর রোগ এখন আরোগ্যের পথ ধরিয়াছে, সর্ব্বদা তাকে সযত্নে ও সাবধানে দেখা শুনা, ঔষধ-পথ্য দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। কঠিন রোগের সহিত প্রাণান্ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্ষুদ্র বালকের ক্ষীণ প্রাণ একেবারেই ক্লান্তির চরমে পৌঁছিয়াছে। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের রৌদ্র-ঝলসিত চারা গাছটীর মতই তাহাকে ছায়ায় ঢাকিয়া অল্প অল্প জল

সিঞ্চনে কোনমতে জীয়াইতে হইবে। আর ঠিক এই সময়েই আবার এতবড় আর একটা কাণ্ড! তার উপর মঞ্জুর এখন ঠিক অজ্ঞান বা সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থাও নয়, আবদার কান্নার তার যেন শেষ নাই। তার পর আবার কাঁদিতে গেলেই তার বিষম লাগে, কাশি আসে, চোখ কপালে উঠিয়া যায়।

মাধবী মহা বিপদে পড়িয়া প্রমাদ গণিল। অবস্থা তার সামান্য, ডাক খুব বেশী আসে না; যা' আসে তা'তে কোনগতিকে দিনপাত হয়। সেই অবস্থায় এই সব ব্যাপারে তার ক্রমাগতই ডাক ছাড়িয়া দিতে হইতে লাগিল। সংসার চলা, রোগের খরচ দুই-ই অচল হইয়া উঠিল। ডাক্তারটী ডাক্তারের বাড়ী হিসাবে ভিজিট না লইয়া দেখিতেছিলেন, তবে বিনা ভিজিটে উপর্য্যুপরি দু'টী বড় রোগী দেখায় ধৈর্য্য অটুট থাকা কঠিন, একটু ঢিলাঢিলি পড়েই, কিন্তু ওষুধ-পথ্য এসব তো আর বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। দিনে দিনে অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসির বিলের অঙ্ক মোটা হইতে মোটা হইতেই থাকিল।

মাধবীর শরীরও কষ্টে পরিশ্রমে ও দুর্ভাবনায় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম করিল। সে যে কেমন করিয়া কি করিবে, তার কোন ঠিকানাই করিতে পারিল না।

অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আরতির কাকাকে এবং সলিলকে দুইখানা তার দিল। সলিলের ঠিকানা সে তাহারই মুখে শুনিয়া জানিয়াছিল।

হৈমন্তিক মধ্যাহ্নে চারিদিক সুপ্রসন্ন, অপ্রসন্ন শুধু একমাত্র সলিলের মুখখানা। উজ্জ্বল রোদ্রে গা মেলিয়া দিয়া পশু-পক্ষী, এমন কি, সমস্ত-উদ্ভিদ-জগৎটা শুদ্ধ যেন নিশ্চিন্ত আরামে নাতিশীতোষ্ণ দিনটাকে অন্তর দিয়া উপভোগ করিতেছিল। বড় বড় গাছগুলা ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের কিরণোজ্জ্বল মৃদু সঞ্চরমান মেঘগুলাকে দেখিতেছে। তাদের পায়ের কাছে তাদেরি দীর্ঘ দেহের অনতিদীর্ঘ ছায়া, আর তারই মধ্যে লম্বা চৌকা, গোল, বাদামী, ত্রিভুজ ইত্যাদি নানা আকারের জমিতে লাল নীল হলদে শাদা পাটকিলা এই সব এবং আরও অনেক রকম মিশ্র রঙ্গের রংবাহারে শীতের মরসুমি ফুল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাদের কোনটার গড়ন প্রজাপতির মতন, কোনটার নক্ষত্রের আকার, আবার কেহ কৃত্রিম মোমের ও সোলার ফুলের মতই হাল্কা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সলিল গভীর নৈরাশ্য ভরা এবং একান্তরূপে ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া বাগানের বুকচেরা সরল দেবদারুর অনিবিড় ছায়াচ্ছন্ন পথটার উপর দিয়া অন্যমনস্ক ভাবে অনবরত যাওয়া আসা করিতে লাগিল। তার মনের মধ্যটা যে কতটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তার এই চিন্তাচ্ছন্ন বিহ্বল মূর্ত্তিটাই তার সর্ব্ব প্রধান সাক্ষী স্বরূপ হইয়া রহিয়াছিল।

আমরা যাহাকে চাই তাহাকে পাইবার আগেই নিজে তার কাছে ধরা দিয়া ফেলি,—সে আমার না হইতে আমি তার হইয়া যাই। তাই যখন জানিতে পারি যে, সে আমার এই দুর্ব্বলতার ফাঁক পাইয়া আমায় ফাঁকি দিয়াছে,—আমাকে সে ত কিছুই দেয় নাই, এমন কি, আমার দান-গুলাকেও সে কোন দিনই হয় ত তুলিয়া লইয়াও তাদের সার্থকতা দেয়

নাই,—তখন সব চেয়ে বেশি করিয়া আমরা বিস্মিত হই যে, এত বড় ফাঁকিটা কেমন করিয়াই আমাদের চোখ এড়াইয়া গেছে!

সলিল অনেকবার বারে বারেই এই কথাটা মনে করিয়াছে। আরতি তাকে হয় ত কোন দিনই ভালবাসে নাই। যে সব কথা সে শুনিয়াছিল, সে সকল হয় ত তার দিদিরই মনের কল্পনা মাত্র! সম্ভব,—তাই সম্ভব, খুবই এটা সম্ভব বটে! সুন্দরা আরতিকে নিজে ভালবাসিয়াছিল, সেই ভালবাসার চক্ষে সে তার সবই ভাল দেখিয়াছিল,—ভাল দেখিতে চাহিয়াছিল। আসলে সত্য সত্যই সে অত ভাল নয়। না নিশ্চয়ই না,—ভাল যদি হইত, সলিলকে ভাল যদি সে সত্যই বাসিত, এত বড় দুঃখ তাহাকে সে দিতে পারিত না। নিজেকে এমন করিয়া বিপদ-সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া তার উপরে প্রতিশোধ তুলিতে পারিত না। কখনও পারিত না। সে কি বুঝিতে পারিল না যে, কতবড় প্রচণ্ড আঘাত সে তাহাকে দিল?

সলিল একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। এই জন্যই পুরাণ-কালের শাস্ত্রবিধিতে নারীর স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ! আরতি এর আগের দিনের মেয়ে হইলে এমন করিয়া স্বাতন্ত্রিকতার ভরসা করিত না,—সে আর একটুখানি সেকেলে হইলে নিশ্চয়ই তার বাপের বাগ্‌দানকে গ্রাহ্য করিয়া নিজেকে সলিলেরই স্ত্রী মনে করিত। সলিলকে সে কোনমতেই ত্যাগ করিবার কথা ভাবিতে পারিত না। হায় রে সেকাল! সলিল ও আরতি যদি সেকালের মানুষ হইত!

সাইকেলে চড়িয়া লাল-পাগড়ী-বাঁধা একটা টেলিগ্রাফ পিওন গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ভ্রাম্যমান গৃহস্বামীকে দেখিতে পাইয়া, সে কাছে আসিয়া, তার হাতে একখানা টেলিগ্রামের খাম দিয়া, রসিদ সই করার জন্য পেন্‌সিল বাহির করিল।

সই দিয়া খাম ছিঁড়িয়া সলিল টেলিগ্রামে যে খবর পাইল, তাহা এই—

আরতি এবং মঞ্জু এক সঙ্গে কঠিন টাইফয়েডে শয্যাগত, জীবনের আশা কম, যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার আসেন।

তলায় মাধবী মুস্তোফির নাম ঠিকানা দেওয়া ছিল।

সলিলের সমুদায় চিন্তাধারা এক মুহূর্ত্তেই যেন তাদের গতিপথ বদলাইয়া ফেলিয়া ভিন্নমুখী হইয়া দাঁড়াইল। আরতি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী! জীবনের আশা তার কম! হয় ত সেই তাকে মাধবীর মধ্য দিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছে! আরতি! আরতি! সেই যদি ডাকিলে দু'দিন আগে কেন ডাকিলে না? এখন কি এই ক্ষীণআশাময় জীবনের সন্ধিক্ষণে—না না এখনও হয় ত সময় আছে, এখনও হয় ত সলিল তাকে প্রাণপণ যত্নে সেবায় সাহচর্য্যে বাঁচাইয়া জীয়াইয়া তুলিতে পারিবে! হ্যাঁ পারিবে বই কি! নিশ্চয় পারিবে। যদি না পারে, তার এই বুকভরা প্রাণঢালা অকৃত্রিম প্রেমই মিথ্যা!—

মাকে গিয়া বলিল, "বিশেষ দরকারে পশ্চিমে একবার যেতে হচ্ছে, আজই বেরুতে হবে। ফিরতে হয় ত দিন পনের হ'তে পারে।"

কোথায় এবং কেন, এই দু'টি অবশ্য-জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন মাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, ছেলেও বলিল না; কিন্তু এই না বলা ও না বলানর মধ্যেকার অপরাধ ও অপমান দু'জনকেই সমান করিয়া পীড়ন করিল। এর আগে কোন দিনই তাদের মাতাপুত্রের মধ্যে অতি তুচ্ছ কথারও একটা আড়াল ছিল না, আর আজ এত বড় ব্যবধানের সৃষ্টি বেশ সহজেই হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, এ দেখিয়া দু'জনেই মনের মধ্যে সমান ভাবেই বিস্ময় এবং বেদনা বোধ করিলেও, একজনও ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা বা যত্ন করিল না। সলিল নিজের মনের অশান্তিতে মুহূর্ত্ত পরেই

সে ভাবনা ভুলিয়া গেল, আর মহামায়া নিবিড় অভিমানে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিলেন।

সলিল যখন মাধবীর ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল, আরতির তখন মানুষ চেনার শক্তি লোপ পাইয়াছে। প্রবল জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন অর্দ্ধ-চেতনবৎ থাকিয়া সে অনর্গল প্রলাপ বকিতেছিল। চোখ দু'টী তার তন্দ্রাচ্ছন্নের মত আধখোলা আধবোজা হইয়া আছে। কখনও কখনও সে তার মাতালের মত ঘোলা ও রাঙ্গা চোখ খুলিয়া ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে খুঁজিতেছিল। মধ্যে মধ্যে সেই সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল,—

"ও বাবা! এ কি ঠাণ্ডা হয়ে গ্যাছো! বাবা! বাবা! এ কি করে গেলে?"

কখনও চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—"মঞ্জু! মঞ্জু! তুইও আমায় ফেলে চলে গেলি! তোকে যে বাবা আমার হাতে দিয়ে গেছলেন, আমি তো রাখতে পারলুম না!"

কখনও আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে থাকে—"ওরে আমার মাণিক! ওরে আমার সোনা! কত দুঃখ পেয়েই যে তুই চলে যাচ্ছিস্! আমি এম্‌নই অভাগী দিদি তোর, তোকে শুধু দুঃখ সইতে দিয়ে মেরে ফেল্লুম! আমি কি করে মরবো গো! মঞ্জুর আগে আমি কি করে মরবো!"

সলিল আড়ষ্ট কাঠের মত বসিয়া আরতির মাথায় আইসব্যাগ ধরিয়া থাকিয়া স্পন্দিত বেদনায় স্তব্ধ হইয়া তার এই বিলাপময় প্রলাপ শুনিত; আর তার চোখ দিয়া আপনা হইতেই হুহু করিয়া জল পড়িতে থাকিত। মাথা তার এক দণ্ড বালিসে থাকে না, অস্থির চাঞ্চল্যে সমস্ত দেহ ক্ষণে ক্ষণে আকুঞ্চিত, ক্ষণে ক্ষণে প্রসারিত হইতে থাকে। সমস্তক্ষণ সে কখনও কাঁদে, কখনও বকে। স্থির এক দণ্ডও হয় না।

মধ্যে মধ্যে আপন মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে আরতি যখন গান গায়, সলিলের বুকের মধ্যে যন্ত্রণার আঘাত যেন তার সঙ্গে তাল বাজায়। সে গান কি? সেই মুসুরির বড় সুখের দিনেরই সেই পূর্ব্বশ্রুত সঙ্গীত!

"বঁধু হে! ধর হে পর হে—" "এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার"—আবার কখনও বলে—"দিয়ে ত ছিলেম, আজও তো দিয়েই রেখেছি আমি,—তুমিই তো নিতে পারলে না, আমার কি দোষ! না না,—সে হবে না। সে আমি পারবো না, ওঃ মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, তাঁর অভিশাপ মাথায় করে, অসম্ভব! কাঙ্গালই হয়েছি, ইতর তো হই নি!"

আবার সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, "কিন্তু তাহলে মঞ্জুকে আমি বাঁচাবো কেমন করে? তাঁকে দুঃখ দিয়ে বিদায় দিয়েছি, তাই বুঝি ভগবান আমায় তার শোধ দিচ্চেন? ওগো তুমি ফিরে এস, আমি কি ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে যাই নি? আমার কি তোমায় ত্যাগ করতে বুক ভেঙ্গে যায় নি? শুধু তোমার জন্যেই তোমায় ছেড়েছি যে।"

সলিলের আর সহ্য করার শক্তি রহিল না, সে তার হাতের বরফ-ভরা থলিটা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে রোগিনীর প্রবল-জ্বরোত্তপ্ত শীর্ণ হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া গভীর স্বরে কহিয়া উঠিল—"আরতি! আরতি! এই যে আমি এসেছি,—তুমি আমায় ত্যাগ করলেও আমি করিনি.—তুমি ভাল হয়ে ওঠো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আরতি ঈষৎ যেন বুঝিল। সে তার আচ্ছন্ন অলস নেত্র মেলিয়া বারেক পূর্ণ চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিল। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া তার পর ঈষৎ শান্ত প্রসন্ন ভাবে মৃদু হাসিয়া আত্মগতই কহিল,—

"স্বপন তো ক্রমাগতই দেখি,—কিন্তু যখনই দেখি, সেই কাতর করুণ মুখই দেখতে পাই,—দেখে এত কষ্ট হয়,—আজ কিন্তু সে রকম নয়।"

সলিল ব্যগ্র হইয়া কহিল,—"স্বপ্ন নয় আরতি, আমি সলিল,—আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি,—আমায় চিনতে পারচো না ?"

আরতি অবাক্ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া মৃহু মৃহু হাসিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "চিনতে পেরেচি বই কি,—তুমি তো মিঃ সেন নও,—মিঃ গুপ্ত,—তুমিই তো সেদিন রাত্রে সেই গানটা গাইছিলে না ?—'I love you love you dear Fanny. Fanny না আরও কেউ!—সে যে কার উদ্দেশে গান, সে না কি আর আমি বুঝতে পারিনি ?"

উচ্ছ্বসিত আবেগে এবার তু'খানি হাত তু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া সলিল রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সবই যদি বুঝে থাক, তবে জেনে বুঝে অনর্থক কেন এত দুঃখ দিলে, কেন এত দুঃখ পেলে আরতি ? যাক্, যা হ'বার হয়ে গ্যাছে,—এবার ভাল হয়ে আর আমায় তাড়িয়ে দিও না।"

আরতি আবার বাঁচিয়া উঠিবার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। সলিলের চেষ্টা যত্ন, অকাতর সেবা ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইল না। শ্রমক্লান্ত মাধবীকে সে অনেকখানিই বিশ্রাম দিয়া তু'জন সুশিক্ষিতা নার্স রাখিল,—নিজেও তার যথাসাধ্য রোগশয্যার সান্নিধ্য ত্যাগ করিত না। ডাক্তার ও ঔষধ পথ্যের কোনই অপ্রতুলতা সে রাখিতে দেয় নাই। গরীব মাধবীর গৃহে লক্ষপতি সলিলকুমারের ভাবী পত্নীর উপযুক্ত ভাবেই সেবা ও চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

আরতির রোগ আরোগ্যের দিকে ফিরিল বটে, কিন্তু তার মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় তার বুদ্ধি বৃত্তি বেশ সতেজ হইতে যথেষ্ট সময় লাগিতে লাগিল। ডাক্তারেরা ভয় করিতে লাগিলেন, হয় ত উন্মাদ না হইলেও তার মাথার দোষ একটু থাকিয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, যদি না এই সময় হইতে তাকে খুব বেশি স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া খুব বেশি সেবা-যত্ন এবং বিশ্রাম দেওয়া হয়।

সলিল মাধবীকে গিয়া ধরিল, বলিল, "আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে,—আমি মনে করচি আসানপুরে গঙ্গার উপর আমাদের যে বাংলোখানা আছে, তাইতেই আমি দিনকতক আরতিকে নিয়ে থাকবো। সেখানে শীতের সময় স্বাস্থ্যও খুব ভাল হবে, আর নির্জ্জনও খুব—বিশ্রামেরও কোনরূপ ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু আপনি না গেলে মঞ্জুকে কে দেখবে বলুন ?"

মাধবী এ প্রস্তাব অনুমোদন করিল না, সে কহিল,—"মঞ্জু একেই দুর্দ্দান্ত, তার উপর অসুখ থেকে উঠে দেখছেন ত কি রকম কাঁদুনে আর আবদারে হয়ে উঠেছে! ওকে সঙ্গে রাখলে আরতিদিদিকে সারিয়ে তোলা অসম্ভব। ও বরং আমার কাছে এখানেই থাকুক, আপনারা যান।"

সলিল হিসাব করিয়া দেখিল, মাধবীর কথা যুক্তিসিদ্ধ বটে। মঞ্জুর হাঙ্গামা আরতি একটু ভাল থাকিলে তার উপর গিয়া পড়িবেই ; অথচ ডাক্তারের মতে তার জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মঞ্জুকে তার সঙ্গে না লওয়াই সঙ্গত। অথচ এদিকে মঞ্জুর দিকে দেখিতে গেলে তার পক্ষেও মাধবীর এই অস্বাস্থ্যকর গৃহ এবং সামান্য ভাবে থাকায় তার হৃত স্বাস্থ্যোদ্ধার হওয়া অসম্ভব। ভালরূপ দেখাশোনার অভাবে এখনও সে মোটেই সারিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ঘা, কাল ফোড়া, পরশু পেটের অসুখ, সর্দ্দি কাশি জ্বর তার রোজই লাগিয়া আছে। সর্ব্বদা খাই খাই করিয়া সকলকে অস্থির করে, বকুনি খায়, কাঁদিয়া চেঁচাইয়া অস্থির হয়। সলিলের করুণ চিত্ত বেদনায় টন টন করিতে থাকে। আহা, সেই আদরের দুলাল, ধনীর কুমার, স্নেহের পুতুল!

এমন সময় সুন্দরার পত্র আসিয়া তাহাকে উভয় সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া বাঁচাইল।

সুন্দরা লিখিয়াছিল,—

"সব জানিলাম। আরতির সম্বন্ধে আমার কোন সাহায্য করার উপায় নেই, সে তো তুমিও জানো? তার কোন খবর আমায় দিও না ভাই লক্ষ্মীটী! তবে মঞ্জুর বিষয়ে আমি স্থির করেছি যে, যদি তুমি দরকার মনে করো, তাকে আমার কাছে কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে আমি তার বরাবরেরই সমস্ত ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। আমি মনে করবো আমারই সে পেটের ছেলে।"

শুনিয়া মাধবীও খুসী হইল। সে বলিল, "তাহলে সেই ভাল, একসঙ্গেই আমরা যাই চলুন, আমি বরং মঞ্জুকে দিদির কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবো, আর আপনারা সেখানে যাবেন।"

সলিলের অনেক অনুনয়েও মাধবী কিছু দিনের জন্য তাদের সঙ্গে থাকিতে সম্মত হইল না! থাকিলে তার চলিবে না, ভ্রাতৃজায়া আসন্নপ্রসবা, তা'ছাড়া পেসেণ্টরাও বিরক্ত হইবে। এ ছাড়া মাধবীর মনে আরও একটা ভয় ছিল—সেটা এই যে, তাহাকে সঙ্গে পাইলে নির্ব্বোধ আরতি হয় ত আবারও কি করিতে কি করিয়া বসিবে, তার চেয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে সলিলের হাতে ফেলিয়া দেওয়াই সঙ্গত। সলিলের চরিত্র ও আচার দেখিয়া তার সম্বন্ধে মাধবীর খুব বেশি উচ্চ ধারণাই জন্মিয়াছিল। তাই তাহার সঙ্গে আরতিকে একা পাঠাইতে সে দ্বিধামাত্র করিল না।

অনেক দিনের পুরানো, কিন্তু সুসংস্কৃত পরিচ্ছন্ন বাংলোখানির অনতি-দূরে গঙ্গার বালুময় তীরভূমি রূপার পাতের মতই ঝকঝক করিতেছে। সলিলের পিতামহের আমলে যখন দার্জ্জিলিং, সিমলা, জাপান, জার্ম্মানী বা ইংলণ্ডে এ দেশের ধনীকুলের হাওয়া খাইবার আস্তানা হইয়া উঠে নাই, তখন গঙ্গাতীরের এই সকল স্থানেই ধনীরা তাঁদের এক একটী বাগানবাড়ী তৈরী করিয়া রাখিতেন। কখন কখন সপরিবারে, কদাচ বা একা একা দু এক মাস এই সকল স্থানে থাকিয়া তাঁরা হাওয়া বদলাইয়া যাইতেন। রেলপথ যখন হয় নাই, এবং হওয়ার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত, তাঁরা ট্রেনের পরিবর্ত্তে বজরা করিয়া জলপথেই প্রায় এ সব দিকে গমনাগমন করিতেন। নৌবিহারটাই তখনকার দিনের বিলাসী বড় লোকদের একটা প্রধানতম বিলাস ছিল। এর জন্য অবস্থা এবং রুচি অনুযায়ী মস্ত বড় বড় বজরা এবং তার সাজসজ্জারও তারতম্য হইত। দেবী চৌধুরাণীর বজরার সাজের কথা স্মরণ করিলেই এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাইবে। সেটা একেবারেই নিছক কল্পনা নয়।

আরতিকে লইয়া সলিল এইখানে আসিয়াই আশ্রয় লইল। সঙ্গে আসিল মাধবীর দেওয়া নূতন ঝি রজনী। এখানে আসিয়া স্থানীয় ডাক্তারের সাহায্যে সলিল সদর হইতে দিন পনেরর জন্য একটী নার্স আনাইয়া লইল। এমনই করিয়া তাদের ঘরকরণা আরম্ভ হইল।

অবস্থায় একজন মানুষই কত রকম হইয়া দাঁড়ায়। কাল যে রাজ্যেশ্বর রাজা ছিল, দশজনকে প্রসাদ, পুরস্কার বিতরণ করিয়া ধন্য করিয়াছে, আজ যদি পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সেই আবার অন্যে

দ্বারে আঁচল পাতিয়া ভিক্ষার মুষ্টি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। কাল যে উগ্রমূর্ত্তি বিচারক বিচার-আসনে বসিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অপরাধীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করিয়াছিল, কাল সেই যদি অপরাধীর কাঠরায় শৃঙ্খল পরিয়া দাঁড়ায়, সেও তখন তেমনই করিয়াই বিচার-দৃষ্টির তলায় নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া কম্পিত হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ মানুষ তার অবস্থা এবং ভাগ্যের হস্তেই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে, সে তাকে যেমন করিয়া যে দিন গড়ে সেই মতই সে গঠিত হয়।

আরতির উপর দিয়া শোক ও রোগের যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাকে যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। এখানের নূতন আশ্রয়ে সলিলের যত্নের প্রচুরতায় সে আবার ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু তার যে সুখ-সৌভাগ্যের দিন চির-অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল, তার সেদিনকার প্রকৃতিকে এত ভোগ-সুখের মধ্যেও আর সে ফিরাইয়া পাইল না। তার দুর্ব্বল দেহ অতি ধীরে যেন মৃদু কুণ্ঠিত অনিচ্ছায় তার হৃত স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে লাগিল, কিন্তু ভাঙ্গা মনকে যেন কিছুতেই আর সে জোড়া লাগাইতে পারিল না। সলিলের সকল চেষ্টা ও যত্ন সেখানে ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

মঞ্জুর কথা আরতি মুখে কিছুই বলে নাই, মনের মধ্যে কিন্তু তাহারই কথায় তার বুক ভরিয়া রহিয়াছিল। মঞ্জুকে যে সুন্দরার আশ্রয়ে রাখা হইয়াছিল, সে কথা সে জানিত না। সলিল সে কথা তাহাকে বলে নাই, কেন বলে নাই বলা যায় না। হয় ত বলিতে তার মনে পড়ে নাই, না হয় ত মঞ্জুর সম্বন্ধে আরতিকে আপনা হইতে কোন কথাই উত্থাপন করিতে না দেখিয়া এ সম্বন্ধে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কথা কহিতে তার ভরসা হয় নাই। কে জানে, যদি তার ফলে মঞ্জুর কথা স্মরণে আসিয়া আরতির দুর্ব্বল শরীর মনে চাঞ্চল্যের আবেগ কুফল ফলাইয়া তোলে। তার চেয়ে সে

যখন নিজ হইতে নীরব আছে তখন সে সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকাই ভাল।

আরতি কিন্তু ভুল বুঝিল! সে দেখিল, সলিল তার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, তার স্বাস্থ্য, তার স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে অব্যাহত হয়, তার জন্য তার অর্থ ব্যয় এবং চেষ্টার এক বিন্দু ত্রুটী নাই; কিন্তু তার সেই অসহায় অনাথ ভাইটীকেও সে কি এই সঙ্গে আনিয়া এর মধ্য হইতে একটী বিন্দু অংশ দিলেও দিতে পারিত না? যখন এখানে তাহাকে আনা হয়, তার মাথার ঠিক ছিল না। তা যদি থাকিত, নিশ্চয়ই সে এমন অবিচারের দান গ্রহণ করিত না,—তার দুঃখী ভাইটীকে বুকে চাপিয়া সেইখানের মাটী কামড়াইয়াই পড়িয়া থাকিত। আহা, অত বড় রোগের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়া, এই যে তাকে তার একটী মাত্র আপনার জন হইতেও বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, এর নাম কি সুবিচার? একদিন এই সলিলই না বলিয়াছিল, মঞ্জুকে সে নিজের ছোট ভাইয়ের মতই আদর করিয়া গ্রহণ করিবে? এই বুঝি পণরক্ষা? উঃ! মানুষ এতবড় স্বার্থপর! এই ভাবিয়া আরতি গভীর অভিমানের আগুনে নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া একটী কথাও সে বলিল না। কেবল তার বুকখানা তার জগতের এই একটীমাত্র প্রিয়তমকে হারাইয়া সেই বিচ্ছেদের দহনে ভস্ম হইয়া যাইতে লাগিল এবং সলিলের এত যত্ন, স্নেহ, আত্মত্যাগ সব কিছুকেই সেই দহনজ্বালার ইন্ধন স্বরূপ গ্রহণ করিতে থাকিয়া তার মনের মধ্যে বিরাগের আগুনকে প্রবলতর করিয়া তুলিল। সলিল কিন্তু তার এ মনোভাবের কিছুই জানিল না। সে শুধু অনুভব করিল, যে দৈব দুর্ব্বিপাক আরতির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, আরতি আজও তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। গভীর বিষাদের কালিমায় তার ললাট আজও মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই রহিয়াছে। তার এত স্নেহ, এই

অক্লান্ত পরিচর্য্যা, অপরিসীম আত্মত্যাগ কিছুই যেন তার সেই মেঘবাষ্পাচ্ছন্ন চিত্তদ্বারে পৌঁছিতেই পারিতেছে না।

সেও তাই বড় সন্তর্পণে অতি সাবধানে আত্মসংযত হইয়া, যথাসাধ্য দূরে দূরেই রহিল। ঘুণাক্ষরেও সে তাঁর অতুল ভালবাসার কথা, তার নিত্য-প্রতীক্ষিত আশাময় ভবিষ্যতের কথা কিছুই তার কানের কাছে তুলিয়া ধরিল না, পাছে সে মনে করে, তার এই শোক ও রোগের আক্রমণের আঘাত না সারিতেই স্বার্থপর পুরুষ তাহাকে নিজের আয়ত্তগত করিয়া ফেলিতে চায়। তাই সে বিপুল বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়া নীরব ধৈর্য্যে শুধু সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকিল।

কিন্তু ইহারও ফল হয় ত ঠিক ভাল ফলিল না। রোগের ফলে এবং রোগজাত দুর্ব্বলতায় আরতির মস্তিষ্ক-শক্তিও যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যে ভাবটা তার মনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেটা সেখানে স্থায়ী হইয়া পড়ে। সহসা তার মনে হইল, সলিল কি তবে তাকে নিজের আয়ত্তগত দেখিয়া তার সম্বন্ধে পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে? অসম্ভবই বা কি? মায়ের অনিচ্ছায় তাকে বিবাহ করা তার পক্ষে যখন একপ্রকার অসম্ভবই, তখন অন্যপ্রকারে তাহাকে লাভ করিতে পারিলে সে কেন করিবে না! তার উপরে একটা মোহের ভাব যে তার ছিল সেটা তো নিশ্চিতই; এবং এখনও সে ভাবটা যে যায় নাই, তাহা তার সকল ব্যবহারেই পরিস্ফুট হইতেছে।

এই চিন্তাটা মনে আসিতেই আরতির সমস্ত অন্তঃকরণ প্রবলভাবেই সলিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সলিল যে অত হীন চক্রান্ত করিতে পারে না, এমন কথা তার একবারও মনে পড়িল না। তার রোগ-দুর্ব্বল মস্তিষ্ক একটা মিথ্যা কল্পনার বশে তার সমস্ত সুভদ্র আচরণেরই একটা অভদ্র কদর্থ করিতে থাকিল। তাহাকে মাধবীদের বাড়ী হইতে

লইয়া আসা, এই অপরিচিত জনবিরল বিজনালয়ে তাহাকে আনিয়া রাখা, সবার উপর মঞ্জুর সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা, এ সবকেই তার যেন একটা গূঢ় উদ্দেশ্যপূর্ণ জঘন্য অভিনয়ের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই ধারণা জন্মিতে লাগিল। মাধবীর প্রতিও তার মনে ক্ষমার লেশমাত্র রহিল না। নারী হইয়া কোন্ হিসাবে সে তার আশ্রিতা অসহায়া অর্দ্ধ-চেতনা তাহাকে এই অনাত্মীয় অনূঢ় পুরুষের হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া দিল! জগতে অর্থবলই কি তবে সত্যসত্যই প্রধান বল? এর কাছে কি মানুষের কোন মনুষ্যত্বই স্থির থাকে না? তাদের লইয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়াই মাধবী তাহাকে অর্থ বিনিময়ে সলিলের কাছে বিক্রি করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে!

সলিল তার বিরুদ্ধে আরোপিত এতবড় অকথ্য অভিযোগের কিছুই জানিল না। পাছে আরতি কোনরূপে মনে করে যে তার আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে বলিয়া সলিল এই স্বাধীনতাটুকু লইতে ভরসা করিল, তাই সে তার অন্তরের উৎসারিত অজস্র স্নেহাভিব্যক্তিকে সাবধানে নিরোধ করিয়া মাত্র স্নেহময় আত্মীয়ের মত ব্যবহারটুকুই দেখাইয়া চলিতেছিল। মনে সহস্রবারই উত্থিত হইতে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া সে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটী ইঙ্গিতও কোন দিনই প্রকাশ করে নাই, পাছে সে মনে করে তার এই শোকে-রোগে জীর্ণ দেহটাকে দখল করিবার জন্য সে লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

এমন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এবং সলিলের সেবা-যত্নের অব্যর্থ ফলে আরতি তার মানসিক নিদারুণ বিপ্লব সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। তার হৃত শক্তি, নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল, তার রক্তহীন পাণ্ডু কপোল নবীন রক্তিমায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সলিল উল্লসিত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া

দেখিল, মনে মনে জগদীশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিল। তার সকল শ্রমের, সকল সহিষ্ণুতার ফল এইবার তার করতলায়ত্ত হইতে চলিল।

প্রথম শীতের বাতাস প্রকৃতির অঙ্গে শিহরণ তুলিয়া বহিতেছিল, সুন্দর সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবস। সলিল স্থির করিল, সেই দিনই আরতির কাছে সে তাদের বিবাহের দিন স্থির করার কথাটা উত্থাপন করিয়া ফেলিবে।

আরতিকে খুঁজিতে আসিয়া সে দেখিল, আরতি তার নিজের ঘরের বিছানায় তখনও সেই অসময়ে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। সলিলের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল,—"ও কি! এমন সময় শুয়ে কেন আরতি? শরীর ভাল আছে ত?"

আরতি মুখ তুলিল না, তেমনই লুকানো-মুখে গাঢ় রুদ্ধকণ্ঠে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "হুঁ"—

"হুঁ কি আরতি? ভাল আছ? তবে এ সময় শুয়ে কেন? উঠে আসবে? বাইরের বারান্দায় একটু বেড়াবে? নদীর ধারে বেড়াতে যাবে?"

আরতি বালিসের পাশে মুখখানা আর একটুখানি গুঁজিয়া দিয়া চাপাস্বরে উত্তর করিল,—"না"—

সলিল এই উত্তরে ঈষৎ দুঃখিত হইল, একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কেন আরতি? এ সময়টা বাইরের বাতাসে একটু বেড়ান ভাল ত। যদি কষ্ট বোধ না হয়, একটু উঠে এসো না,—মাথা নাড়চো, যাবে না? তুমি বড্ড কুড়ে হয়ে যাচ্চো, না সত্যি, অত আলসেমী ভাল নয়, উঠে পড়। না হ'লে আমি হাত ধরে টেনে তুলবো।"

এবার আরতি বালিসে মুখ ঘষিয়া মুখের উপরকার রোদনচিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। তারপর সবেগে তার আরক্ত মুখ তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে সলিলের মুখের দিকে তাকাইল,—"আমার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই, আমি যাবো না। আপনি যান।"

সলিল সহসা এই তীব্র ভৎ´সনায় ভৎ´সিত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর তার মনে হইল, এখনও আরতি প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। এখনও তাকে সময় দিতে হইবে, এখনও তাকে বলার সময় আসে নাই। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তখন আরতি আকুল অশান্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তার মনে হইল, সলিল তাহাকে একেবারেই আয়ত্তগত বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে। তার মা তাহাকে চাহে না, অথচ সে যে তাকে পাইতে চাহে, এ অবৈধ, এ অন্যায়,—অথচ এছাড়া তার পথই বা কই ?

নদীর ঠিক উপরেই এই বাংলো বাড়ীর একটা লম্বা টানা বারান্দায় কয়েকখানা চৌকি ও বেঞ্চি পাতা ছিল, সেদিন দুজনে পাশাপাশি সেই নদীর ধারের বারান্দাটায় আসিয়া বসিল। তখন সূর্য্যের উত্তাপ মৃদু হইয়া গিয়াছিল। ফিকা রংয়ের সবুক পাতাওয়ালা একটা গাছের ঝোপের উপর পড়িয়া আলোর রং দিয়া পাতার রং যেন বদলাইয়া গিয়াছিল। নদীর তীরে একদল পান্থপাদপের শ্রেণী সমানভাবে দাঁড়াইয়া রোমন্থনকারী গাভীগুলিকে ছায়া প্রদান করিতেছিল। নদীর নীরে বিমানচারী শুক্তি-শুভ্র মেঘপুঞ্জের ছায়া সচল রূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সলিল আসিয়া একখানা ভাল চৌকীর পিঠের কাছে একটা নরম কুশন আনিয়া দিয়া বলিল,—

"বস আরতি"—

আজ অনেক করিয়া মনঃকে সে বাঁধিয়া আনিয়াছিল,—যেমন করিয়াই হোক, নিজেদের বিষয়ে একটা কিছু আলোচনা সে আজ করিবেই। বাড়ী হইতে বৈষয়িক কর্ম্মকায সংক্রান্ত তাগিদপত্র তার কলিকাতার বাসা হইতে ঠিকানা কাটিয়া কাটিয়া বারম্বার তাহাকে তার বিস্মৃত কর্ত্তব্যের অধ্যায়কে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শেষ পত্রে কলিকাতা হইতে তার নায়েব

সরকার জানাইয়াছে, হাইকোর্টে তাদের যে মকর্দ্দমা চলিতেছিল, তার জন্য তার সেখানে পৌঁছান বিশেষ প্রয়োজন। সলিল নিজেকে বিপন্ন বোধ করিল। এদিকে মা কাশীযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, দেওয়ানের পত্রে সে খবরও নিত্য আসিতেছে। আর এমন করিয়া নীরব নিশ্চিন্তে দিন কাটাইবার অবসর সে যে পাইবে না, তাহা জানা গিয়াছে। অথচ আরতি আজও সেই যথাপূর্ব্ব, নির্লিপ্ত নীরব, শোকসংবিগ্নমানা,—এর কাছে স্বার্থ-সূচিত কোন কথা বলিতে গেলে পাছে তার আহত চিত্ত ব্যথা পায়।

বহুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল। অনেকবার অনেক রকম ভাঙ্গাগড়া, তোলাপাড়া করিয়া অবশেষে সলিল দেখিল, যাহা সে বলিবে স্থির করিয়াছিল, তাহা বলিবার সাধ্যে তার কুলাইবে না। তখন সে এই বলিয়া মন স্থির করিল যে, কলিকাতা হইতে একেবারেই বিবাহের দিন স্থির প্রভৃতি করিয়াই ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে জানাইবে। মাধবীকেও সে সেই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া সকল সংবাদ জানাইল, এবং এই মঙ্গল-কার্য্যে তাহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল।

কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে আরতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া গেল,—

"আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো, আরতি,—ফিরে এসে নিশ্চয় তোমায় আরও সুস্থ, আরও সুন্দর দেখতে পাবো।"

আরতি তাহাকে কোনই বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল না।

সেদিন অকাল-বাদলে সমস্ত প্রকৃতির মূর্ত্তিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সারাদিন প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িয়াছে,—বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তাটা জলে ডুবিয়া পাশের ড্রেনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল। জানলার উপর জলের যে ঝাপ্‌টা আসিয়া পড়িতেছিল, তার মূর্ত্তি ও বেগ ঝরণার মতই প্রবল। অপরাহ্নের দিকে বাতাসও বেশ জোর করিয়া উঠিল। সেই জোর বাতাসে বড় বড় গাছের মাথাগুলা একেবারে নত হইয়া পড়িতে লাগিল; এবং তার শাখা হইতে অজস্র কাঁচাপাকা পাতার রাশি বৃষ্টিজলের ধারার সহিত মিশিয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। সুদূর হইতে অজস্র জলের ধারা প্রাপ্তে বর্দ্ধিতকায়া এবং বায়ু তাড়িত স্রোতোহত নদীর আকুল কল্লোল শুনা যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার কাছাকাছি হাওয়া আরও জোর করিয়া রীতিমত ঝড়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। পুরাতন পত্রাবলী সবই নিঃশেষ হইয়াছিল, নূতন পত্রও প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। এবার ছোট বড় ডালগুলাকেই মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গাছের তলায় আশে পাশে স্তূপীকৃত করিল। যেগুলা ভাঙ্গিল না, তাহারা তাদের পত্রহীন অনাবৃত দেহ নাড়া দিয়া যেন পরস্পরের সহিত ঘোর যুদ্ধ বাধাইয়া রাখিল। ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে অদূর এবং সুদূর হইতে দেবায়তনের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের বাজনা বর্ষণ-মুখর ঝটিকা-গর্জ্জনের মধ্য দিয়া অর্দ্ধস্ফুট হইয়া কানে আসিতে লাগিল। নিকটস্থ মসজেদে ঝড়ের তাণ্ডব ছাপাইয়া প্রস্ফুট হইয়া উঠিল—

"আল্লাহু অক্‌বর! লা আল্লাহো ইল্লিল্লা"

গত রাত্রে সলিল চলিয়া গিয়াছে। ভোরের দিক হইতেই এই বাদল নামিয়াছে। সারারাত্রিই আরতি জাগিয়া আছে। চোখে তার ঘুমের

লেশ মাত্র নাই। ঘুমান ছাড়িয়া একবারের জন্যও সে তার জ্বালাভরা চোখ দুটাকে বুজিতে পর্য্যন্ত পারে নাই, এমনই সমস্ত শরীর এবং মন তার আলোড়িত হইতেছিল।

যতক্ষণ সলিল তার কাছে ছিল, কাছে কাছে ঘুরিত, শত অছিলায় তার এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যগ্র হইয়া ফিরিত, তখন সে বিমুখতায় তার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিত না। কিন্তু আজ যেমন সে চলিয়া গিয়াছে, আরতির রুদ্ধদ্বার চিত্ত সবেগে তার বদ্ধ দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া যেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে যে তার কতখানি, কতখানি যে এই সুযোগে তার জুড়িয়া লইয়াছে, তাহা আজই প্রথম সে ভাল করিয়া জানিতে পারিল। ঐ জানায় সে ত সুখী হইতে পারিল না, বরঞ্চ তার কুণ্ঠিত চিত্ত শঙ্কাকুল ও বেদনায় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, এখন আর সে কোনমতেই সলিলকে ছাড়িতে পারে না, তার সমস্ত জীবন মরণ, ইহলোক এবং পরলোক একমাত্র তাহারই উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে যদি তাহাকে এখন ছাড়িতেও চায়, আরতি আর তাহা পারিবে না। তখন আরতি সলিলের কথা ভাবিতে লাগিল। সেই প্রথম দিনের সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া এই শেষ বিদায়ের ক্ষণ অবধি সকল কথাই সে মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিতে দেখিতে আকুল আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল। তার মনে হইল, সলিলের এত ভালবাসার সে যেন যোগ্য নয়। সে তার জন্য যা করিয়াছে; ক'জন পুরুষ ক'জন নারীর জন্য তাহা পারে? অথচ প্রতিদানে,—প্রতিদানে সে তার নিকট হইতে কি পাইয়াছে?

আরতি উগ্র-ব্যাকুলতায় দৃঢ় করিয়াই মনে মনে বলিল, "না পান নাই, কিন্তু আজ হতে আমরণ—যদি মরণেরও পর কিছু থাকে তবে এ জীবনের যা কিছু সবই তাঁর পায়ে দিলাম—"

সহসা তার মুখ শুকাইয়া গিয়া শব-শুভ্র হইয়া গেল,—"কিন্তু যদি—ওঃ কিন্তু যদি তিনি তাঁর মায়ের অনিচ্ছায় আমায় তাঁর স্ত্রী করতে না চান তবু কি আমি—ওঃ ভগবান! না না—কিন্তু তাহলে আমার গতি কি হবে? আমি কেমন করে তাঁকে ছেড়ে থাকবো? কোথাও গিয়েই তো আর এখন থাকা সম্ভব নয়, আমার কি হবে?"

এই 'আমার কি হবে?' প্রশ্নের কোন উত্তরই সে তার বিনিদ্র যামিনীর নিঝুম স্তব্ধ বক্ষ পঞ্জর হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিল না। এই দুশ্চিন্তা-বিরস, শঙ্কা, উদ্বেগ ও হতাশাচ্ছন্ন রাত্রিশেষে প্রভাতের দিকে তার অন্তরেরই বহিঃ প্রকাশ রূপে এক ঘোর দুর্য্যোগের অবতারণা করিল। তার বুকের অব্যক্ত ভাষা বাহিরে যেন প্রাণবন্ত হইয়া দেখা দিল। বাতাসের আর্ত্ত বিলাপে নিজের অন্তরের আর্ত্তনাদকে মিলাইয়া লইয়া সে আকুল আচ্ছন্ন হইয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

রজনী আসিয়া কাছে বসিল, কহিল,—"দিদিমণি, একাটী রয়েছ, ভয় করচে না? আমি একটু কাছে থাকি? আহা বাবুর লেগে প্রাণটায় সুখ নেই কি না, মনটী বিরস হয়ে রয়েছে।"

আরতি নীরব হইয়াই রহিল—রজনীর সহানুভূতিতে তার রুদ্ধ অশ্রু আবার বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছিল।

রজনী তাহা অনুভব করিয়াই সান্ত্বনা দিতে চাহিয়া কহিতে লাগিল, "আহা হবে না গা, বাবুর মতন এত যত্ন, এত ভালবাসা যে লোকে বিয়ে-করা সোয়ামীর কাছকেও পায় না গো! আমার মনিবের মতন বাবু কি আর কোথাও আছে?"

আরতির পতনোদ্যত অশ্রু, সূর্য্যের উত্তাপে শিশির বিন্দু যেমন করিয়া শুকাইয়া ওঠে, তেমনি করিয়াই শুষ্ক হইয়া গেল। তার অন্তরের অশ্রু-আর্দ্র কোমলতাকে নিমেষে রুক্ষ, শুষ্ক, কঠিন করিয়া তুলিয়া একটা তীব্র

জ্বালাভরা বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই তবে তার প্রকৃত পরিচয়? এই তবে তার যথার্থ পরিণাম? নিদারুণ আক্রোশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া সলিলের বিরুদ্ধে অক্ষমনীয় অপরাধের অভিযোগকে সে একান্ত করিয়াই দেখিল। এই উদ্দেশ্যেই তবে সে তার সঙ্গে এতবড় চাতুরী খেলিয়া চলিয়াছে? এই উদ্দেশ্যেই মঞ্জুকে সে তার বুক হইতে ছিনাইয়া দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া তাহাকে তার একান্ত অসহায় অবস্থাতেই চুরি করিয়া আনিয়াছে? ধিক্ ধিক্ তার পুরুষত্বে, শত ধিক তার মনুষ্যত্বকে!

সমস্ত দিন ধরিয়া ঝড়ের হাওয়া অশান্ত কলরোলে আর্ত্তনাদ ও দাপাদাপি করিয়া ফিরিতে লাগিল। সমস্ত দিন ধরিয়া আরতির অন্তরের মধ্যেও ততোধিক অশান্তির আর্ত্তরোল উদ্দাম হইয়া রহিল। এতবড় অত্যাচারের বোঝা বহিয়া এ জীবনকে বহন করা তার পক্ষে যেন অসম্ভব এবং অসঙ্গতই ঠেকিতে লাগিল। তার আহত বিদীর্ণ চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া কহিতে লাগিল, আমি মরলেম না কেন? কেন আমার মরণ হলো না? সে নদীর জলে ডুবিয়া মরার সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পরেই ঝড়ের বেগ এবং বৃষ্টির প্রবলতা হঠাৎ হ্রাস পাইয়া গেল। মনে হইল, সারাদিনের মাতামাতির পর যেন দুরন্ত দজ্জাল ছেলে সহসা শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রজনী আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল, এইমাত্র ডাকের পিওন এতবড় দুর্য্যোগকেও উপেক্ষা করিয়া বাবুর চিঠি লইয়া আসিয়াছে। বকশিষের বিষয়ে মুক্তহস্ততা সলিলকে বিশেষ করিয়াই এ সব শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন করিয়া রাখিত।

আরতি চিঠিখানা অন্যমনস্কে হাতে লইয়া অনাগ্রহে ফেলিয়া রাখিতে গিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, এ লেখা যে সুন্দরার! তার সমস্ত দিনের বিদ্রোহের তাপে তপ্ত মনপ্রাণ সেইক্ষণে যেন একমূহূর্ত্তেই ধারাস্নিগ্ধ তপ্ত

নরুর মতই জুড়াইয়া আসিতে চাহিল। তার বুক ঠেলিয়া একটা অতি প্রবল অশ্রুর উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

সঙ্গত অসঙ্গত সকল হিসাব ভুলিয়া গিয়া সে তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে চিঠিখানা খাম ছিড়িয়া বাহির করিয়া লইয়া পড়িল। সে পত্রে সুন্দরা এই কথা লিখিয়াছে—

" * * * মঞ্জু ভালই আছে। সুজিত রঞ্জিতদের সঙ্গে সে সমান-ভাবে মিশে গ্যাছে। তার জন্যে তুমি একটুও ভেবো না। তুমি এখন থেকে মনে করো, সে তোমার দিদিরই আর একটী ছেলে। আমি তাকে কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালীতে একটু একটু অক্ষরও চেনাচ্চি, অবশ্য বেশি চাপ দিইনে, নিজের ইচ্ছায় যেটুকু শিখতে চায় শুধু সেইটুকু। চেহারা তার সেই আগের মতন—মুসুরি পাহাড়ের মতনই হয়ে গ্যাছে। শীঘ্রই তার নূতন তোলা ফটো একখানা তোমায় পাঠিয়ে দোব,—দেখলে মনেও পড়বে না, এই ছেলে আবার সেই রকম অস্থিসার কঙ্কালমাত্র হয়ে গেছলো!

সে যা হোক সলিল! যতই নির্লিপ্ত থাকবো মনে ভাবি না কেন, আমার এই আটাশ বছরের মনকে তো আর নূতন করে আজ গড়তে চাইলেও গড়তে পারচিনে; তোমার কথা ভেবে আমি তো কোন কুল-কিনারাই খুঁজে পাচ্চিনে ভাই!—কি হবে বল্ দেখি? মা না কি কাশী না গিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। দেওয়ানজী সেদিন এসেছিলেন, বল্লেন, মাঠাকরুণকে আমিও কত বুঝোলাম, বল্লাম, দাদাবাবু যাকে চান, তাঁকেই পেতে দিন—তাঁর কি আর পছন্দ নেই, ভালই হবে। তা বল্লেন, 'বেশ তো, তোমরা দাও না, আমি তো মানা করচিনে, তবে আমার কথা আলাদা, আমার কাছে সত্যের মর্য্যাদা ছেলের চাইতেও বড়, আমি সে বিয়ের বউকে স্বীকার করবো না, আমি জান্‌বো সলিলের বিয়ে হয়নি।'—কি বিপদ! মার মনের এ অবস্থায় তোমার যে কি কর্ত্তব্য তাও তো কিছুই

ভেবে পাইনে! মা যে তোমার অনেক দুঃখে মানুষ করেছেন, সেও আমাদের ভোলবার কথা নয় ভাই! এর যে কি উপায় ভগবানই জানেন।”

আরতির চিঠিখানা পড়া হইয়া গেলেও নির্নিমেষ নেত্রে সেইখানারই উপর শতচক্ষু হইয়া চাহিয়া রহিল। একটা গভীর বেদনাভরা অনুতপ্ত লজ্জায় এবং অপরিসীম সুখে তার বিহ্বল চিত্ত যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। উঃ কি অকরুণ হৃদয়হীনা পাষাণী সে,—কি ঘৃণ্য হীন চিত্ত তার! এই এতবড় সহৃদয়তার, ভুয়োদর্শনের, আত্মত্যাগীর প্রতি এতবড় অবিচার! না না—বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!

রজনী আসিয়া তাহাকে তদবস্থাতেই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবুর পত্তর এলো বুঝি দিদিমণি? আহা বাবুর কি দরদ গো, একটী পা নড়েছেন কি অম্‌নি সাথে সাথে পত্তরটী দে’ছেন। মনটী তো ঐখানেই ফেলে রেখে গ্যাছেন কি না।”

রজনীর এই দুষ্ট ইঙ্গিতেও এ সময়ে আর আরতির হর্ষোচ্ছ্বসিত চিত্ত সঙ্কুচিত হইল না। সে উৎফুল্ল স্মিতমুখে মুখ ফিরাইয়া কহিয়া উঠিল,—

“হ্যাঁ রজনী, বাবুরই চিঠি, আমায়ও যেতে হবে।”

রজনী বিস্ময়ধ্বনি করিয়া উঠিল, “কোথায় গা? বাবুর কাছকে?

“হুঁ”—বলিয়া আরতি তার ঈষৎ লজ্জারুণ মুখ নত করিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

“উনি তো শীগ্‌গিরই আসচেন বলে গেলেন, তুমি হঠাৎ আবার যাচ্চো যে? আর কার সঙ্গেই বা যাবে?”

আরতি ঈষৎ বেগের সহিত কহিয়া উঠিল—“সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না, আমি কি কচি খুকি যে আমার সঙ্গে দশটা লোক চাই? যা’ আমার জন্যে একটু গরম জল করে দে, গা হাত ধুয়ে নোব।”

রজনী আবারও বিস্ময় প্রকাশ করিল, "সারাদিন অসুখ বলে কিছু খেলে না, এখন গা ধোবে কি গো ? অসুখ যে বেড়ে যাবে।"

আরতি ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল, "তোর সাবধানের জ্বালায় আমি গেলুম। নারে বাবু, কিচ্ছুই আমার হবে না, তুই যা।"

রজনী মনে মনে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। এ বয়সের মেয়েদের সকলই না কি সৃষ্টিছাড়া! এই তো একটা দিন মাত্র ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, এর মধ্যে কান্নাকাটি, অনাহার, আবার যেমন চিঠি পাওয়া অমনিই সব বদলাইয়া গিয়া স্ফূর্ত্তির প্রবলতার অনাসৃষ্টি অঘটন!—

আরতি সারাদিনের পর স্নানাহার সারিয়া শান্ত হইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর লিখিবার উপকরণ সাজান আছে। এ পর্য্যন্ত এ সকল বস্তু তার স্পর্শ করার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। আজই প্রথম সে ঐ নূতন প্যাড্খানা হইতে একসিট কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া একখানা পত্র লিখিল। লেখা হইয়া গেলে, খামে সেখানাকে মুড়িয়া রাখিয়া সে ধীরপদে উঠিয়া আসিয়া, বারেকমাত্র ইতস্ততঃ করার পর তাহার পার্শ্বের কক্ষে সলিলের শয়নাগারে প্রবেশ করিল। এই ঘরের মধ্যে এর আগে কোন দিনই সে প্রবেশ করে নাই, আজ কি ভাবিয়া আসিল সেই জানে; অথবা সেও হয় ত তা' ভাল করিয়া জানেও না। ঘরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ, নেয়ারে ছাওয়া খাটের উপর বিছানা পাতা, মশারি দিয়া তাহা ঢাকাই আছে। উভয় গৃহের মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে আরতির গৃহস্থিত আলোক রশ্মি আসিয়া পড়িয়া এই নির্জ্জন শয্যাগৃহকে আলোছায়াময় মায়ালোকের মতই রহস্যময় বোধ হইতেছিল। আরতি যেন মন্ত্রসম্মোহিতের মতই একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে সেই খাটের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নবোঢ়া বধূ তার প্রথম স্বামী-শয্যায় প্রবেশ করিতে যে রকম কুণ্ঠা বোধ

করে, সেও ঠিক যেন তেমনই একটা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিল ; এবং পরিশেষে যেন প্রবল দ্বিধা ও লজ্জাকে জয় করিয়া লইয়া, সে কম্প্রমান বক্ষে ও আরক্ত মুখে কম্পিতহস্তে মশারি উঠাইয়া, সেই পূর্ব্ব-উপভুক্ত পরিত্যক্ত শয্যাতলে খাটের পাশে নতজানু হইয়া বসিয়া সন্তর্পণে নিজের মাথা রাখিল।

ভক্ত দেবমন্দিরের মৃত্তিকায় যেমন করিয়া নিজের নীরব ভক্তিসম্ভার নিবেদন করিয়া দেয়, তেমনই করিয়াই সে তার অন্তরের পূজার অর্ঘ্য আজ এই তার দেবমন্দিরে নিঃশব্দে নিবেদন করিয়া দিল।

এই বিছানার মধ্যে এখনও সলিলের গায়ের গন্ধ, তাহার অঙ্গের স্পর্শ প্রচুর হইয়া রহিয়াছে। আরতির সর্ব্বদেহ যেন পুলক-লজ্জায় শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চেতনাকে যেন তাহা আচ্ছন্ন অবশ করিয়া রাখিল। তার পর বহুক্ষণ পরে সেখান হইতে সুখাবেগ-স্পন্দিত অথচ বেদনাশ্রু-পরিপ্লুত মুখ তুলিয়া সে মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিল, "তুমি তো জান্‌তেও পারবে না, তুমি তো কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই আমার জীবনের অভিশপ্ত, এই আমার প্রার্থিত মহা-তীর্থে আমার চোখের জল, বুকের নিশ্বাস কতখানিই আমি রেখে গেলাম ! তোমায় পাওয়া আমার এ জন্মের কপালে লেখা নেই, আমায় পাওয়া তোমার পক্ষে এ জন্মে সুখের হবে না, তবে মিথ্যা কেন মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ানো ? যেদিন থেকে আমাদের মধ্যে এ মিলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেই দিন থেকেই আমাদের জীবনে যত কিছু বিপৎপাতের অভ্যুদয় হয়েছে। কাজ নেই,—এত ত্যাগ স্বীকার করে, মার মনে দুঃখ দিয়ে আমায় পেয়ে তোমার কি হবে ? কি আমি এমন তোমায় দিতে পারবো, যাতে এ ক্ষতির তোমার পূরণ হবে ? তার চেয়ে আমিই তোমার জীবন থেকে চিরদিনের মতন বিদায় নিয়ে সরে যাই। আমায় না পেলে,

আমার প্রতি তোমার ভালবাসার আঘাত পেলে, তুমি তোমার নিজের পথে চলতে পারবে, সুখী হবে। কালক্রমে আমায় ভুলেও যাবে।”

আরতি অসম্বরণীয় আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে সলিলের মাথার বালিসের উপর তার অশ্রুপ্লুত মুখ রাখিয়া গভীর প্রেমে তাহা চুম্বন করিল। তার পর অতি ধীরে সন্তর্পণে যথাযথভাবে সমস্ত সন্নিবেশিত করিয়া পুনশ্চ সাবধান-ন্যস্ত পদে ধীরে ধীরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাত্রি তখন গভীর হইয়া গিয়াছে। পাশের ছোট ঘর হইতে রজনীর নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। চাকর বামুনের কোন সাড়াশব্দ নাই। একখানা মোটা আলোয়ানে গা-মাথা ঢাকিয়া, খরচের টাকা হইতে দশটামাত্র টাকা লইয়া, তাহার স্থানে নিজের আঙ্গুলের আংটীটা রাখিয়া, সে ধীর পদে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রি। ষ্টীমার ঘাটে লোক বেশি নাই। আলোর বন্দোবস্ত পর্য্যাপ্ত না থাকায় আস-পাশের অন্ধকার একেবারেই ঘুচাইতে পারে নাই। আরতি যাত্রীপথের একটুখানি পাশ কাটাইয়া চলিল। যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পাইয়া কোন প্রশ্ন করে, এই ভয়টাই তার মনে পদে পদে জাগিয়া উঠিতেছিল।

টিকিট সে চাহিবামাত্র ষ্টেশন মাষ্টার ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত তাহার অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট তার হাতের দিকে বাড়াইয়া দিতেই সে নিজের হাত সরাইয়া লইয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমি থার্ড ক্লাসের টিকিট চাইচি।”

ষ্টেশন মাষ্টার তখন যেন কোন একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহচিত্ত হইয়া টিকিট বদলাইয়া দিল।

আরতি একটা মৃদুশ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিয়া ধীরকম্পিত পদে জাহাজের গ্যাংওয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। এতক্ষণ পরে যাত্রীদলের

ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িতে পাইয়া তার চকিত-চঞ্চল চিত্ত ঈষৎ যেন স্থস্থির হইতে পাইল। সারাদিন ঝড় বৃষ্টির জন্য ষ্টীমার ছাড়া বন্ধ ছিল বলিয়া আজ এত রাত্রেও লোকের অভাব ছিল না।

পরপারে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সে কলিকাতার টিকিট কিনিয়া থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরায় চড়িল। কখন অভ্যাস নাই, নোংরা-কাপড়-পরা, লাঠিসোঁটা কুলা চাঙ্গারী বাহিকা কলহপরায়ণা যাত্রিনীদের দাপটে, কড়া তামাকুর তীব্র ধোঁয়ায় ও গন্ধে তার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। বেঞ্চিতে অনেকেই হাত পা মেলিয়া শুইয়া বসিয়া আছে, সে বসিতে যাইতেই আরোহিনীরা হাঁ হাঁ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। ভয়ে শুকাইয়া গিয়া সে আর না বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না। অনেকক্ষণ পরে এবার সে বেঞ্চে বসিতে চেষ্টা না করিয়া একজনের একটা মোটের উপর বসিতে গেল। অমনই মোটের অধিকারিণী চীৎকার শব্দে গালি দিয়া উঠিল,—"এই অন্ধা! তেরা আঁখ নেহি হ্যায়? দেখ্‌তে নেই ইস্‌মে হামারা নয়া ডালিয়া বান্‌হা হায়, টুট্‌ যায়েগা।"

তার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল—ওঃ, এই কঠিন কর্কশ পৃথিবীতে আত্মত্যাগ করা কি এত বড় কঠিন ব্যাপার? আবার তার সেই মাধবীর গৃহ মনে পড়িতে লাগিল। তবু সেও তো ঢের ভাল ছিল! এ এতবড় অনিশ্চিততার মাঝখানে সে কোথায় যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে চলিল, তার ভাগ্যবিধাতাই শুধু সে কথা জানেন! কোথায় যাইবে? কি করিবে? কিছুই তো সে ভাবিয়া আসে নাই! স্থন্দরার কাছে? আঃ, তা যদি পারিত! শুধু তাই যদি সে পারিত! কিন্তু তা হয় না। যতই লোভের হোক, সে পথে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব! স্থন্দরা যে মঞ্জুর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে এ জন্মের মত মুক্তি দিয়াছে, সেই যথেষ্ট! তার এই দুগ্রহময় জীবনের শিলাভার তাহার উপরে চাপাইয়া

তার সুখের সংসারে দুরন্ত রাহুগ্রাস ফেলিবার জন্য সে সেখানে নিশ্চয়ই যাইবে না। তাছাড়া সেখানে গেলে আর আসানপুর ত্যাগ করার প্রয়োজন কি ছিল? সলিল কি তার দিদির বাড়ীতে যাইতে জানে না?

শিয়ালদা ষ্টেশনে নামিয়া আরতি স্তম্ভিত হইয়া গেল। এইবার তার গতি যে কোন্ পথে সে যেন তার কোন কূলকিনারাই খুঁজিয়া পাইল না। ট্রেন হইতে নামিয়া সে চুপ করিয়া একটা লাইট-পোষ্টের খুঁটি ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া পড়িল। তার চারিদিককার লোকারণ্যের দিকে চাহিয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িতেছিল। এর মাঝখানে সে কোথায় ভাসিতে আসিয়াছিল! তার মনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে আরও অনেক কথাই চকিতের মধ্যে চমকিয়া গেল। তার মতন কম বয়সের মেয়েদের পক্ষে এসব স্থান তো নিরাপদও নয়। তার মনে হইল, এর চেয়ে রজনীকে সে যদি সঙ্গে আনিত তো ভাল করিত।

"ম্যাডাম!"—বলিয়া একটী সাহেবী-পোষাক পরা ভদ্রলোক আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইলেন। লোকটীর চোখের দৃষ্টি সতেজ এবং তীক্ষ্ণ মুখের ভাবে একটী স্বতঃচ্ছুরিত প্রতিভার উজ্জ্বলতা দেদীপ্যমান রহিয়াছিল। তিনিই আরতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথা কহিতে লাগিলেন,—

"ম্যাডাম! আপনাকে আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলেম। মনে হচ্চে যেন আপনি কোন না কোন রকমে বিপন্ন! আপনার সঙ্গে আর কারুকেই দেখচিনে, অথচ স্বাধীন মেয়েদের মত সহজ ভাবও আপনার নয়! কি হয়েছে বলুন তো? টিকিট হারিয়েছেন?"

আরতি নীরব বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া লোকটীকে দেখিল। পদস্থ লোক, চেহারায় বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। অদূরে ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় একটা আর্দ্দালী কুলির মাথায় সুটকেশ প্রভৃতি চাপাইয়া প্রতীক্ষা করিতে-

ছিল। মুখের দিকে চাহিয়া আরতির কুণ্ঠিত চিত্ত ঈষৎ যেন আশ্বস্ত বোধ করিল। এ মুখ যেন ক্রূরকর্ম্মী প্রতারকের মুখ নয়। তথাপি সে ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া নীরব রহিল।

তাহার কুণ্ঠা বুঝিয়া লোকটী পুনশ্চ কহিলেন, "হতে পারে আমার অনুমান ভিত্তিহীন, আপনি বেশ স্বচ্ছচিত্তে এখানে দাঁড়িয়ে কারুর প্রতীক্ষা করচেন; তবে যা আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমি অকপটে বল্লেম। যদি সেটা সত্য হয়, তাহলে আমায় আপনি অনায়াসে খুলে বলতে পারেন। আমার নাম নীরদবরণ সেন, আমি একজন ডাক্তার,—বিশেষ করে মেয়েদেরই ডাক্তার। আপনি স্বীকার করুন, আর নাই করুন, আপনি নিশ্চয়ই বিশেষরূপে বিপন্ন।"

আরতি এবার অত্যন্ত আশ্চর্য্যানুভব করিল, সঙ্গে সঙ্গেই এই মানব-চরিত্র লেখা পাঠ সমর্থ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রতি একটা শ্রদ্ধাও সে অনুভব না করিয়া পারিল না। তার উদ্বিগ্ন কাতর চিত্ত যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "এই তো ভগবানের দান তোমার সম্মুখে! এ পাওয়াকে অপমান করতে তুমি পারো না।"

প্রকাশ্যে যোড়হাতে নমস্কার জানাইয়া সে ডাক্তার সেনকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলিল,—"আপনি হয়ত অন্তর্যামী! সত্যই আমি বিপন্ন,—আমি নিরাশ্রয়। আমায় আপনি যদি ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি করিয়ে দেন—আমি ধাত্রীর বা নার্সের কাজ শিখতে চাই।"

ডাক্তার স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "অনায়াসে।—আচ্ছা, তাহলে আপনি আমার সঙ্গে আসুন, এক্ষণই আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাচ্চি।"

অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম কয়টা নিতান্ত দায়গ্রস্ত ভাবেই চুকাইয়া ফেলিয়া, সলিল তার বিশ্রাম-ভবনের পানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। মার জন্য মন একবার ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ সময় দেখা করিয়া একটা নূতন মনোবাদের সৃষ্টি করিতে তার ভরসা হইল না, সে মনে মনে বলিল, এখন না, এইবার একেবারে দুজনে মিলেই মার পায়ের তলায় গিয়ে দাঁড়াবো।

একজন স্মৃতিরত্ন পণ্ডিতের কাছে গিয়া সে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিল। পাঁজির পাতায় বিবাহের দিন খুব বেশি নিকটবর্ত্তী দেখা গেল না, ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেই দিন আছে, কয়েকদিন পূর্ব্বে স্মৃতিরত্ন মহাশয় আসিয়া যথাকর্ত্তব্য সমুদয় নিষ্পন্ন করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

নিশ্চিন্ত চিত্তে আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য তাঁহার হস্তে অগ্রিম অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক সলিল এইবার আরতির নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এইবার সে তাহাকে আপনার করিয়া পাইবে, তার সকল সহিষ্ণুতার পুরস্কার লাভ করিবে।

ষ্টীমারে সে নদী পার হইয়া গেল। নদীবক্ষ স্থির ও চন্দ্রালোকিত,—ডেকের উপর বসিয় সে সুপ্রফুল্ল নেত্রে সেই রজতশুভ্র চন্দ্রকরমাখা নদীনীরে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে বিস্তৃত সমস্ত জীবনটাকেও অমনই শান্ত সুন্দর ও আলোকিত বলিয়াই তার মনে হইতে লাগিল। তার পাশ দিয়া এক জোড়া নব বিবাহিত খৃষ্টানদম্পতি হাত ধরাধরি করিয়া পাইচারি করিতে করিতে অনর্গল কথা কহিতেছিল, তাদের প্রতি তার সমস্ত মনটা

যেন সহানুভূতিতে গলিয়া পড়িল। আহা! ওদের এ মিলন সুখের হোক! নিজের হৃদয় যখন পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন সমস্ত জগতের উপরেই যেন একটা গভীরতর স্নেহ ও সহানুভূতির ধারা স্বতঃই বর্ষিত হইয়া থাকে।

নদী-নীরে এবং নদী-তীরে জ্যোৎস্নাজাল যেন স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু নিজের অন্তরের মধ্যস্থিত সুগভীর আনন্দের উচ্ছ্বাসে চিত্ত তার এতই ভরিয়া রহিয়াছিল যে সেসব দিকে তার চোখের দৃষ্টি পতিত হইলেও মনের দৃষ্টি পৌঁছিতেছিল না। মন তার নিজের আনন্দেই আজ পূর্ণতর। ইহার মধ্যে বাহির হইতে টানিয়া আনা আনন্দের উপাদানকে সে আর গ্রহণ করিবে কোন্‌খানে? পদ্ম যখন শতদলে ফুটিয়া উঠে, নিজের শোভা ও সৌরভে সে আপনাতেই আপনি ভরিয়া থাকে; যে জলের উপর সে বিকশিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিবিম্বিত নিজেকে দেখিয়া তৃপ্ত হইবার তার সময় হয় না। তেমনই বিকশিত ভরা যৌবনের সমুদয় পরিপূর্ণতা লইয়া সার্থকতার সুখে সমস্ত অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া সেও আপনাহারা হইয়া সেই সুখ-সাগরেই মগ্ন হইয়া রহিল। তার বিজয়ী চিত্ত শুধু সুরবাঁধা বীণার মত আপনি আপনি ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল, "আমি পেলাম! আমারই জয়! অবশেষে আমিই জয়ী হলেম!"

জ্যোৎস্নালোক ক্রমেই অপসৃত হইতে হইতে পৃথিবী হইতেই সরিয়া গেল, দিনের আলো ফুটিয়া উঠিল।

ঐ যে ষ্টীমার ঘাট দেখা যাইতেছে না? ঐ সেই তরু বীথি, যার মাঝখান দিয়া একটুখানি উপরে উঠিয়া গেলেই সেখানে পৌঁছান যায়। লাল ইটে গাঁথা সেই বিশেষ বাড়ীটীর ছাদের কার্ণিসের একটা কোণ না ঐ দেখা যাইতেছে!

আঃ—কোথা হইতে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ জমিয়া উঠিল! ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টিও যে আরম্ভ হইয়া গেল! এ কি বিপদ! সলিল সতৃষ্ণনেত্রে নদীকূলে চাহিয়া দেখিল। নদীতীর জনশূন্য! হয় ত বৃষ্টির জন্যই সে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিতে পারে নাই, নতুবা সে ত তার আসার সংবাদ তার করিয়া দিয়াছিল।

বাড়ীর সামনে আসিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই, সাম্‌নের বারান্দায় উঠিতেই পরিচিত সেই কাঠের বেঞ্চি, কয়েকটা মাটীর গামলায় ডালিয়া ফুলের গাছগুলিতে জ্বলজ্বলে লালচে রংয়ের ডালিয়া ফুল চোখে পড়িয়া গেল। বেঞ্চির উপরে আরতির গায়ের গোলাপীরংয়ের চেক-কাটা র‍্যাপারখানা পড়িয়া আছে। তবে সে এতক্ষণ তাহারই আশাপথ চাহিয়া এইখানেই বসিয়া ছিল, হয় ত বৃষ্টির জন্যই এই কতক্ষণ মাত্র উঠিয়া ভিতরে গিয়াছে!

দ্রুতপদে দ্বারের সন্নিহিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"আরতি!"

কেহ আসিতেছে পদশব্দে জানা গেল, কিন্তু যে আসিল সে আরতি নহে, তাহার ঝি রজনী।

সলিল একটুখানি আশাহত ভাবে তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তোমার দিদিমণি কোথায়?"

"দিদিমণি তো আপনার যাবার পরদিনেই এখান হ'তে চলে গিয়েছেন! আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি না কি?"

"চলে গিয়েচেন! কোথায় চলে গিয়েছেন?"

রজনীকে হতবুদ্ধি দেখাইল, সে কহিল, "তা তো আমায় তিনি কিছুই বলেন নি, শুধু এই বল্লেন; 'বড্ড দরকার, আমাকেও যেতে হবে। তোমরা বাড়ী আগলে থাকবে। বাবু ফিরে না আসা অবধি কোথাও যেন যেওনা।'

আমরা ভেবেছিলুম হয় ত আপনি যেয়ে পত্তর দেছেন, তাঁকে যাবার জন্যে, তাই যাচ্ছেন।"

তার পর বাক্যহারা স্তব্ধ মনিবের দিকে একখানা ডাকে আসা খামের চিঠি বাড়াইয়া দিয়া পুনশ্চ কহিল—

"এই চিঠি কালকে বিকেলে পিওনটা দিয়ে গেছে।"

সলিল পত্র লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তার চলন দেখিয়া বোধ হইল সে যেন কোন উঁচু জায়গা হইতে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, অথচ সেই ভাঙ্গা পাখানাকে তার টানিয়া না লইয়া গেলেও তো নয়; তাই কোন মতে চলিয়া যাইতেছে।

আরতি পলাইয়াছে! ইহাকে পালানো বই আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু কেন? কেন সে এমন করিয়া পলাইয়া গেল? সলিল কি তার সঙ্গে কোন মন্দ ব্যবহার করিয়াছিল?

পত্রখানা বাহির করিয়া সে পড়িতে লাগিল।

শ্রীচরণেষু—

অকৃতজ্ঞতার সীমা রাখিয়া গেলাম না যে মাপ চাহিব! তাই সেকথা তুলিলাম না। অনেক দেনার দায় ঘাড়ে চাপিয়াছে, আর জড়াইয়া ফেলা সঙ্গত নয় এটা বুঝিতেছি, যখন আমার পক্ষ হইতে পরিশোধের উপায় মাত্র নেই।

সম্ভব হয়ত আমায় বিস্মৃত হইয়া যাইবেন। আমার সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবেন না, আমি আপনার কৃপার অযোগ্য এইটুকু মনে করিলেই আমাকে ভোলা সহজ হইবে। আর বেশি কিছু বলিবার নাই।—প্রণাম।

আরতি

স্থিরনেত্রে সেই চিঠির কাগজখানার দিকে চাহিয়া সলিল বসিয়া রহিল। বিস্ময় যেন তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, অথচ তার মনের

ভিতরটা যেন ঝড়ের হাওয়ার মতন দ্রুত তালে ছুটিতে লাগিল। বারান্দার দিকে শূন্যনেত্রে চাহিয়া দেখিল, আরতির গায়ে দেওয়া সেই র‍্যাপারখানায় তার চোখ পড়িয়া গেল। তার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া সেখানাকে সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া পা দিয়া টানিয়া ফেলিয়া দেয়। ঐ চেয়ারখানায় সে সেদিনও যে বসিয়াছিল! ঐ ছোট্ট টেবিলটার উপর দোয়াতদানী রহিয়াছে,—ঐখানে বসিয়াই সে এই চিঠিখানি লিখিয়াছিল না কি? ঠিক তাই! এই বাড়ীরই কাগজ খামে তো এ চিঠি লেখা! ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘড়ির কাঁটাটা আটটার ঘরে দাঁড়াইয়া অচল হইয়া আছে—হয় ত সেই দিন হইতেই—এইবার সে জ্বালাভরা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃষ্টি তখন বর্দ্ধিত বেগে খোলার চালের ছাদের উপরে চড় চড় বড় বড় করিয়া নানা ছন্দের তান দিতেছিল, বাতাস যেন বর্ষাদিনের আগমনী গাহিয়া উঠিতেছিল, যে বর্ষায় এ গৃহের বর্ত্তমান অধিবাসীর সহিত তার কোন সংশ্রবই থাকিবে না!

ভক্ত ভক্তি-আরাধনায় দেবপ্রতিমা গড়িয়া তাকে পূজা করে, মানসিক করে, তখন তার ভক্তির সীমা থাকে না; কিন্তু যদি তার সেই মানসিক কামনা সিদ্ধ না হয়—তবে যে পরিমাণে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া সে পূজারম্ভ করিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণে মাপিয়াই তাহার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিবেই বসিবে। তখন চাহি কি, সে সেই অভীষ্ট দেবতাকে পূজা অসমাপ্ত রাখিয়াই নির্দ্দয় হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও উদ্যত হইয়া উঠে।

আরতির ঐ পত্র পাঠান্তে সলিলের মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকমই হইয়া গেল। তার মনের ভাব তখন এতই ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে যে কি করিবে, কেমন করিয়া তার এই মর্ম্মান্তিক হতাশার ও অবমাননার

কিছুমাত্রও প্রতিশোধ দিতে পারিবে, সেই কথাটা সে যেন কোন প্রকারেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এতবড় অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার স্থান যে এ সংসারের কোথাও থাকিতে পারে, এই কথাটা যদি সে ইতিপূর্ব্বে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিয়া রাখিত!

তার মুখের উপর আগুনে তাতানো লোহার চাবুক মারিয়াও যদি সে চলিয়া যাইত, তবু যেন এর চাইতে বেশি কিছু করা হইত না। এত বড় আঘাত তাকে দিতে পারিত না।

ঝিকে ডাকিয়া আলো দিতে বলিয়া একখানা যাহোক কিছু বই টানিয়া লইয়া সে সেখানার দিকে চাহিয়া গুম হইয়া রহিল। তার মনে হইল যদি সে একজন শিক্ষিত লোক না হইত, তাহা হইলে পুলিসে খবর দিয়া যে কোন একটা অপরাধের দায়ে ফেলিয়া এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ধরাইয়া আনিত। আরও যে কি না করিতে পারিত তাও ঠিক করিয়া বলা যায় না!

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিল যে তার মনের মধ্যের ঝড়টা তখন অনেকখানিই প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। আকাশেও মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া তাহা গভীর নীলিমায় মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যালোকে তাহা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ও বৃষ্টির জলে ধোয়া ঝরঝরে গাছ-পালার উপর দিয়া শান্ত ও সুমিষ্ট ভাবে বাতাস বহিয়া যাইতেছে।

প্রতিদিনের মতই বারান্দায় আসিতেই রজনী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। আজ সে সে সব রাখিয়া দিয়া পূর্ব্বের মত চলিয়া গেল না, তৈরি করিয়া পিয়ালা ভরিয়া দিয়া একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উদ্দেশ্য হয় ত যে যদি বাবুর কোন দরকার থাকে।

চেয়ারে আসিয়া বসিতেই বারান্দার শেষপ্রান্তে গতরাত্রির বৃষ্টির জলে ভেজা ধূলা বালিতে মাখামাখি হইয়া আরতির সেই র‍্যাপারখানাকে পড়িয়া

থাকিতে দেখা গেল। তার সেই দৃষ্টি-আকর্ষণকারী কোমল ও উজ্জ্বল গোলাপী রং আর তাহাতে প্রায় নাই। জলে ধুইয়া মাটী-মাখা হইয়া তার সে পূর্ব্বশ্রী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সলিলের মনে পড়িল, গত কল্য এই র‍্যাপারখানাকেই সে আরতির উপরকার আক্রোশে টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া দলিত করিতে চাহিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! তার সেই ক্রুদ্ধ চিত্তের খেয়ালটাকেই কি কোন্ এক অজ্ঞাত শ্রোতা শুনিয়া লইয়া তাহারই সেই অকৃত ইচ্ছাটাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল? একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে তাহার ব্যথিত দৃষ্টিকে টানিয়া লইল। একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া ঐ অনাদৃত অবলুণ্ঠিত বস্তুটাকে ধূলা ঝাড়িয়া তুলিয়া লয়,—হয় ত এখনও উহার মধ্যে তাহার গায়ের স্পর্শ ও গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও যাইতে পারে!

কিন্তু কিছুই না করিয়া সে নীরবে বসিয়া চা পান করিতে লাগিল। যেটা খাইল, সেটা ভাল লাগিতেছে অথবা তেতো লাগিতেছে, তার পর্য্যন্ত এতটুকু খেয়াল করিল না।

রজনী সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল "আর এক পেয়ালা দিই বাবু?"

স্বপ্নাভিভূত ব্যক্তির মতই অর্দ্ধ আচ্ছন্ন ভাবে সলিল উত্তর করিল, "না, আর না।"

চায়ের বাসনপত্র সরাইয়া রাখিয়া আসিয়া রজনী আবার একবার সেই রকম সঙ্কুচিত কুণ্ঠায় কোণঠাসা হইয়া দাঁড়াইল—

"বাবু!"

সহসা যেন চট্‌কা-ভাঙ্গা হইয়া সলিল মুখ ফিরাইল—

"আমাকে কিছু বলচো?"

মুখ নীচু করিয়া আঁচলের কোণটা পাকাইতে পাকাইতে রজনী তার

কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠা ভরিয়া লইয়া কহিল "আজ্ঞে আমি বলচি কি, আপনার কি এখানে এখন থাকা হবে ? তা'হলে অব্বিশ্যি আমি আর কোথাও যাইনে, আর তা' নাহলে দত্তবাড়ী লোক খুঁজতে নেগেচে,—এই মাস কাবার থেকেই তানারা থাকতে বলে,—চাকরীটে ভাল,—তাই বলছিনু যদি এ চাকরী আমার যায়ই, তাহলে তাদের কথা দে' রাখি যে—"

সলিল একটা চাপা নিশ্বাস মোচন করিল। তার গলার মধ্য দিয়া একটা বেদনার জমাট বাষ্প তার কণ্ঠস্বরকে সামান্য ক্ষণের জন্য চাপিয়া রাখিল, ফুটিতে দিল না। তার পর ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া অন্য দিকে চোখ রাখিয়া সে উত্তর করিল—

"চাকরী তুমি নিতে পারো,—আমি আজ না পারি কাল নিশ্চয়ই চলে যাব।"

রজনী একটু ইতস্ততঃ করিল—

"আপনি যে বলেছিলেন পুরা শীতকালটা এখানেই থাকা হবে ? দিদিমণিও তো আমারও সেই কথাই বলেছিলেন—তা কি হলো না ?"

"না"—বলিয়া উহাকে জবাব চুকাইয়া দিয়াই সহসা সলিল চমকিয়া উঠিল। তবে কি আরতির এই পলাইয়া যাওয়াটা পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত নয় ? আকস্মিক ? তাহার সহিত এখানে বাস করিতে সে যে অনিচ্ছুক ছিল না, তাহা তাহার এই কথাতেই তো প্রমাণিত হইতেছে! তবে কি তার এই তাহাকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াতেই সে কোনপ্রকার সন্দেহ বা অভিমানে এমন করিয়া চলিয়া গেল ? আশ্চর্য্য কি ? হয় ত সে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ভীষণ ভুল করিয়া ফেলিয়াছে! হয় ত তার এতখানি সহিষ্ণুতা সঙ্গত হয় নাই! হয় ত তার অন্তরের গোপন কথা বাহিরেও প্রচার হওয়া উচিত ছিল! হয় ত সমস্ত দোষ তাহার নিজের—আরতির কোনই দোষ নাই। এমন অবস্থায় পড়িলে কোন্ সতী নারী

একজন পরপুরুষের আশ্রয়ে আশ্রিতা থাকিতে পারে? হায় হায়! কি ভুলটাই সে করিয়া ফেলিয়াছে! সে যে তাহাকে ভালবাসে না লিখিয়া গিয়াছে —নিশ্চয়ই সেটা তার প্রতি অভিমান! তীব্র অভিমানেই এমন কথা সে লিখিতে পারিয়াছে, নতুবা ভাল তাহাকে সে যে বাসে, তাহাতে তাহার মত তাহারও মনে কোনই সংশয় যে নাই, ইহা সুনিশ্চিত।

না! নারীর চরিত্র তার কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই! আর কেমন করিয়াই বা হইবে? সে তো কোন দিনই বাস্তব-নারীর সংশ্রবে আসিতে পায় নাই। বিদ্যা যে তার পুঁথিগত।

একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর সাম্‌নেটায় পাইচারী করিতে লাগিল। সূর্য্যতাপে তখন ঘাসের ও পাতার উপরকার বৃষ্টি-বিন্দুগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। বাতাস গত রাত্রির বৃষ্টি-আর্দ্রতায় এখনও যথেষ্ট ঠাণ্ডা ভাবেই বহিতেছিল। নদীর ধারে বাঁশ ঝাড়গুলা সেই বাতাসে শন্‌শন্ শব্দ করিয়া উঠিতেছিল। একটা শিমুল-গাছের ঝোঁপে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছিল। হয় ত সে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল, এ বৎসরের মত এই আমার শেষ গান শুনিয়া লও। শীত আসিতেছে—এবার মলয় পর্ব্বতের চন্দনবনের মধ্যে আমার গানের আসর জমাইতে চলিয়াছি,—আর আমায় তোমরা শতবার সাধিলেও তোমাদের গান শুনাইতে আসিব না। সেই সিগারটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে আরও একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া সলিল ধীর পদে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিশ্চয় তার বুঝিবার ভুল। এবার দেখা হইলে, সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, নিশ্চয় সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। আবার তাদের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। নিশ্চয়ই তাই!

এ সংসারে এতটুকু অসাবধান হইবার অবসর মানুষের নাই।

নিমেষের অন্তরালে কি যে লুকানো আছে কেউ জানে না। একটু চোখ ফিরাইতে না ফিরাইতে, যে এতখানি কাছে ছিল সে দুজনার মধ্যে চকিতে সুদূর ব্যবধানের সৃজন করিয়া দিয়া কোথায় যেন সরিয়া গিয়াছে! এই বিরহ নদীর কূলে বসিয়া তাহাকে কাঁদিতে রাখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে!

কিন্তু না,—নিশ্চয়ই তার আশা-চন্দ্রমা এই দুদণ্ডের রাহু গ্রাস হইতে চিরমুক্ত হইবে। এই চোখের আড়ালে তাদের প্রাণের আড়াল করিতে পারিবে না। তার ভালবাসা তাকে একদিন জয়ী করিবেই করিবে।

২১

কিন্তু বৃথা আশা। আরতির কোন সন্ধানই সে খুঁজিয়া পাইল না। মাধবীর কাছে সে ত যায় নাই! তখন একান্ত হতাশ চিত্তে সে সুন্দরার বাড়ী আসিল।

সলিল যে শরীর মন লইয়া তার দিদির আশ্রয়ে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহাতে সুন্দরা রীতিমতই ভয় পাইয়া গেল। আরতি সম্বন্ধীয় কোন কথাতেই সে থাকিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। একে একে প্রশ্ন করিয়া করিয়া আরতির রহস্যময় পলায়নের সকল সংবাদই সে সংগ্রহ করিল এবং সসঙ্কোচে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল; আর তো কিছুই তার করিবার নাই!

মঞ্জু সলিলকে দেখিয়া তার দিদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—দিদি কেন এবারও আসিল না, বলিয়া রাগ করিয়াছিল, তার পর তার সখা সখীদের মধ্যে পড়িয়া আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সুন্দরা তাহাকে

নিজের ছেলের চেয়ে বেশি করিয়াই স্নেহযত্নে ভরাইয়া তুলিয়াছিল, তার জন্য একজন ভাল মাষ্টার সে এরই ভিতর নিযুক্ত করিয়াছে।

কিন্তু সলিল যে মার কাছে না গিয়া তার কাছে পড়িয়া রহিল, ইহাতে সুন্দরা মনের মধ্যে ঠিক শান্তি পাইতেছিল না। মা ছেলের এই পক্ষপাতিতাকে তার অপরাধ রূপেই গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া সে মনে মনে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মাকে সে সত্যসত্যই মার মতই ভালবাসিত। আর মাও যে তাকে কত ভালবাসেন, তাঁর একদিনের ত্রুটীকে যতবড় করিয়াই সে তার অভিমানাহত চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন, সেও সেটাকে না জানার ভান করিতে পারে না। জ্ঞানোদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই সে মাতৃস্নেহের একবিন্দু অভাব বোধ করিতেই পারে নাই। নূতন ধরণের অলঙ্কার বস্ত্র গৃহসজ্জা যখন যা উঠিয়াছে, সে যত মূল্যেরই হোক, আগে সে মার কাছেই উপহার পাইয়াছে। নিজের গায়ের গহনারও শ্রেষ্ঠ অংশ এই মা তাঁর বধূর জন্য না রাখিয়া মেয়েকেই দিয়াছেন। কোন বিষয়ে কখন পক্ষপাতিতা করেন নাই। আজ সেই মা মনের দুঃখে যদিই নিজের বিমাতৃত্ব প্রচার করিয়া থাকেন, সুন্দরার ত উচিত নয় যে সেও তার প্রতিশোধে তাঁর সপত্নী-কন্যারূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

একদিন সে সলিলকে বলিল "আমিই তোর শনি রে ভাই, আমার জন্যেই তুই অনর্থক দুঃখ পেলি।"

সলিল কহিল "তোমার দোষ কি দিদি! দোষ আমার এই কপালের।"—এই বলিয়া সে নিজের কপালের উপর তর্জ্জনীর মৃদু আঘাত করিল।

সুন্দরা ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, "ওসব কপাল-টপাল নয় রে ভাই! কর্ম্মই প্রবল।—আমি যদি মরতে মুসুরী না যেতুম!"

সলিল ক্ষীণভাবে হাসিল, কহিল, "তাহলেই বা কি হতো? সে

বরং আমি না গেলেই হতো। যাক—সে ত আর ফিরবে না দিদি, মিথ্যে তুমি দুঃখ করে কি করবে? প্রাক্তনই প্রবল,—মানুষ তো একটা উপলক্ষ্য!"

এই কথায় সুন্দরা ঈষৎ ভরসা পাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমিও তো তাই বলি সলিল, এসব যা হ'বার সে ত হয়েই গেছে, এখন আর মিথ্যে ভেবে ভেবে শরীরপাত করে কি করবি বল? আর আমায় কি তুই মার কাছে চির অপরাধী করেই রেখে দিবি রে?"

সলিল যেন ঈষৎ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "তোমার অপরাধটা কিসের দিদি?"

সুন্দরা একটা মৃদুশ্বাস মোচন করিয়া উত্তর করিল, "মা তো তাই জেনে রেখেছেন। যতদিন তুই বিয়ে না করবি সলিল! আমার এ কলঙ্ক তো আর ঘুচবে না ভাই!"

শুনিয়া সলিল ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর সুগভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে ঈষৎ হতাশ ভাবে উত্তর করিল, "সে কি আর আমি পারবো দিদি? বিয়ে আর কারুকে করা আমার পক্ষে আর যে সম্ভবই নয়। আমার এ জন্মটা এমনই করেই কাটাতে হবে।"

যে স্বরে সলিল এ কথা বলিল, সুন্দরার অশ্রুভারাতুর চিত্ত যেন তাহার ভার সহ্য করিতে পারিল না,—তার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। সে দেখিল, সলিলও তার সজল চোখ কোঁচার কাপড়ে মুছিয়া ফেলিতেছে। সুন্দরার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। সে সলিলকে এতটুকু কচিবেলা হইতে তারা দুই মায়ে ঝিয়ে কখনও এতটুকু অভাবের ব্যথা জানিতে দেয় নাই, তার জীবনের এতবড় বিড়াম্বনার দুঃখ দেখা তার পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া আত্মসম্বরণ করিল এবং তার পর

যতখানি সম্ভব সহজ গাম্ভীর্য্যের সহিতই ভাইয়ের সেই হতাশোক্তির জবাব দিল,—

"তা বল্লে তো তোমার চলবে না সলিল,—মা যে সতের বৎসর বয়সে সর্ব্বহারা হয়ে শুধু তোমার মুখ চেয়েই এতকাল প্রতীক্ষা করে রইলেন, সে কি তোমার কাছ থেকে এই ফিরিয়ে পাবার জন্যে? পিতৃ-পিতামহের জলপিণ্ড কি লোপ পাবে? বংশে আর একটা কেউ কি তোমার আছে?"

সলিলের দুঃখাভিহত চিত্ত যেন প্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তার পর আবার তখনই আরতিকে মনে পড়িয়া তার বেদনাবিদ্ধ হৃদয় আবার যেন অঙ্কুশাহত হইল। সে সংশয় পূর্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল,—

"কিন্তু আমার মনে হয় দিদি, আর যাকে আমি বিয়ে করবো তাকে কোনদিনই ভালবাসতে পারবো না।"

ভাইএর হৃদয়ের গভীর বেদনার পরিচয়ে সুন্দরার চিত্ত আশঙ্কাহত হইলেও বাহিরে সে মনোভাব গোপন করিয়াই উত্তর করিল,—

"পাগল! কেন কি হয়েচে যে পারবি না? সে যখন তোকে চায়ই না, এতই কি কাঙ্গালপনা করে তারই পিছনে পিছনে ছোটা!—না না, মার প্রতি তোমার সত্যিই বড্ড বেশি অত্যাচার করা হয়ে গ্যাছে, আর না। সময় থাকতে এখনও প্রতিকার করে ফেল,—তাঁর পছন্দ মেয়েটীকে বিয়ে করো, আমাকেও কেন মিথ্যে মায়ের কোল থেকে বঞ্চিত করে রাখচো? আমারও আর ভাল লাগচেনা বাবু, মনটা কেবল মা, মা, করচে।"

সলিল কথা কহিল না। সুন্দরার এ কথায় তার মন সহসাই দ্বিধা-গ্রস্ত হইয়া উঠিল। আসল কথা, মানুষ বাস্তবিকই ছায়ার পশ্চাতে খুব বেশি দিন ধরিয়া ছুটিয়া ফিরিতে পারে না। আরতি যখন তাহাকে সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করিয়া চোরের মত পলাইয়া গেল, তার অত স্নেহ,

অত আত্মত্যাগের কোন মূল্যই সে দিয়া গেল না, তখন তার প্রতি একটা সুগভীর তীব্র অভিমানের জ্বালাও সে মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিল। দু'একবার তার নিজেরই মনে হইয়াছে যে, আচ্ছা আরতি! যাও তুমি, তুমি কি মনে কর, তুমি না হলে আমার চলিবেই না! আমিও তোমায় দেখাতে পারি যে তোমার চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ মেয়ে আমার স্ত্রী হ'বার জন্য লালায়িত!—কিন্তু আবারও কিন্তু তার ভদ্র চিত্ত এই হেয় চিন্তাকে সুদূরে ঠেলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এবার প্রতিশোধের দিক দিয়া নয়,—মায়ের প্রতি, বংশের প্রতি কর্ত্তব্যের যে বিস্মৃত অংশটাকে সুন্দরা আজ স্মরণ করাইয়া দিল, সেটা এই দ্বিধাগ্রস্ত আশাহত চিত্তকে অসাড় অঙ্গে তড়িৎ সঞ্চালনের মতই যেন সহজে স্মরণ করাইয়া দিল,—বাস্তবিকই তাই। মায়ের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে বই কি—আর সেই মার পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কে আছে?

দেড় বৎসরের অসহায় শিশুকে সেই মা মাতাপিতার উভয় কর্ত্তব্যের সহিত পালন করিয়া আজ তেইশ বৎসরের করিয়া তুলিয়াছেন,—সে কি এমন করিয়াই আঘাত পাইতে?—হতাশ হইতে? —

সুন্দরার উৎসুক মুখের দিকে চাহিয়া সে কলের মতই উচ্চারণ করিল, —"তাহলে মাকে তাই করতে বলো..."

সুন্দরা মনে মনে আশ্বস্ত হইল, প্রকাশ্যে কহিল,—"আমি বল্লে তো হবে না সলিল, তোমার নিজেকে গিয়ে বলতে হবে। না হলে মা মনে করবেন মার কথা না শুনে তুমি আমার কথায় রাজী হলে।"

ইহার পরদিন সলিল রাঘববাটীতে নিজেদের দেশে চলিয়া গেল।

সলিলের মার কাশী যাত্রা বন্ধ আছে। সলিল মার কাছে যে সময় চাহিয়া লইয়াছিল, তার এখনও দিন পনের বাকি। কাশীতে কিন্তু

কেদার ঘাটের কাছে বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে মোট পুঁটুলি সবই বাঁধা।

সন্ধ্যাবেলা কাপড় কাচিয়া ঠাকুর ঘরে আরতি পূজার পর, সায়ংসন্ধ্যা সারা হইলে মহামায়া বাহিরে আসিয়া চিরদিনের অভ্যাসমত চশমার খাপ এবং হিসাবপত্রের খাতা প্রভৃতি সজ্জিত টেবিলের ধারে বসিতে গিয়াই নির্ব্বেদ ভরে সরিয়া আসিলেন। কিছুতেই আর মন যায় না। চিরদিনের কর্ম্মসংযম যেন এই কয় মাসে একেবারেই শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যার জন্য আজন্ম এতখানি করিলেন, সেই যখন সেই মাকেই তুচ্ছ করিয়া নিজের সুখ খুঁজিতে উধাও হইয়া উড়িয়া গেল,—তখন আর কার জন্য এ ঘর সংসার! একতলার ছাদের একটা অন্ধকার-প্রায় কোণের মধ্যে একখানা শীতলপাটী হরি ঝি পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেইখানেই আসিয়া এই অনুত্তীর্ণ সন্ধ্যাতেই দারুণ ক্লান্তিভরে তিনি শুইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ নীরব চিন্তাহীনতায় স্তব্ধ থাকিবার পর সহসা এক সময় অতি বিস্ময়ের সহিত তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁর ব্যথা-জড় চিত্ত আর নীরব নাই, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কোন্ সময় হইতে তার একমাত্র স্মরণীয়কেই মনে মনে স্মরণ করিতেছে। সে ব্যাকুল উদ্বেগে আপনা আপনি বলিতেছিল, "কোথায় রৈলি, একটু চিঠি লিখেও জানাতে পারলি না, কি নিষ্ঠুরই হয়ে উঠ্‌লি সলিল!"

"হরি! মা কোথায় রে?" বলিয়া সলিল এই ছাদটারই প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল; ডাকিল "মা!"

"সলিল!" বলিয়া মহামায়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি যে ছেলের উপর রাগ করিয়া আছেন, ছেলে যে তাঁর কাছে অপরাধী, সে সব কথা তাঁর তখন আর মনে পড়িল না।

সলিল কাছে আসিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া মার পায়ের ধূলা মাথায়

লইল। গা ঘেঁষিয়া যেমন বসিত তেম্‌নি করিয়াই বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"অন্ধকারে অসময়ে শুয়ে কেন মা? শরীর খারাপ হয়নি ত?"

পুত্রের এই স্নেহ-মধুর কণ্ঠ, এই উদ্বিগ্ন কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মায়ের আহত চিত্তকে একান্ত উদ্বেল করিয়াই তুলিয়াছিল। সুপ্ত অভিমানের শিখাও হয় ত ইহাতে উর্দ্ধবেগে জ্বলিয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু এ-সবকেই আড়াল করিয়া দাঁড়াইল মাতৃ স্নেহের অলঙ্ঘ্য শক্তি তার নির্ভুল অনুভব দৃষ্টি লইয়া! মহামায়া চকিত চমকে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—

"এ তোর কি গলার সুর হয়ে গেছে সলিল! তোর কি কোন অসুখ করেছিল?"

সলিল অন্ধকারের আড়ালেও ঈষৎ আরক্ত হইয়া একটু থতমত খাইয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ মা, শরীর ভাল যাচ্চে না।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কোথায় যে কি করে বেড়াচ্চিস্, শরীর ভাল থাকবে কি করে?"

সলিল যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তা বলিয়া ফেলিবার জন্য সে যেন আর দেরি করিতে পারিতেছিল না। অপরাধীর দোষ স্বীকারের মত কোন মতে সেটা একবার মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিতে পারিলে তার যেন সমস্ত দায় চুকিয়া যায়। যতক্ষণ না বলা হইতেছে, না বলিবার জন্য প্রাণপণ বাধার চেষ্টা তার মন ত ছাড়িতেছেও না, এই অবসরে সে তাই তার দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে ঈষৎ হাস্যাভাস টানিয়া আনিয়া চোখ কান বুজিয়া বলিয়া ফেলিল,—

"তাই জন্যেই তো এইবার তোমার কাছে বেড়ি পরতে এসেছি মা! সেই ডানা-কাটা পরীটীকে এনে আমার ডানা দুখানা কেটেই না হয় দাও, সব ল্যাঠা চুকে যাক।"

মহামায়া বিস্ময়ে ও আনন্দে ক্ষণকাল কথা খুঁজিয়া পাইলেন না।

সলিল কিন্তু এ নীরবতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে চাহিতেছিল, কোন কিছু—এমন কোন কিছু যাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া সে তার এই দুশ্চিন্তা-পীড়িত দ্বিধাগ্রস্ত অনিচ্ছুক মনটাকে একেবারে তলাইয়া দিতে পারে। অপর পক্ষের অনাগ্রহের বাতাস লাগিতে দিলে তার এই প্রাণপণ চেষ্টা-অর্জ্জিত কৃত্রিম আগ্রহ যে এই মুহূর্ত্তেই ঝরিয়া পড়িতে সমর্থ তাই ভাবিয়া সে মনে মনে ঈষৎ একটু অস্বস্তি বোধ করিল। তার পর মাকে তখনও কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না দেখিয়া পুনশ্চ একটু উচ্চ করিয়াই বলিল,

"তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্চে না? আমি কি তোমায় মিথ্যে বলি? না না মা! এমন করে আমায় ত্যজ্য পুত্র করে রেখো না, আমি সেই পরীই বিয়ে করবো, শুধু তুমি কথা কও—"

"বাবা আমার!"—বলিয়া মহামায়া এতদিনের সকল অভিমানের পুঞ্জ করিয়া জমান অশ্রু নির্ঝরটাকে অবাধে উৎসারিত করিয়া দিয়া দুই হাতে তাঁর কল্পনায়-হারানো নিধিকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন।

সলিলের যে অশ্রুজলে তার চির স্নেহময়ী মায়ের বুক ভিজিয়া উঠিল, সে কিন্তু তার মায়ের পরে সন্তানের অভিমানই সবটা নয়। তার মধ্যের অর্দ্ধেকখানি সেই নির্ম্মমা পলাতকার বিরুদ্ধের নীরব অভিযোগ! মা কিন্তু তাহা জানিলেন না।

ক্ষণপরে ঈষৎ শান্ত হইয়া মহামায়া কহিলেন,—"কালই আমায় তুই সঙ্গে করে সুন্দরার বাড়ী নিয়ে চল সলিল! সে আমার ওপোর বড্ড অভিমান করে গ্যাছে, আমি নিজে গিয়ে তাকে ডেকে আনবো। তোর চেয়ে তাকে যে আমি আগে থেকে পেয়েছিলুম, আজ তোকে ফিরে পেলুম, সে আমার কই!"

২২

সলিলের বিবাহে সমারোহের কোন অভাব হইল না, অভাব রহিল শুধু আনন্দের। সুন্দরা আসিল, যেন এর আগে কিছুই হয় নাই, এম্‌নই করিয়াই সে ভাইএর বিবাহের উদ্যোগে মাতিয়া উঠিল। বধূর জন্য নূতন নূতন ফ্যাসানের গহনা কাপড় জ্যাকেট ব্লাউসের প্যাটার্ণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফরমায়েস করিতে লাগিল। গায়ে হলুদের তত্ত্বে দিবার জন্য আসন তাকিয়া রুমাল, জামার উপর নানা ছাঁচের কারিগরী সে নিজের হাতেই করিতে বসিল, গায়ে হলুদের দিন রং মাখিয়া সবার গায়ে রং মাখাইয়া, সলিলের দৃঢ় গম্ভীর মুখেও ঈষৎ হাসির ক্ষীণ রেখা বারেকের জন্যও টানিয়া আনিয়াছিল। তথাপি একটুখানি আড়াল পাইলেই চোখ দিয়া তার জল যেন ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। যা কিছু করিতেছিল, কেবলই মনে হইতেছিল, আজ্‌ যদি এসব সে আরতির জন্যই করিতে পারিত!

সলিলের মুখে আষাঢ়ের মেঘ সর্ব্বদাই যেন বর্ষণোন্মুখ হইয়া আছে, তার পুরুষের মর্য্যাদা হারাইয়া সেও গোপনে গোপনে কতবারই যে তার পতনোদ্যত অশ্রুবিন্দুকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছে তাহার হিসাব নাই। শরীর খারাপ বলিয়া স্নানাহার আলাপ আপ্যায়ন সে ত একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছিল। ছেলের মনের এ ভাব মহামায়ার কাছেও কিছুমাত্র অজ্ঞাত ছিল না, তিনিও গোপনে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে মিনতি জানাইতেছিলেন, এই যে নিজের সত্যের জন্য জিদের বশে সন্তানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, এর ফল যেন সুফল হয়!—এর জন্য ভবিষ্যতে যেন তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে না হয়। মনে

মনে আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, কেনই বা তা হইবে? অমন সুন্দরী শান্তভাব মেয়েটী, এর পর ওর রূপেই যে সব ক্ষোভ ভুলে যাবে। ছেলে ত আর আমার তেমন নয়! এই ত! মাকে কি ডিঙ্গোতে পারলে? না না,—সব ভাল হয়ে যাবে, ভগবান সব ভাল কর্ব্বেন!

ফুলশয্যার রাত্রে নিজের মনের একান্ত অশান্তি পূর্ণ দুর্ব্বলতায় সলিল নববধূর সঙ্গে একটীও বাক্যালাপ করিল না। বধূটী যে তার পাশেই আছে, সে কথাটাও হয় ত তার সর্ব্বক্ষণ মনে থাকিতেছিল না. দুএকবার শুধু বধূর অলঙ্কার-শিঞ্জন-ধ্বনিতে চকিত হইয়া উঠিয়া তার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা গভীর স্মৃতিব্যথা ভরা দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই উত্থিত হইয়া আসিতেছিল। হায় আরতি! কোথায় তুমি? তোমার স্থানে আজ চোরের মত আসিয়া ঢুকিল এ' কে?

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই সলিল টপ করিয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। পাশের আলনা হইতে সার্টটা লইয়া গায়ে পরিতেছে—পরা হইলে বাহিরে যাইবে, এমন সময় ঝমর ঝম্ করিয়া একসঙ্গে চুড়ি বালা বাঁকের ঘুমুর ও পায়ের পাইজোর বাজার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তার নূতন বধূ বিছানায় উঠিয়া খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে। মুখে তার এখন আর সেই সুদীর্ঘ ঘোমটা নাই,—চোখের উপর পর্য্যন্ত মাথার কাপড়টা ঈষৎ নামানো আছে মাত্র। সলিল মুখ ফিরাইতেই তার সঙ্গে চোখে চোখে মিলিত হইলে সে ঈষৎ সলজ্জভাবে চোখ নামাইয়া লইল, কিন্তু মুখ ঢাকিল না। সলিল বরঞ্চ মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতহস্তে সার্টের বোতাম আঁটিতে লাগিল,—এ ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইতে পারিলে আপাততঃ সে যেন বাঁচে। দিনের আলোয় ইহাকে এত কাছে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যের অশান্তির ইন্ধন আবার যেন জোরের সঙ্গেই জলিয়া উঠিয়াছিল। তার বুকের মধ্যের অর্দ্ধ-প্রশমিত অশান্তির ক্রন্দন কলরোলে জাগিয়া উঠিল।

"শোন"—

সলিল দোর খোলার জন্য দোরের হাতল ধরিয়াছিল, হাত ছাড়িয়া দিয়া সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইল। এ সম্বোধন নিশ্চয়ই তাহাকে,—কারণ আর তো কেহ ঘরে নাই! কিন্তু এও কি সম্ভব?

দেখিল, নববধূ তার দিকে অসঙ্কোচে চাহিয়া আছে। সলিল ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে কহিল, "তুমি যাচ্চো?"

অগত্যা সলিল ফিরিয়া আসিল। খাটের কাছে আসিয়া ঈষৎ বিব্রত বিপন্নভাবে দাঁড়াইয়া কহিল, "না, কেন?"

বধূর গালদুটী পাকা ডালিমের মত লাল হইয়া উঠিল, সে দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল,—

"আমার সঙ্গে তো তুমি কোন কথাই কইলে না? কিন্তু আমি শুনেচি, সকলেই কয়।"

সলিল বিস্মিত কৌতূহলে তার নববিবাহিতাকে দেখিতেছিল। এর আগে একে সে সত্যকার দেখা দেখেই নাই। হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! মা যে বলিয়াছিলেন, লক্ষের মধ্যে একটা—তা'ও অসম্ভব নয়। যেমন রং তেমনই নধর গঠন। চোখ দুটীকে পটলচেরা বা পদ্মপলাশ বলাও চলে। ঠোঁটের সূক্ষ্মতা কিসের সঙ্গে তুলনীয়—সলিলের হঠাৎ তা' মনে পড়িল না। তবে কবিরা বোধ করি গোলাপ-পাপড়ির সঙ্গেই এর উপমা দিতেন। তার বিদ্রোহের ঝটিকাক্ষুব্ধ বুকের মধ্যে ঈষৎ একটা বাসন্তী-শিহরণ বহিয়া গেল। স্মিত-কৌতুকে মৃদু হাসিয়া সে উত্তর করিল "তাই না কি? সক্কলেই কয়? তা' তো আমি জানতুম না! তুমি কি করে জানলে?"

বধূ কহিল "কেন? আমার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেচি। তাদের বরেরা সব্বাই ফুলশয্যার রাত্রে প্রথমেই তাদের সঙ্গে কথা কয়েচে। তারা আমায় সমস্ত কথাই বলেচে কি না।"

সলিল কহিল "আহা! তা কি আমি জানি! কেমন করেই বা জানবো বল? আমার তো আর এর আগে একদিনও ফুলশয্যা হয় নি।"

কথাটা সে ব্যঙ্গ করিয়া হাসির সুরে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষের দিকে তার গলার স্বরে একটা মৃদু কাঁপন দেখা দিয়াছিল। তার মনে পড়িতেছিল এর কত আগেই সে তার মানসী প্রিয়াকে উদ্দেশ করিয়া কত কথা, কত কল্পনা, কত কাব্যই না রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। এ যদি আরতি হইত, তবে কি আজ তার কথার কোথাও আর শেষ থাকিত?—

স্বর্ণলতা ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া ফেলিল। হাসিটী তার বড় মিষ্ট! দাঁতগুলি যেন মুক্তা গাঁথা। এমন নিখুঁত রূপসী বড় একটা চোখে পড়ে না! সে হাসিয়া বলিল,—"ফুলশয্যে আমারও তো আর আগে হয় নি, তবে আমার বন্ধুদের হয়েচে।—তোমার বুঝি একটীও বন্ধু নেই?"

সলিল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "না"—

সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া স্বর্ণ কহিল "ওঃ, তাই তুমি জান্‌তে না।"

মনের মধ্যে সমাগত অশান্তির ভারটাকে জোর করিয়া চাপিয়া ফেলিয়া সলিল কৌতুক-স্মিতমুখে স্বর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তাদের বরেরা কি কথা বলেছিল, বল ত, শিখে নিই।"

স্বর্ণকে তার বড় ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বিদ্বেষ কমিয়া সহানুভূতি দেখা দিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

স্বর্ণলতা একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিল। তার ঝুলানো পায়ে হয় ত ঝিন্‌ঝিনা ধরিয়া থাকিবে, পাখানাকে টানিয়া তুলিয়া খাটের উপরেই ছড়াইয়া দিল। সলিল দেখিল 'পদপল্লব-মুদারম্' বলিয়া কোলের উপর যে পা'কে মুগ্ধ পুরুষে টানিয়া লয়, এ ঠিক সেই গড়নেরই পা বটে!

স্বর্ণ উত্তর করিল "সব্বাই কি এক রকম কথা বলে ? যার যেমন ইচ্ছে হবে, তাই না সে বলবে ? এ' ত ইস্কুলের পড়া নয় !"

বাঃ, রসিকতা করিতেও যে জানে! নাঃ-যতটা ছেলেমানুষী দেখাইতেছে, ততটা হয় ত বা সে নয়! বেহায়া কি ? তাও তো মনে হইতেছে না ! বেশি সরল হয় ত ?

সলিল তার সেই ছড়ানো পাখানার অনতিদূরে খাটের ওপরেই আসন গ্রহণ করিয়া এবার একটু কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দু একজনের কথাই তো বল, শোনা যাক। পাখীরাও তো শুনে শুনে শেখে, আমাকেও না হয় একটু শিখিয়ে দিও।"

স্বর্ণ পা সরাইয়া লইয়া উহার কাছে আপনিই একটুখানি সরিয়া আসিল ; মাথার কাপড়টা আরও একটুখানি কম করিয়া দিল। তার পর সলিলের যে ধুতীর অংশটা তার হাতের কাছে আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তার কোঁচকান জরির পাড়টাকে টানিয়া টানিয়া সোজা করিয়া দিতে দিতে তার দিকে না চাহিয়াই বলিতে লাগিল, "তাহলে নিশীথবাবুর কথাটাই বলি। সে হচ্চে আমার চাঁপাফুলের বর। চাঁপা-ফুলকে তো বাসর ঘরে দেখেছ ? তাকে দেখতে বেশ সুন্দর, নয় ?"

সলিল বলিল, "তোমার মতন নয়, তা বলে।" এটা সে ঠাট্টার ছলে নয়, সত্য করিয়াই বলিল। যতই দেখিতেছিল, এর রূপ তাকে বিস্মিত করিতেছিল।

স্বর্ণলতার গালদুটী লজ্জাজড়িত সুখের আভায় লাল হইয়া উঠিল। সে একটুখানি স্মিত হাস্যে সলিলের মুখে একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এ কথার উত্তর করিল, "তা' না হলেও মোটের উপর তাকে দেখতে তো ভালই ? ওর বর কিন্তু ঘুটঘুটে কালো।"

"আহা ! সত্যি !" বলিয়া সলিল একটুখানি বিস্ময়ের অভিনয়

করিল। মনের মধ্যে অবশ্য তার এর জন্য কোনই লোকসান বোধ হয় নাই।

বধূ উত্তর করিল "হ্যাঁ, খুবই কালো। শুধু তাই না, দেখতেও তাকে ভাল নয়। তাই জন্যেই সে ফুলশয্যার রাত্রে যেমন একলা হয়েচে, অমনই চাঁপাকে বলেচে, 'আচ্ছা, আমি যে এমন কুৎসিত, আর তুমি অত সুন্দরী, তা আমি তোমায় ছুঁলে তোমার ঘেন্না করবে না ত?'"

এই বলিয়া স্বর্ণলতা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ কহিল,—"কিন্তু চাঁপাফুলকেও খুব মেয়ে বলতে হয়! তারও উত্তরটী যেন জোগান ছিল, সে কি বল্লে জানো? সে বল্লে, 'ঐ কালোর জন্যেই তো রাধা কুলমান ছেড়ে দিয়ে কালিন্দীর কূলে ছুটেছিল,—কালো কি এতই তুচ্ছ?' আচ্ছা বেশ বলে নি?"

সলিল বলিল "বাঃ! খাসা বলেচেন তো! আচ্ছা আমিও না হয় ঐ কথাটাই তোমায় বলি? কি বল?"

স্বর্ণ হাসিয়া এবার ধুতির পাড় নাড়া ছাড়িয়া খাটের গদীর উপর চাপিয়া রাখা সলিলের ডান হাতের অনামিকায় সন্নিবিষ্ট হীরার আংটীটার হীরাখানা খুঁটিতে খুঁটিতে উত্তর করিল, "তা বল্লে মানাবে কেন? তুমি নিজেও যে সুন্দর!"

সলিল বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "আমি! সত্যি? নাঃ! কে বল্লে?"

স্বর্ণ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আহা! তা' যেন জানেন না! বাড়ীতে তোমার এত বড় বড় আয়না, তারা কি তোমার সঙ্গে ছলনা করে? তুমি তো খুবই সুন্দর!"

সলিল ঈষৎ হাসিল, লজ্জায় তার কপোল ও ললাট রাঙ্গিয়া উঠিল। তার পর কহিল "তাহলে আমায় তোমার মনে ধরেচে?"

স্বর্ণর মুখ সলজ্জ হাস্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। সে তখন সলিলের সেই হীরার আংটীপরা আঙ্গুলটার হীরার মতই উজ্জল সাদা নখটাকে নখ দিয়া খুঁটিতেছিল, তদবস্থাতেই নতমুখে উত্তর করিল "কেন হবে না?"

এই কথা বলিয়া সে স্পন্দিত বক্ষে কিসের জন্য যেন একটু প্রত্যাশাপন্ন-ভাবে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। তার পর ক্ষণপরে যেন আশাহত এবং সুপ্রচুর বিস্ময়াম্বিত হইয়া একেবারে স্বামীর মুখের উপর বিস্ময়াহতবৎ চাহিয়া দেখিল। এত বড় একটা অভিব্যক্তির পরেও যে এমন স্তব্ধ অনড় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, এরকম ধারার কোন পুরুষের খবর এই মেয়েটীর বোধ করি বা তার বন্ধুমহল হইতে জানা ছিল না!

সলিলের মুখে চোখে একটা উৎকট বেদনার তীব্র ছাপ দাগিয়া উঠিয়াছিল। এই অনভ্যস্ত নারী-করস্পর্শে একদিকে তার পুরুষের দেহ মন যেমনই সুখ শিহরণে স্পন্দিত হইয়া উঠিতে গিয়াছিল, অমনই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী হাতের ক্ষণস্পর্শ স্মৃতি তাহাকে আর এক দিক দিয়া অগ্নিময় স্মৃতির কশায় লাঞ্ছিততর করিয়া দিল। আরতি! আরতি! ওঃ পাষাণি! এতটুকু যদি দয়া করিতে! এত করিয়াও কি একবিন্দু ভালবাস নাই?—অথচ এই মেয়েটী দুদিন পাইয়াই তাহাকে পছন্দ করিতে পারিল! তবে সে তো তত কিছু মন্দ নয়!—তত বেশি তুচ্ছ নয়!

স্বর্ণলতার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে নিজের হাতখানি অভিমানে সরাইয়া লইল। একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিল,—

"বুঝেছি, আমাকেই তোমার মনে ধরে নি।"

সলিল এবার চমকাইয়া উঠিল।—তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতই সচমকে তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "সে কি? কে বল্লে? না না, তুমি এত সুন্দর, কেন আমার তোমাকে মনে ধরবে না?"

স্বর্ণ কহিল "তাহলে হয় ত আমি গরীবের ঘরের মেয়ে বলে তোমার আমাকে ঘেন্না করচে, তাই হবে। তাই জন্যেই"—

"তাই জন্যেই কি? এসব তুমি কোথায় পেলে?" সলিল কিছু বিব্রত হইয়া উঠিল।

স্বর্ণ ম্লান স্বরে কহিল, "তাই জন্যে তোমার মনে সুখ নেই, বাসর ঘরে কারু সঙ্গে কথাই কইলে না, তোমায় এ পর্য্যন্ত একবারও হাসতে দেখিনি; কিন্তু আমরা যে গরীব,—আমার বাপ নেই, সে কথা তো তোমরা আগে হ'তেই জানতে!"

সলিলের মুখ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। এ মেয়েটীকে যতটা ছেলেমানুষ বা সরল বোধ হইয়াছিল, ঠিক হয় ত এ তা' নয়! নিজের অধিকার এ দাবী করিতে জানে। সে বিপন্নভাবে কহিল "ছিঃ, ও কথা মনে করতে নেই! ও সব কিছুই নয়। শরীরটাই আমার ভাল নেই, তাই হয় ত কথা কইতে পারিনি বেশি।"

স্বর্ণ কহিল, "সেই জন্যেই বুঝি এখন বিয়ে করতে তোমার মন ছিল না? সেও আমি শুনেচি,—তোমার মার জন্যেই শুধু হলো।"

সলিল তখন ইহার কাছে সমধিক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া নিজের সেই অপ্রকাশ্য লজ্জা চাপা দিবার জন্য উপায়ান্তরের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল,—

"আচ্ছা, তুমি কতদূর পড়াশোনা করেচ? স্কুলে যেতে বোধ হয়?"

সলিলকে কথা উল্টাইতে দেখিয়া স্বর্ণ ঈষৎ হাসিল, তার পর তার প্রশ্নের জবাব বলিল, "ইস্কুলে গেলে খারাপ হয়ে যায় বলে বাবা তো আমাদের ইস্কুলে যেতে দিতেন না। ঠাকুরমার পিসি লেখা পড়া শিখে বিধবা হন, তাই জন্যে লেখাপড়া মেয়েমানুষকে আমাদের বাড়ী শেখানও হয় না। এই এখানে বিয়ে হবে বলে মাস খানেক আগে থাকতে আমায়

পেরথম ভাগটা ধরানো হয়েছিলো, তাইতে শৃগাল কষাণ এইগুলো অবধি আমার পড়া হয়েচে।"

ইহার পর আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার কথা সলিলের মনে আসিল না; এবং তার অল্পে অল্পে মন্দীভূত বিদ্বেষের জ্বালা পুনশ্চ পূর্ণ বেগে প্রত্যাবৃত হইয়া গেল।

কিন্তু রূপজমোহ এবং স্বত্বাধিকারের প্রবলতম দাবী তার পূর্ব্ব নির্লিপ্ততাকে একটুখানি ক্ষয় করিয়া আনিয়াছিল। সেটুকুকে সে আর ভরাইয়া লইতে পারিল না। মনটা একটু নরমই রহিয়া গেল।

২৩

যে বৌকে অত কাণ্ড করিয়া ঘরে আনা হইল, তাহার সংস্কার ও সংগঠনের ভার মহামায়া পূর্ণোৎসাহেই নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন; এবং একান্ত ভাবেই তাহার শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। স্বর্ণলতা প্রথম ভাগের মিশ্র বানানগুলি সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছিল, বেশি দূর তখনও অগ্রসর হইতে পারে নাই। মহামায়া নিজেই আহারাদির পর তাঁর স্বল্পবিশ্রাম অবসরে বধূকে লইয়া পড়াইতে বসিতেন। শুধু পড়ানই নয়,—নামতা, কড়াকিয়া, গনকিয়া প্রভৃতি ধারাপাতের প্রাথমিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গেই ইংরেজির A B C D ধরাইয়া, দশ দিনের মধ্যেই হায়রাণ হইয়া পড়িয়া, তাঁর বাড়ীর সবচেয়ে পুরাতন কর্ম্মচারীকে বধূমাতার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। এদিকে গান বাজনা, সেলাই, বোনা ও সংসারিক কাজ কর্ম্মেরও শিক্ষা চলিতে লাগিল। এগুলি মহামায়া নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া একজন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা শিক্ষা

দিতে লাগিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়—বৎসর কাটিলে দেখা গেল, বৌমার দ্বিতীয় ভাগের বানান দোরস্ত হইল না, ফার্ষ্টবুকের ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত পড়া অগ্রসর হইয়া বারেবারেই পিছনে ফিরিয়া আসিতে লাগিল ; এবং নামতায় ক্রমাগত ভুল করিতে করিতে দশের কোঠা পর্য্যন্ত উঠিয়াই ও-বিদ্যা আর কিছুতেই উপরের দিকে উঠিতে না চাওয়ায়, অগত্যা ঐখানেই ইতি করা হইয়া গেল।

মহামায়া তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। শিক্ষকের পর শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীর পর শিক্ষয়িত্রী বদল করা হইতে লাগিল। দিন কতক ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন মেমকে পর্য্যন্ত রাখা হইল। কিন্তু স্বর্ণ মেম দেখিয়া এমনই জড়াইয়া যায় যে, তার যেটুকু বা বুদ্ধি শুদ্ধিও থাকে, তাও যেন লোপ পাইতে বসে। মেমের মুখের ইংরেজী তো দূরের কথা,—তার ভাঙ্গা বাংলার বুলিও সে একবর্ণ ধরিতে পারে না,—উল্টিয়া ভয়ে ভাবনায় ঘাবড়াইয়া তার মাথা ধরিয়া উঠে ও গা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে থাকে। এমন কি, এই মেম-বিভ্রাট এড়াইবার চেষ্টায় সে নিত্য নিত্য রোগের অছিলা তুলিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া মহামায়া মেমকে বিদায় দিয়া আর একবার নিজের হাতেই বধূ-শিক্ষার মহাভার গ্রহণ করিলেন, এবং এবারেও সেবারের মতন অল্প দিনের মধ্যেই হালছাড়া হইয়া আবার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মনে মনে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইল যে, মুখের ও দেহের উপরটা আশ্চর্য্য সুন্দর হইলেই তার ভিতরের দিকটাও যে তেমনই সৌন্দর্য্যময় করিয়া সৃষ্টি করা থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্ত্তার বিধানে করা নাই, এবং উপরের সৌন্দর্য্যের চাইতে ভিতরকার বুদ্ধি-বৃত্তিটাই সংসার চলিবার পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়।

স্বর্ণলতাও ঐ বাড়ীতে আসিয়া যতটা আনন্দ বোধ করিয়াছিল,

কার্য্যক্ষেত্রে তার সে আনন্দটাতেও অনেকখানি গলদ ঘটিতেছিল। ছোটবেলা হইতে সে ঠাকুরমায়ের বিশেষ আদুরে। আমাদের দেশে আদুরে মেয়ের পরিচয় দিতে গেলে আমরা প্রায়ই বলি, 'অমুক এত আদরে মানুষ হয়েছে যে, জলঘটিটা কখনও গড়িয়ে খায়নি'। তা স্বর্ণের বেলায় এই উপমাটা ঠিক চৌচাপটেই খাটিয়াছিল। বাস্তবিকই সে তার বাপের বাড়ীতে কোনদিনই 'জলঘটিটা গড়াইয়া' পান করে নাই,—আর কিছু করা তো দূরের কথা। একে বাড়ীর প্রথম মেয়ে, তায় অপূর্ব্ব সুন্দরী,—তার উপর কম বয়সেই বাপ মারা গেল। ঠাকুরমা পুত্র শোকের গভীর উচ্ছ্বাসে প্রাণ মন দিয়া পুত্রের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া ইহাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। চির আদুরে স্বর্ণলতা এখন তাঁর চক্ষের মণি, বক্ষের পাঁজর হইয়া উঠিল, তার প্রশ্রয় ও প্রতিপত্তির সীমা রহিল না, এবং সেই অসম্ভব আদরে তাহাকে সব দিক দিয়া যেন পঙ্গু করিয়া রাখিল। অতখানি বয়স পর্য্যন্ত সে কখনও নিজের হাতে ভাত খায় নাই, একলা ঘরে শুইলে পাছে ভূতের ভয়ে ডরাইয়া উঠে, তাই ঠাকুরমার গলা ধরিয়া তাঁকে পাশবালিস করিয়া না শুইলে তার ঘুম আসিত না। বঁটি, জাঁতি এই সব মেয়েলী অস্ত্রে পাছে সে কাটিয়া খুন হয়, সেই ভয়ে স্নেহময়ী ঠাকুরমা তাকে কোন দিনই ওসব স্পর্শ করিতে দেন নাই। বিধবা মা একাদশীর উপবাস করিয়া অসুস্থ শরীরে রান্না করিয়াছেন,—আইবুড় কচি মেয়ে পাছে পুড়িয়া যায়, সেই আশঙ্কায় মেয়ের ঠাকুরমা মেয়েকে কোন দিনই মায়ের এতটুকু সাহায্য করিতে পাঠান নাই, মাও কখন দাবী করেন নাই। এমনই করিয়াই নিরাপত্তিতে, নিরুদ্বেগে তার জীবনযাত্রা চলিতেছিল। কাজের মধ্যে ছিল পাড়া বেড়ান এবং পুতুলখেলা বা বৌ বৌ খেলা—আর না হয় তাস্ বা গোলকধাম। ঠাকুরমা যখনই কোন তীর্থে গিয়াছেন, উভয়তঃ আকর্ষণে অথবা কাঁদিয়া কাটিয়া স্বর্ণ তাঁর সঙ্গ লইয়াছে। যেখানে যেটী

ভাল জিনিষ পাইয়াছেন, সাধ্যাতীত হইলেও ঠাকুরমা নাতনীর জন্য কিনিয়া দিয়াছেন। এর জন্য হয় ত তাঁর আফিং ও দুধের পয়সায় টান পড়িয়াছে। তাই স্বর্ণ জানিয়াছিল, পৃথিবীতে সে একটা বিশেষ দাবী লইয়াই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এর সর্ব্বত্রই তার পাওনা আছে, দেনা নাই। তার পর ধনী-গৃহিণী মহামায়ার যাচিয়া সাধিয়া তাকে তাঁর বিদ্বান সুন্দর সুস্থ ছেলের জন্য বিনাপণে ঘরে আনায়, সেটা সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত পরিবারের সঙ্গে স্বর্ণেরও ইহাতে গর্ব্বের সীমা ছিল না; এবং সে তাঁদের মতই এর জন্য তার অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যকেই পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়াছিল।

কিন্তু এখানে আসিয়া স্বর্ণলতা সর্ব্বপ্রথমে আঘাত খাইল তার নিজের স্বামীর কাছেই। যে সোনাকে দেখিলে তার বন্ধুদের স্বামীরা তার উপর হইতে তাদের চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না, পথে বাহির হইলে তাকে দেখার জন্য ভিড় জমিয়া যায়, সেই রূপসী স্বর্ণকে নিজের করিয়া লইয়াও তার স্বামী যেন তার দিকে চাহিয়া দেখার অবসর করিতেই পারিতেছিলেন না! এত কিসের তাঁর ব্যস্ততা বা নির্লিপ্ততা? সংসারের কাজকর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে আর যতই কেন না অজ্ঞ হোক, নব-বিবাহিত পুরুষদের সম্বন্ধে স্বর্ণলতা মেয়েটীর অনভিজ্ঞতা আদৌ ছিল না। তার মিতিন, সই, চাঁপাফুল, মিষ্টিহাসি, চাঁদের আলো এবং ফাগের বর কয়টী তার অভিজ্ঞতার কেন্দ্র—এদের পরিচয় সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সবই পাইয়াছিল। কিন্তু তার নিজের স্বামীটীর সঙ্গে এদের মধ্যের কাহারও যেন কোনখান দিয়াই মিল ছিল না। তারা ফুলশয্যার রাতে নিজেরা যাচিয়া কথা কহিয়াছে,—অযাচিত হইয়াই স্ত্রীকে সোহাগ করে, ছুতায় নাতায় স্ত্রীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, সময়ে অসময়ে আড়াল পাইলেই একটী কথা, একটু হাসি, এতটুকু স্পর্শ বিনিময় করিয়া যায়। তাদের মনোজগতে যেন ঐ একটী তরুণী, একটী কিশোরী,

বা যুবতীই 'সৃষ্টিরাদ্যা বিধাতুঃ'। যেখানে যা পায়, এরই জন্য সঞ্চয় করে, যেখানে যা দেখে, এরই কাছে নিবেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সুন্দরী স্বর্ণলতার স্বামী কিন্তু ঠিক এ-রকম নয়, সেটা স্বর্ণ তার প্রথম শুভদৃষ্টির সময়েই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল। বাসরঘরে তার আর কোনই ভুল ছিল না। পাঁচজনে বলিল, বড় লোকের ছেলে—এ বাড়ীতে এসে ওর ঘেন্না করচে ;—সেও তাই বিশ্বাস করিয়াছিল ; কিন্তু নিজে সে তার রূপবান স্বামীটীকে সম্পূর্ণভাবেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সে পুরুষের মধ্যে এর আগে এত ভাল চেহারা দেখে নাই ; অথচ শুনিয়াছিল, তার বাপের চেহারা অত্যন্তই সুশ্রী ছিল,—সে নিজে তার বাপের মত দেখিতে হইয়াছে। নিজে রূপসী বলিয়া তার মনে একটু সঙ্কোচ ছিল, পাছে তাকেও তার চাঁপাফুলের মত বর, কালো কুৎসিত বর আসিয়া আয়ত্ত করে। চাঁপা যা তার বরকে জবাব দিয়াছিল, সে হয় ত তা পারিত না, হয় ত কাঁদিয়া ফেলিত।

তা' শিবঠাকুর তো বরটী খুব ভালই দিয়াছিলেন। বয়স কম, চেহারা ভাল, ঐশ্বর্য্যও যথেষ্ট, জা ননদ পাঁচটা ঘরে নাই। ঠাকুরমাও তো এতদিন ধরিয়া ঠিক এই রকমটাই খুঁজিতেছিলেন,—কিন্তু সব হইলেও স্বর্ণর মনে একটা ভারী খুঁৎ রহিয়া গেল,—সেটা তার সঙ্গে সলিলের কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক খাপছাড়া ব্যবহার। এদিকে সে তাকে যত্ন স্নেহ না করে তা'ও নয়,—কথাবার্ত্তা বেশ সরস করিয়াই কয় ; কিন্তু তবু যেন তার এই ব্যবহারের মধ্যে তার বন্ধু-পতিদের ব্যবহারের ছায়াপাত করে না। এ যেন আর এক ধরণের আর এক জগতের জিনিস। স্বর্ণ-লতার যেন এর সঙ্গে সঠিক পরিচয় ছিল না, আজও নাই। এর যেন একটা সীমা টানা আছে,—মাপ আছে,—গণ্ডী দিয়া এ যেন একটুখানি সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই ঘেরা,—এদের বাহিরে তার যেন এতটুকুখানিও জায়গা

নাই—এটা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে। সুন্দরা যখন আসে, সলিল কতখানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া তাঁর দিদির সঙ্গে অনর্গল কথা কয়,—হাস্যপরিহাস, গল্প-গানে দুই ভাই-বোনে কি মশগুলই হইয়া থাকে। মার সঙ্গে সলিলের কথার কখন শেষ হয় না। কত কট্‌মটে, খট্‌খটে শব্দ দিয়াই তারা যখন তখন মাতাপুত্রে বাক্যালাপ করে। এক এক দিন খাতাপত্র ও দেওয়ানজীকে লইয়া তাদের অর্দ্ধেক রাত্রিই কাটিয়া যায়,—স্বর্ণ বিছানায় জাগিয়া পড়িয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় ছটফট করিতে থাকে, মা হয় ত বারেবারেই ছেলেকে শুইতে যাইতে আদেশ দেন,—সলিলের দৃক্‌পাত নাই,—সে খাতা পড়িতেছে, মন্তব্য করিতেছে, মধ্যে মধ্যে হাসিয়া উঠিতেছে,—উঠিবার আগ্রহই নাই! হয় ত বিছানায় ঢুকিয়া চুপচাপ শুইয়াই পড়িল। নয় ত স্বর্ণর জাগ্রতাবস্থা জানিতে পারিয়া তার দিকে ফিরিয়া একটু আদর দেখাইয়া বলিল,—

"এত রাত অবধি তুমি জেগে আছ? এখন ঘুমাও। আমায় আবার ভোরে উঠে একটু কাজে যেতে হবে।"

অভিমানে স্বর্ণলতার গলা বুজিয়া চোখ ভরিয়া উঠে, সে তাহার সকল প্রত্যাশা ভুলিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে।

এর উপর তার আরও বেশি জ্বালা হইয়া উঠিয়াছিল—তার শাশুড়ী। এই স্নেহময়ী শাশুড়ীই তো তাকে নিজে দেখিয়া আদর করিয়া কাছে আনিয়াছেন,—সে কি এই রকম করিয়া তাকে দগ্ধিয়া মারিবার মতলবে? এতখানি বয়সের মেয়ে সে, এখন কি না ছোট্ট একটী স্কুলের ছেলের মত সে দিন নাই রাত নাই, বই পড়িবে, নামতা বলিবে, শ্লেট পেনসিল লইয়া ক খ, এবং A B C লিখিবে! লজ্জায় যে মরিতে ইচ্ছা করে! মুখ দিয়া তার speed বা spleen শব্দটা হয় ত কিছুতেই বাহির হইতেছে না,—

মাষ্টার মশাই কখনও নরমে কখনও গরমে বারবার করিয়া বলিয়া দিতেছেন,—হয় ত দরজার সামনে দিয়া সলিল একটুখানি টেপা হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে দেখা হইলে হয় ত বা সেই রকমই ব্যঙ্গভরে মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কি সোনা! spleenটা আয়ত্ত হলো, না হলোই না?"—এই কি পত্নী-সম্ভাষণ? কোথায় তার মত সুন্দরীকে আদরে সোহাগে বুকে বুকে মুখে মুখে রাখিয়া মুগ্ধ চোখে চাহিয়া থাকিবে, তা' নয়, তার মূর্খতা লইয়া যখন তখন আভাসে ইঙ্গিতে পরিহাস ও তাচ্ছিল্য! স্বর্ণলতার আত্মাভিমান গুরুতর রূপেই আহত হইতে লাগিল। তার এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই যেন এই শিক্ষাশাসনের দ্বারা দিনে দিনেই নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। শাশুড়ীর প্রাণপণ চেষ্টা যত্নকে তার কঠোরতা বলিয়াই ঠেকিল,—তার মন তাঁর প্রতি একান্ত ভাবেই বিরূপ ও বক্র হইয়া উঠিতে লাগিল। সেও যথাসাধ্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধরিবার জন্যই তৈরি হইয়া রহিল। ইচ্ছা করিয়া সে তার শাশুড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যেও যাইতে চাহে না; তিনি ডাকিয়া লইলেও তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসে, ঝিয়েদের কাছে বলিয়া দেয়, "বল গে, আমি শুয়ে আছি, আমার শরীর ভাল নেই।" অথবা বলিয়া উঠে, "বাবা! একটু জিরোচ্ছি, তাও সইলো না! বড়লোকের বাড়ী পড়ার চেয়ে গরীব হওয়া ভাল। চব্বিশ ঘণ্টা অত তাড়া থাকে না বাবু!"

মহামায়া বধূকে আরও সব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনবিদ্যা শিখাইবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন; স্বর্ণ কিন্তু ইহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিল। সে রান্নার কথায় একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "হ্যাঁ রাঁধবো, গোবর নিকোব, পাইখানা ধোব,—বড়লোকের ঘরে এসে তো আমার সকল সুখই হয়েছে, রাঁধতে শিখলে এইবার বাড়ীর

হাঁড়ি হেন্‌সেলের ভার আমার গলায় এসে পড়ুক আর কি! আমি বাবু, রাঁধতে পারবো না।"

মহামায়া শুনিয়া মনের মধ্যে চটিলেও বাহিরে ধৈর্য্য হারাইলেন না, নিজে আসিয়া আদর করিয়া বধূকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, এ রান্না সে রকম নয়, তোমার ঘাড়ে কখন এত বড় সংসারের রান্নার ভার দিতে পারি? এ শুধু একটু একটু সৌখীন রান্না, খাবার করা—এ-সব ভাল ঘরের মেয়ে বৌকে শিখে রাখতেই হয়। সলিলকে সখ করে কোন দিন একটা রেঁধে খাওয়ালে, লক্ষ্মী মা আমার! সব তাতেই উল্টো করে দেখতে আছে কি?"

স্বর্ণ চোখ মুছিতে মুছিতে শাশুড়ীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাটা-কাটা করিয়া জবাব করিল—

"অত শেখার আমার দরকার নেই, আমি কি পুড়ে মরতে শেষে তোমাদের ঘরে এসেছিলুম? আগুন তাতে গেলে আমার মাথা ধরবে। রোজ রোজ মাথা ধরে আমার চুলগুলো সব উঠে যাক, যেমন আমার মার গেছে!"

মহামায়ার কথার উপর কেহ কখন প্রতিবাদ করিতে ভরসা করে নাই; তাঁর পরিবারস্থ সকলেই জানিত—এইটাই তাঁর সবচেয়ে অসহ্য। বধূর কথায় মুখখানা তাঁর রাঙ্গা হইল, কিন্তু তিনি আত্মদমন করিয়া লইলেন, শান্ত কণ্ঠেই কহিলেন,—

"এ তোমার ভুল বিশ্বাস বৌমা! সামান্য একটু রাঁধতে গেলে কারু মাথা ধরে না, মাথার চুলও উঠে যায় না। দেখনি কি সুন্দরার মাথায় কত চুল, ও তো বাড়ীর সমস্ত জলখাবার নিজের হাতে না ক'রলে থাকতে পারে না,—হাজারো লোক থাক, নিজেই করে।"

স্বর্ণলতা এই তুলনা-মূলক আলোচনায় বিরক্ত হইয়া কহিল "আপনাদের

অভ্যাস আছে, আমার নেই, কি করবো ? আগুন দেখলে আমার ভয় করে। আমি পারবো না।"'

আগের কালে অবস্থাপন্নের সংসারে দুস্থ আত্মীয়-আত্মীয়া অনেকেই আশ্রয় পাইত, এখনও কদাচিৎ পায়। মহামায়া তাঁর বাপকুলের এবং শ্বশুরকুলের অনেকেই তাঁর সংসারে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন,— শাশুড়ীকে এড়াইয়া স্বর্ণলতা তাঁদের মধ্যের কাহারও কাহারও সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিল। শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাঁদের কাছে সে বেশ তীব্র করিয়াই সমালোচনা করিত। বলা বাহুল্য, সেগুলি তার শাশুড়ীর কর্ণ-গোচর হইতে বেশি দেরি হইত না। আবার মহামায়া সে সব শুনিয়া যদি রাগ করিয়া কোন একটা কথাও বলিয়া উঠিতেন, তৎক্ষণাৎ সেটুকু বধূর কাণের গোড়ায় ফিরিয়া আসিত এবং সেই একটা কথার বিনিময়ে স্বর্ণ হাজারটা কথা শুনাইয়া দিত। এম্‌নই করিয়া বৎসর না ঘুরিতেই মহামায়া তাঁর স্বখাত সলিলে ডুবিয়া রীতিমতই হাবুডুবু খাইতে খাইতে তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং ভগবানের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—যেন বধূর সুমতি হয়, যেন ইহাকে লইয়া সলিল অসুখী হয় না, তাঁহার সঙ্গে সে যে ব্যবহারই করুক, সলিলকে যেন দুঃখ না দেয়। কতবারই মনে পড়িয়াছে সুন্দরার সেই কথা—"তার মা নেই, সে তোমার হ'য়ে যাবে, এ বিয়েয় সলিলও সুখী হ'বে"—

কতবার ইচ্ছা হইয়াছে সুন্দরাকে আরতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তার কি অবস্থা ঘটিয়াছে একটু জানিয়া লয়েন, কিন্তু লজ্জায় বাধিয়াছে। কতবার মনে হইয়াছে মেয়েটী হয় ত সুখী হয় নাই। হয় ত তারই দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সংসারে এই অশান্তি! কিন্তু উপায় কি? এ যে তাঁর সাধের কাজল পরা! মুখ যদি আজ তাতে কালো হইয়া উঠে, কে' কি করিবে?

২৪

আহারাদির পর দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামাবসরে উপরতলার একটা ঘরে সলিল কোচে শুইয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল। স্বর্ণলতা আসিয়া তার পাশে বসিল। তার সঙ্গে তার অঙ্গ হইতে সাবানের সুগন্ধ, কেশ হইতে কেশতৈলের সুরভি, চর্ব্বিত তাম্বুল হইতে জর্দ্দার সুবাস ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। তার হাতের গোছাভরা চুড়ির সঙ্গে সোনার রুলি এবং তারের বালার সংঘর্ষ-রব মৃদুমন্দ ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। এক কথায় রূপে রসে শব্দে গন্ধে তার স্বামী-গৃহ ভরপুর হইয়া গেল,—কেবল কি শুধু সে স্পর্শ করিতে পারিল না তার যুবক স্বামীর অধ্যয়ন-নিরত চিত্তকেই ?

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া অবশেষে স্বর্ণলতা তার স্বামীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া সাভিমান স্বরে বলিয়া উঠিল—

"কি এমন দরকারী খবর পড়চো গো ?"

সলিল ব্যগ্রভাবে কাগজখানা তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সেখানা নিজের পাশের ছোট টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে উত্তর দিল,—"থাক, থাক—ওটা দেখতে হবে, সুন্দর লিখছেন !"

স্বর্ণ একাডপে পান আনিয়াছিল, তাহা হইতে একটা লইয়া স্বামীর মুখের কাছে সেটা আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে কি বলেছে গা ?"

সলিল পানটা স্বর্ণর হাত হইতে লইয়া নিজেই নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কহিল, "মিঃ দাস, চিত্তরঞ্জন দাসের বক্তৃতা ওটা—"

স্বর্ণ ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, পানটা সে নিজেই সলিলের মুখে দিবে এই ইচ্ছাটাই তার মনের মধ্যে ছিল,—সলিল নিজেই হাতে লওয়াতে তার

মনে একটু অভিমানের উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু সলিলের উচ্চারিত ওই কথা কয়টায় হঠাৎ সে বিস্ময়চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা! তাই না কি? আমাদের চিতে বুঝি আবার বক্তিমে দিতেও শিখেছে! সত্যি! কি বলেছে গো?"

সলিলও সমান বিস্ময় ভরে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল,—"চিতে! 'তোমাদের—চিতে'? সে আবার কে?"

স্বর্ণ কহিল "কেন, এই যে তুমি বল্লে চিত্তরঞ্জন বক্তিমে করেচে? ওকে যে আমরা চিতে বলেই ডাকি কি না,—ভাল নাম চিত্তরঞ্জন, যেমন তোমারও একটা ভাল নাম আছে না? সব্বাই তো আর তাই বলে ডাকে না। বাড়ীতে আমাকেও তো আগে সবাই ঠাকুমার দেওয়া নাম নিস্তার বলেই ডাকতো—বিয়ের থেকেই না স্বর্ণলতা পাকা হয়ে গেলুম।"

সলিল অৰ্দ্ধ অবিশ্বাসে প্রশ্ন করিল, "ওঁদের বাড়ী কি তোমাদের দেশে? কই, না, তো!"

স্বর্ণ এই প্রতিবাদে অসন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিল,—"না বল্লেই হলো! ওদের বাড়ীখানা ঠিক আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ী। চাঁপাফুল তো ওরই আপন বোন। কত ফলসা পেয়ারা কুল ও আমাদের পেড়ে পেড়ে দিয়েছে তার ঠিক আছে! সাঁতার যা দেয়, মিত্তির পুকুরটা বর্ষার জলেও এপার ওপার করতে পারে।"

সলিলের মুখে বিদ্রূপের সহিত একটা বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে পরিত্যক্ত কাগজখানা পুনশ্চ তুলিয়া ধরিয়া তাহার সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্যারায় মনোযোগী হইয়া উত্তর করিল,—

"এ তোমাদের সে চিতে নয় গো—ইনি একজন মস্ত বড় পেট্রিয়ট, এঁর নামও কখনও শোননি?"

স্বর্ণ স্বামীকে পড়ার দিকে মন দিতে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাঁহার

স্বরের অসন্তুষ্টি অনুভব করিয়া মৃদু সঙ্কুচিত হইল, আস্তে আস্তে কহিল,—

"না, কই শুনিনি ত। চিত্তরঞ্জন তো ওই একজনকেই জানি।"

এই উত্তরে সলিলের গা জ্বলিয়া গেল। সে রূঢ়কণ্ঠে "খুব জানো, যথেষ্ট জানো,—আর কিছু না জানলেও তোমার এ জন্মটায় চলে যাবে।" বলিয়া ছাড়া প্যারার উপর তীব্র ভাবে চোখ বুলাইতে লাগিল, কিন্তু মনের ভিতরে তার যে অবমানিত ক্ষোভ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল, সে আর তাহাকে তাহা হইতে পূর্ব্বের মত সৌন্দর্য্য আহরণ এমন কি অর্থ পরিগ্রহ পর্য্যন্ত করিতে দিল না। আহত অন্তঃকরণ কেবলই বুকের উপর ঘা মারিয়া বলিতে লাগিল, এ কি স্ত্রী! একটা রূপী বাঁদর, একটা চক্‌চকে পাখ্‌নাওলা ময়ূর, হাঁস, চন্দনা—ছ্যা!

যতই দিনের পর দিন যাইতেছিল, নূতন যতই পুরাতন ও অচেনা যতই পরিচিত হইয়া উঠিতেছিল, স্বর্ণলতার শিক্ষাহীন গ্রাম্যতা দিনে দিনেই যেন সলিলকে বেশি করিয়াই পীড়িত করিতেছিল। আরতিকে সে ভুলিতে পারে নাই, আরতিকে ভুলিতে পারা তার পক্ষে সম্ভবও নয়;—কিন্তু স্বর্ণলতার রূপে সে একটুখানি আপনাকে ভুলিয়াছিল। স্বর্ণ যদি অত-খানি আদরের পুতুল না হইয়া একটুখানি মানুষের মতন হইত, সে যদি তাদের মাতাপুত্রের একটুখানি মনের মতন হইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করিত, তাহা হইলে ভিতরে একটা অনারোগ্য রোগের অশুষ্ক ক্ষত বাকী থাকিয়া গেলেও উপরটায় তার একটা শীতল প্রলেপের ঢাকা দেওয়া শান্তি জাগিয়া উঠিতে পারিত; কিন্তু স্বর্ণলতা কোন দিনই এমন কোন শিক্ষা পায় নাই, যাহাতে সে পরের মনের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে। সে জানে সে সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী। সে শুনিয়া আসিয়াছে, তাহাকে যে লাভ করিতে পারিবে, সে ভাগ্যবান,—সে তপস্যা করিতেছে। অতএব যে

তাহাকে লাভ করিয়াছে, তাহাকে আপনার বলিবার, বুকে ধরিবার অধিকার পাইয়াছে, সে নিজেকে কৃতার্থম্মন্য ভাবিয়া কিসের জন্য সর্ব্বদা মুখে মুখে বুকে বুকে রাখিয়া সোহাগে আদরে ভরাইয়া দেয় না? সে কেন তাহাকে অতি সাধারণ একজনের সঙ্গে সমান ওজন করিয়াই তার কাছ হইতে তার পাওনা আদায় করিয়া লইতে চাহে? সে পান সাজিবে, রাঁধিবে, বই পড়িবে, গান গাহিবে, সেলাই করিবে, সবই করিবে,—পাঁচজনে যাহা করে তাও করিবে, তার চাইতে বেশিও করিবে, এই জন্যেই কি সে অত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিল? না বড়লোকের বধূ হইয়াছিল? স্বর্ণলতার অভিমানী চিত্ত তার স্বামীর অবিচারে অত্যন্তই পীড়া বোধ করিতে লাগিল। তার উপর দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, স্বামীর উপর রাগ করিয়াও সে মোটে থাকিতে পারে না। তিনি অনেক সময়ই রাগ করিয়া কথা বন্ধ করেন, স্বর্ণ কাঁদিয়া কাটিয়া না খাইয়া শয্যা লইয়া শেষে যাচিয়া গিয়া ভাব করে। স্বামীকে সে একান্ত ভাবেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া ভালবাসিয়া বসিয়াছিল। সলিল যদি কোন বন্ধুবাড়ীর ভোজে, নিজের বাড়ীর কাজে দেরি করিয়া বাড়ী ফেরে, তার যন্ত্রণার সীমা থাকে না। রাত্রে যদি সে তাকে এতটুকু আদর করিতে ভুলিয়া যায়, সারারাত স্বর্ণ জাগিয়া থাকে, কাঁদিয়া কাটায়। ঠাকুমা যদি তাকে দুদিনের জন্যও লইয়া যাইতে চান,—অত তো আদরের ঠাকুমা—তাও সলিলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া স্বর্ণলতা যাইতে চাহে না। শেষে ঠাকুমাই তাকে এখানে আসিয়া দেখিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তার মা সুখের নিশ্বাস ফেলিয়াও ব্যথিত হইয়া বলেন,—

"বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিয়ে সোনা আমার একেবারেই পর হয়ে গেল! তা'হোক! জন্ম জন্ম সিথেঁয় সিদূঁর দিয়ে সেই ঘরই করুক।"

স্বর্ণ শুধু একটুখানি পছন্দ করিত সুন্দরাকে। সুন্দরার চরিত্র-

মাহাত্ম্যকে সেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। এই সুন্দরী নারী যখনই আসিত, তার জন্য রকমারি সৌখীন দ্রব্য আনিত। যতদিন থাকিত, তাকে নানা ছাঁদে সাজাইত, পরাইত,—ভাইকে ডাকিয়া তার নব নব সাজ ও সৌন্দর্য্য দেখাইত,—তার অনবদ্য রূপরাশির তারিফ করিত, ভাইকে দিয়া করাইত,—এবং সলিলের দিক হইতে তাহার প্রতি এতটুকু কোন ত্রুটীর আভাষ পাইলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া স্বর্ণর একান্ত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া দিত। এক দিন স্বর্ণ তার অন্তরের আনন্দোচ্ছ্বাস রোধ করিতে না পারিয়া সুন্দরার গলা জড়াইয়া বলিল,—

"ঠাকুরঝিমণি! লোকে কথায় বলে 'ননদিনী রায়বাঘিনী' কিন্তু কেন বলে ভাই? আমার তো মনে হয়, তোমার মত ননদ আমি যেন জন্মে জন্মে পাই—"

সুন্দরা গভীর স্নেহে ভ্রাতৃজায়াকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, তার কষিত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল ললাটে প্রগাঢ় স্নেহে একটী চুম্বন করিয়া কহিল,—

"তাই যেন পাস্ সোনা! আমিও এই রকম সোনার প্রতিমা ভাজ পেয়ে ধন্য হবো। আবার পাঁচ মাস পরেই যখন একটী সোনার পুতুল ভাইপো কোলে নোব, তখন কত আহ্লাদই হবে বল্ দেখি? দেখ ভাই! তোর খোকা হলে তার ভাতে আমি মাকে ধরে রূপার থালা সামাজিক করাবো। সল্লির বিয়েতে মা রূপোর সামাজিক করেন নি, এবার কিন্তু ছাড়বো না। আর তার কি নাম রাখবো জানিস্? সলিলের ছেলে হবে সুনীল। আর সলিলের যেমন একটা পোষাকী নাম আছে—সরোজ, তারও ওর সঙ্গে মিলিয়ে থাকবে নীরজ,—হ্যাঁ রে বউ! সে বেশ হবে না?"

অনাগত ভাবী সন্তানের আগমনকে এমন করিয়া কোনো দিনও

স্বর্ণলতা দেখিতে পায় নাই। আজ এই স্নেহময়ী ও আনন্দময়ীর চোখের দৃষ্টি দিয়া সেও ইহাকে অত্যন্ত মধুরতর করিয়া দেখিল। তার মনে মনে একটু লজ্জা বোধ হইলেও তার এসব কথা শুনিতে ভাল লাগিতেছিল।

সুন্দরা বলিতে লাগিল,—"খুব সাবধানে থাকবি, বুঝলি—সোনা? তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামিস, সেটা ছেড়ে দে। অত করে টক খাস্নি। দুধটা জোর করে খাস, দুধ খেলে ছেলে খুব ফরসা হয়, সত্যি রে! ঐ জন্যেই তো বেদানা দুধ এই সব খেতে দেয়। যাদের জোটে না তাদের ছেলে কালো হয়ে জন্মায়। লক্ষ্মী ভাই! আমার ভাইপোটী যেন ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের মতন হয় দেখিস্! আচ্ছা যদি তুই খুব শান্ত হয়ে, মার কথা শুনে, যা দেন খেয়েদেয়ে, কান্নাকাটী না করে (তা হলে কাঁদুনে ছেলে হয়ে তোকে জ্বালাবে) খুব সুন্দর আর শান্ত ছেলে আমায় দিস, আমি সলিলকে ধরে তোকে একটা মোটরকার কিনিয়ে দোব, রোজ সলিল তোকে নিয়ে তাতে করে নদীর ধারে একা একা বেড়িয়ে আনবে বুঝলি?—আর আমি তোকে কি দোব বল ত? তুই যা চাইবি। আচ্ছা, কি নিবি বল?"

স্বর্ণলতার নবীন চিত্ত গভীর আনন্দে যেন দুলিয়া উঠিল, তার সুন্দর মুখে সুখোচ্ছ্বাস উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। সে নতনেত্রে কোনমতে কহিল,

"আচ্ছা দিদি! তাই হবে। তোমার কথাই শুন্‌বো।"

সুন্দরা তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল—

"কি রকম গুড্ গার্ল! কে বলে সোনাকে আমার অবাধ্য! বলুক তো দেখি!"

নিতান্ত অকালে একটী মৃত সন্তান প্রসব করিয়া স্বর্ণলতা কঠিন পীড়ায় মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। মৃত সন্তান সহজে প্রসূত হয় নাই—তাহাকে কাটা-ছেঁড়া করিয়াই বাহিরে আনিতে হইয়াছে। ডাক্তারদের যথেষ্ট সতর্কতা সত্বেও কিছু দূষিত বস্তু রক্তে মিশিয়া প্রসূতিরও জীবন সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক চেষ্টা-যত্নে ও ভগবানের কৃপায় সে অবস্থাটা কাটিয়া গেলেও, স্বর্ণলতা সেই যে রোগশয্যায় পড়িল, মাসের পর মাস কাটিলেও সে আর সেখান হইতে উঠিতে পারিল না। একটার পর একটা করিয়া তার জীবনের উপর বড় বড় রোগের কঠিন ধাক্কা আসিয়া পড়িয়া তাহাকে যেন হাবুডুবু খাওয়াইতে লাগিল। দেশে থাকিয়া সুচিকিৎসা সম্ভব নয় বলিয়া রোগের প্রথম দিকেই তাহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। একটা বড় অপারেসনের পর কিছু সুস্থ হইলে তাহাকে হাওয়া বদলের জন্য পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হইল। তার পর আবার স্থানান্তরে। কিন্তু বাড়াবাড়িটা কাটিলেও তার একটুখানি রোগের গ্লানি আর কিছুতেই ঘুচিল না। অল্প একটু জ্বর, হজমশক্তির কিছু দুর্ব্বলতা, এ তার সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে। দিনে দিনে রোগে ভুগিয়া তার সেই অতুলনীয় রূপের রাশি যেন দিনের বেলার আলো লাগা চাঁদের মতই ম্লানায়মান হইয়া গেল। তাহাকে একটী কীটে-কাটা সুন্দর গোলাপের মতই সকরুণ দেখাইতে লাগিল। স্বর্ণলতা যেন নিদাঘ-মধ্যাহ্নের অকরুণ রৌদ্রতাপে ঝলসাইয়া উঠিল।

মহামায়া প্রাণপণ যত্নে বধূর রোগে শুশ্রূষা করিতেছিলেন, চিকিৎসার ব্যয় তিনি অকুণ্ঠভাবেই বহন করিতেছেন, কিন্তু একেই তাঁর পুত্রবধূর মনটী

খুব সরল নয়, তার উপর রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া সে বিশ্বের উপরেই বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তার বিশ্বাস তার সঙ্গত মতন যত্ন হয় না, ডাক্তাররা চিকিৎসার কিছুই জানে না, কেবল বড় বড় হারে ভিজিটের টাকা লইতেই জানে। কখনও সে বলে, অত্যন্ত বেশি খাওয়াইয়াই তাহাকে মারিয়া ফেলা হইতেছে, কখনও সে তীব্র অনুযোগ করে, অল্পাহারই তার সমস্ত রোগের মূল এবং তার দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ। যখন পাহাড়ে ছিল, সে তার ঠাকুরমার কাছে যাওয়ার জন্য ভীষণ কান্নাকাটি করিত। কলিকাতায় ফিরিয়া ঠাকুমাকে কাছে আনানো হইলে একটুখানি খুসী হইল বটে, কিন্তু সে সুখ তার স্থায়ী হইল না। ঠাকুমা লুকাইয়া চুরি করিয়া তাহাকে এমন সব পথ্য জোগাইয়া দিতে লাগিলেন, যে তার শক্তিহীন পাকযন্ত্র সে সব হজম করিয়া লইতে সমর্থ হইল না। ফলে এই দুর্ব্বল শরীরের উপর প্রচণ্ড 'কলিকে'র ব্যথা ধরা আরম্ভ হইয়া গেল।

মহামায়া রাগ না সামলাইতে পারিয়া স্বর্ণর ঠাকুমাকে একটু তীব্র করিয়াই অনুযোগ করিলেন! ঠাকুমা তাহাতে চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে পাঁচশো কথাই শুনাইয়া দিলেন। সে সব কথার মধ্যে কতকগুলি কথায় বেশ একটুখানি তীব্র ইঙ্গিত ছিল—অর্থাৎ তাঁর আদরের দুলালীকে তাঁর কোল হইতে ছিনাইয়া আনিয়া তার পর এতটাই অন্যায় অত্যাচার মহামায়ার না করিলেও চলিত! প্রথমাবধি তাকে ঘরে আনিয়া একদিনও সত্যকারের যত্ন করা হয় নাই। খাটাইয়া খাটাইয়া তার সোনার অঙ্গ কালি করা হইয়াছে। পড়া, সেলাই, রান্না, পূজার কাজ, নিজের সেবা—সবই ঐ কচি মেয়ে, যাকে তাঁরা কখন নড়িয়া বসিতে বলেন নাই—একসঙ্গে তার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়াছেন, না পারিলে যা খুসী তাই বলিয়াছেন। তার পরে তার স্বামী! সেই বা কি করিয়াছে? একদিনের তরেও সে এই রূপের ডালির পানে ভাল করিয়া ফিরিয়া তাকায় নাই।

নিশ্চয় নাতজামাইর স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, নহিলে আর অমন স্ত্রীকে তার মনে ধরে না ? অন্যে হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ওরই মুখের দিকে চাহিয়া যে এইখানেই দিনরাত পড়িয়া থাকিত, যেমন এর মনমিছরির বর তার অসুখের সময় করিয়াছিল।

—এবং এই যে আজ বৎসরের পর বৎসর যায় স্বর্ণ রোগে ভুগিতেছে, এই কি তার সেবাযত্ন চিকিৎসা কিছুই ঠিক মত হইতেছে ? কিছু না। এ যদি তাঁর বাড়ীতে হইত, গাঁয়ের মহেশ কবিরাজের ধন্বন্তরীর মত ঔষধ পথ্যে এতদিন কোন কালে এই মেয়ে তাজা হইয়া উঠিয়া আবার এতদিনে জ্যান্ত ছেলে কোলে করিয়া খালি কোল জুড়াইত। এর চেয়ে যদি তাকে গরীবের ঘরে দিতেন তো ঠাকুমা তাকে আশ মিটাইয়া কাছে রাখিতেন, মন ভরিয়া চিকিৎসা করাইতেন, এমন করিয়া তাকে অকালে হারাইতে বসিতে হইত না। ইত্যাদি—

মহামায়ার সর্ব্ব শরীর-মন এই সকল আলোচনায় ও সমালোচনায় জ্বালা করিতে থাকিলেও, অনেক কষ্টেই তিনি আপনাকে এই ভাবিয়াই সম্বরণ করিয়া লইতেছিলেন যে, যাদের শিক্ষা, সঙ্গ এবং অভিজ্ঞতা এতই সঙ্কীর্ণ—নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় সেই ঘরের সঙ্গেই যখন কুটুম্বিতা করিয়া বসিয়াছেন, তখন দোষ তিনি তো কাহাকেও দিতে পারেন না। এ অপমান তাঁহাকে যতই না কেন পীড়া দিক, এ তাঁহাকে মাথায় করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। তবে দুঃখ তিনি অপরিসীম ভাবেই বোধ করিতেছিলেন তাঁর ছেলের জন্যই। সলিল যে নিরপরাধে অপরাধী হইয়া তার এই নবীন জীবন যৌবনে শুধু দুঃখই ভোগ করিতে লাগিল, এবং হয় ত এ দুঃখ তার সমস্ত জীবনব্যাপী হইয়াই থাকিল, এই কষ্ট তাঁর যেন সহনাতীত হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ, এ অসহনকেও তাঁর নিঃশব্দে সহিয়া লইতে হইবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু তাঁদের দুজনের জন্যই এ অবস্থা আজ

অপরিবর্ত্তনীয়। স্বর্ণলতার স্বভাব রোগে রোগে তার স্বাভাবিক অবাধ্যতা,
-সন্দেহ ও অভিমানকে শতগুণেই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া তাঁদের তার কাছে
যতই অতিষ্ঠ করিয়া তুলুক, তথাপি রাত্রিদিন তারই সেবা যত্ন মঙ্গলবিধান
সর্ব্বতোভাবেই তাঁদের করিতে হইবে। চিকিৎসকরা সকলেই বলিতেছেন,
তার সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া বহু সময়সাপেক্ষ, হয় ত পূর্ণভাবে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য
লাভ আর সে কখনই করিতে পারিবে না। রোগ-দুষ্ট অঙ্গে অপারেসনের
ফলে সন্তানের মাতা হওয়া তার এ জন্মের মতই শেষ হইয়া গিয়াছে,—
মহামায়ার সমস্ত অন্তর তীব্র, তীব্রতর অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে অহো-
রাত্র যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিতে লাগিল। ওঃ ভগবান! এমন করিয়া
নিজের সকল আশার মূলে নিজের হাতে কেহ কি কখন কুঠার হানিয়াছে?
সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া স্বেচ্ছায় ছেলের এবং বংশের এ কি ক্ষতি
তিনি করিয়াছেন?

সলিলের মনের মধ্যে তার জীবনের এতবড় বিপ্লব কিন্তু বড় বেশি
বিপর্য্যয় আনিতে পারে নাই। স্বর্ণলতার প্রতি তার প্রেম না থাক,
বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ এবং স্নেহ তার নিতান্তই অপ্রচুর ছিল
না। সেবা যত্ন এবং তার চিকিৎসার জন্য সে অকাতরেই অর্থ ব্যয়
করিতেছিল। এমন কি মহামায়া যে অর্থব্যয় অনেক সময় অনাবশ্যক
বোধে নিবারণ করিতেন, সলিল মাকে বুঝাইয়া অথবা গোপনে সে ব্যয়ও
স্বীকার করিয়া লইত।

বাড়ীতে এক্সরে' লওয়া ভীষণ ব্যয়সাধ্য। অথচ স্বর্ণলতা মেডিকেল
কলেজে যাইতে একান্তই নারাজ। প্রস্তাব শুনিয়াই সে কাঁদিয়া উঠিল—
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল…

"হ্যাঁ, এইবার এই হলেই আমার চরম হয়! বড়লোকের ঘরে পড়ে
ত সকল সুখই আমার হয়েছে, এইবার হাঁসপাতালে এরা আমায় বিদায়

করতে পারলেই বেঁচে যায়। উঃ কি শক্ত প্রাণ আমার যে এততেও বেরুতে চাইচে না!"

সলিলের দিকে ফিরিয়া তীব্র করিয়া বলিল, "হাঁসপাতালে না পাঠিয়ে আমায় তুমি ঠাকুমার কাছে বিদায় করে দিলেই তো পার; মরতেই তো বসেছি, শীগ্‌গিরই তো মরবো,—সে ক'টা দিন যদি স্বর না সয়, দাও আমায় আমলাগঞ্জে পাঠিয়ে।—চাইনে আমি তোমাদের এই মেহগিনির পালঙ্কে শুয়ে মরতে।"

সলিল আহত স্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া নীরবেই উঠিয়া চলিয়া গেল, আর সে দ্বিতীয়বার তাহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ না করিয়া বাড়ীতেই এক্সরে, লইয়া আসার ব্যবস্থা করিয়া বসিল। মহামায়া খবর শুনিয়া ছেলেকে ডাকাইয়া বলিলেন,—

"হ্যাঁ রে, সে যে বিস্তর খরচ—শুধু শুধু—ওর খেয়ালের জন্য এত টাকা জলে দিবি!"

সলিল উত্তর করিল "কি আর হবে মা, যেতে দাও, বড় শক্ত শক্ত কথা বল্লে।"

মহামায়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কত পড়বে?" বধূর জন্য ন্যায়ের হিসাবে ব্যয় করিতে তিনিও অনিচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু সত্যসত্যই তো আর তাঁর ঘরে কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার বাঁধা নাই! কতই বা আয় তাঁর ছেলের, যে ব্যয়ের সঙ্গে এত বড় বড় সব অপব্যয়ের সঙ্কুলান হইবে? তিনি জানিতেন, এতদিনকার সযত্ন সঞ্চিত অনেকটাই নগদ টাকা এ কয় বৎসরে তাঁর পুত্রবধূর চিকিৎসায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে মনে তাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন।

যে বিপুলভাবে ইহাতে ব্যয় হইবে, মার কাছে তাহা প্রকাশ না করিয়াই সলিল ঈষৎ ঔদাস্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর করিল—

"কতই আর—শ' পাঁচেকই হোক ?"

মহামায়া আবার একটা নিশ্বাস ফেলিলেন,—"তাই বা কম কি ? বউমা একটু চেষ্টা করলে একটীবার যেতেও তো পারতো। আমি একবার বলে কয়ে দেখি ?"

সলিল কহিল "বল, কিন্তু ওকে পারবে না। উল্টে মিথ্যে কতকগুলো কথা শুনবে।"

আর একদিন মহামায়ার সাক্ষাতেই স্বর্ণলতা কাঁদিয়া সলিলকে বলিল, "আমি তোমার পায়ের বেড়ি হয়েছি। শীগ্‌গির করে মরে গেলে তাজা দেখে একটা যে বিয়ে করবে, তাও পারচো না। নিশ্চয়ই মায়ে-পোয়ে তোমরা মনে মনে আমার মরণ টেঁক্‌চো !"

মহামায়া আগুন হইয়া উঠিয়া কঠিনস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি ছোট মন তোমার বউমা !"

সলিল মাকে নিবৃত্ত করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"কার উপর রাগ করচো মা ! ওর কি রোগে রোগে মাথার ঠিক আছে ?"

মহামায়া বড় বেশি চটিয়াছিলেন,—ছেলের কথায় নিবৃত্ত না হইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"তুই জানিসনে সলিল, ওর অত ছোট মন বলেই ও—"

সলিল মার পিঠে হাত রাখিয়া অনুনয়ের স্বরে ডাকিল,—"মা ! মা !—"

মহামায়া ছেলের কণ্ঠের আহত স্বরে সহসা লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁর সেই অর্দ্ধাভিব্যক্তি যার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতেছিল তাহাকে একেবারে অগ্নিদীপ্ত করিয়া তুলিল। স্বর্ণ কাঁদিয়া ভাসাইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বেদম হইয়া গিয়া অনবরতই সে বলিতে লাগিল,—

"আবার এর ওপোর আমায় তুমি শাপমন্নি দিচ্ছো ! মন যে কার

কত ছোট তা' যিনি দেখবার তিনিই যেন দেখেন! আমার মরার ওপোর এম্‌নই করে তোমরা রাতদিন খাঁড়ার-ঘা দিচ্চো, দাও—ভগবান দেখচেন।"

এই অবস্থায় সলিলদের পূর্ব্বাপর পরিচিত ডাক্তার একদিন ডাক্তার সেনকে তাঁর রোগী দেখাইতে আনিলেন। ডাক্তার সেনের স্ত্রী-চিকিৎসা ও হার্ট সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইদানীং উচ্চ প্রশংসার সহিত আলোচিত হইতেছিল।

সলিলের পোষাকী নাম সরোজবন্ধু,—সেই নামেই সে তার বাড়ীর বাহিরে পরিচিত। তাই ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীও তাকে সরোজ নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন।

২৬

দেখা গেল সলিলের হিসাবেই ভুল ছিল, ডাক্তার সেনের অভিজ্ঞতা তার চেয়ে ঢের বেশি। খুব বেশি লোভনীয় করিয়াই সলিল তার স্ত্রীর কাছে ডাক্তার সেনের প্রস্তাবটাকে উত্থাপন করিলেও, তার ফল সেই এক্সরে'র সঙ্গেই সমান ভাবে ফেলিয়া গেল। স্বর্ণলতা কথাটা শুনিয়াই বিরক্তিবিরস শুষ্ক হাস্যে কহিয়া উঠিল,—

"বুঝেছি, এই জন্যেই তা'হলে যুক্তি করে ওই ডাক্তারটাকে এখানে আনা হয়েচে! তা' এত সব ফন্দিবাজির দরকার কি ছিল? তার চাইতে সাদা কথায় বল্লেই হতো যে তোমায় নিয়ে আমরা আর পেরে উঠ্‌চিনি, তুমি এইবার ঠাকুমার কাছে ফিরে যাও—"

এই পর্য্যন্ত সহজ স্বরে বলিয়াই স্বর্ণলতা কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোমাদের দোষ নেই,—বার মাস আর কার রোগীর

ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে! তবে তাদের কথা আলাদা, যারা পেটে ঠাঁই দিয়েছে, তারা হাঁড়ীতেও একটু দেবে। আর তাই বা আমি কতটাই বা খাই,—সে দিতে হাজারও গরীব হলেও তারা পারবে।”

সলিল অপ্রতিভ মুখে বিমর্ষ হইয়া কহিল, “এমন সব কথা কি করেই যে তুমি বলতে পারো স্বর্ণ? আমরা কি সেই জন্যেই বলচি? যাতে তুমি সেরে ওঠো, আবার যেমন ছিলে তেমনই হও—তারই জন্যেই না এই নূতন ডাক্তারটী এই ব্যবস্থা করতে চাইচেন।—আচ্ছা এক মাস নাই হোক, তুমি এক হপ্তা পরীক্ষা করে দেখ, ভাল না লাগে,—ভাল হচ্চো মনে না হয়—চলে এসো—”

স্বর্ণলতার রোগশীর্ণ ক্লিষ্ট অধরে একফোঁটা তীব্র হাস্য তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের শিখার মতই খেলিয়া গেল। বৃষ্টির মধ্যে করকাপাতের মতই সে তার অশ্রুজলে ভেজা কালো চোখে বজ্রের মত কঠোর দৃষ্টি স্থির করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল,—

“আমায় যখন আগুন সাক্ষী করে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেচ, এ ঘর ছাড়াতে আর তোমার সাধ্যি নেই,—না মরলে আমায় এ ঘর থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও এক পা বার করতে পারবে না,—তুমি তো তুমি,—আর তোমার ডাক্তার তো সামান্য একজন ডাক্তার।”

সলিল শুধু একবার সকরুণ ব্যথিত দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিল। ইহার পর আর কোন কথা বলিতেই তার ভরসা হইল না।

স্বর্ণলতা, যতক্ষণ সলিলের কাছে রহিল, তার জ্বালাময় দীপ্ত নেত্র অন্যত্র মেলিয়া ধরিয়া অভিমানের তীব্রদাহে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিল, আর যেই সে উঠিয়া গিয়াছে, অমনই তার সকল ব্যথা বন্যাধারার মতই বেগে উত্থিত হইয়া বাহিরের অভিমুখে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়াই কাঁদিল। নীরব

'অভিযোগে তার ক্রন্দন-বিবশ চিত্ত তার প্রস্থিত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—তুমি যে আমায় কোন দিনই ভালবাস নি,—আজ তো আমার রূপ গেছে, এই বয়সে আমি বুড়ো হয়ে গেছি,—রোগে রোগে তোমায় জালাতন করচি,—আজ কি আর তুমি আমায় নূতন করে ভালবাসতে পারবে! জানি তা', আমি বুঝি সবই,—কিন্তু তোমায় ছেড়ে যে আমি মরতে পারবো না,—আমি যে তোমায় এখনও ভাল করে পাইনি,—পেয়েও পাইনি—আমার যে তোমায় ছেড়ে স্বর্গেও যেতে লোভ নেই। ওগো ঠাকুর! হে মা কালী! আমায় মেরো না গো, আমায় বাঁচিয়ে রেখ, আমায় ভাল করো,—আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।"

তার পর কাঁদিতে কাঁদিতে তার মনে হইল, আচ্ছা যদিই তাকে মরিতে হয়, তা হ'লে সলিল কি আবার বিবাহ করিবে? এ কথা মনে হইতেই তার সমস্ত শরীরের রক্ত তর তর করিয়া বেগে তার মাথার মধ্যে ছুটিয়া উঠিতে লাগিল, তার হাত পা যেন এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই অবসন্ন হইয়া আসিল,—একটা অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি করিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ডাক্তার সেন সমস্ত শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া সলিল ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তবে কি আপনি ওর চিকিৎসা করবেন না?"

ডাক্তার কহিলেন, "উচিত তাই ছিল বটে! কারণ, আমি যার চিকিৎসা করি, ভাল কর্ব্বো মনে করেই করি। এ ক্ষেত্রে যেমন ভাবে এঁর দিন চলচে, সে ভাবে থাকলে এঁকে আমি ভাল করতে পার্ব্বো এমন আশা আমার নেই; কিন্তু—" বলিয়া একটুখানি জোরের সহিত বলিলেন,—"মেয়েটিকে দেখে আমার একটু মমতা জন্মেছে, ইচ্ছা হচ্চে,

ওঁর জন্য একবার চেষ্টা করেই দেখি। আচ্ছা, আর একটা কাজ করতে পারেন?—উনি না হয় এই বাড়ীতেই থাকুন, কিন্তু আপনি আর আপনার মা দুজনে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও,—এই কলকাতাতেই অন্য কোন বাড়ীতে থাকতে পারেন না?"

এই প্রস্তাবে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সলিল কহিয়া উঠিল,—"কেন পার্ব্বো না! বেশ তাই হবে। আমরা আমার দিদির বাড়ীতেই তো থাকতে পারি।"

তার পর একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু, শুধু নার্স দিয়ে কি সমস্ত দেখাশোনার সুবিধা হবে? মা না থাকলে চলবে কি?"

ডাক্তার সেন একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আমার নার্স, যেটীকে আমি আপনার স্ত্রীর ভার দোব, তিনি একাই ওঁর সমস্ত দেখতে এবং শুনতে পারবেন। সে রকম সহায় আমার না থাকলে এত বড় ভার আমি কোন মতেই নিতে ভরসা করতাম না।"

সলিল আনন্দের সহিতই ডাক্তার সেনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। কথা রহিল, দু হপ্তা সলিল বা সলিলের কোন আত্মীয়-আত্মীয়া রোগীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে না, শুধু বাহির হইতেই তার সংবাদ জানিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে। তৃতীয় হপ্তায় ডাক্তার অনুমতি দিলে, সলিল স্ত্রীর সহিত পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করিবে। তার পর হইতে অবস্থা বুঝিয়া ডাক্তার নিজেই যেমন হয় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

স্বর্ণলতা অবশ্য খুব সহজভাবেই এ প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই, কিন্তু শেষকালে ডাক্তার সেনের অনেক প্রলোভনে ভুলিয়া সে কোনমতে তাঁর অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হইল।

কিন্তু প্রথম দিনেই যখন সলিলরা মাতা পুত্রে চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই প্রায় তারই সমবয়সী একটী অতিশয় সুশ্রী মেয়ে তার নার্স বলিয়া পরিচয় দিয়া তার কাছে আসিয়া বসিল, তখনই তার মনে হইল, শাশুড়ীর সঙ্গের চেয়ে তার নিশ্চয়ই ইহাকে ভাল লাগিবে।

যে আসিল তার বয়স অল্প। দেখিতে সে স্বর্ণলতার মত নাই হোক্ —সুন্দরী। মুখে তার গভীর একটী মৌনতায় মিশ্রিত স্নিগ্ধ শ্রী অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে তার সুমিষ্ট স্বরে জানাইল—তার নাম মালতী রায়।

একটী দিনের ভিতরেই স্বর্ণলতার মালতীর সহিত অনেকখানি সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল। একটী পুরা সপ্তাহের মধ্যেই, তার সমস্ত মন দিয়াই সে ইহাকে তাহার 'সখী' বলিয়াই আঁকড়াইয়া ধরিল। মনিব-ভৃত্য, বা রোগী ও নার্সের অহৃদ্য সম্পর্কের একটু লেশও তাদের মধ্যে রহিল না।

মালতী তার রোগীর ঔষধ-পথ্য ঘড়ির কাঁটায় মিলাইয়া খাওয়ায়, তার রুক্ষ চুল পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া দেয়, শীর্ণ হাত দুখানি সুগন্ধি গরম জলে সযত্নে সাফ করিয়া দেয়, তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া তাহাকে পুলকিত করিয়া তোলে, তার অদূর-ভবিষ্যতে পুনঃ-প্রত্যাবৃত্ত স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের

আলোচনায় তার নিরাশাহত চিত্তকে নূতন আশায় প্রোৎসাহিত করে, তার পক্ষে অনাস্বাদিত ভাল ভাল নাটক-নভেল পড়িয়া তাহার রস গ্রহণ করায়।

স্বর্ণলতার জীবনে এ ধরণের আনন্দ সে যেন পায়ই নাই। তার সুন্দরাকে মনে পড়ে। তবে সুন্দরাকে এমন করিয়া সে সর্ব্বদাই তো কাছে পায় না। তাই তার সঙ্গটা তার পক্ষে নিমন্ত্রণ খাওয়ার মতই কদাচিৎ। কিন্তু মালতীকে সে যে একান্ত নিজের করিয়াই পাইল, এই জন্যই তার মধ্যে সে যেন একেবারে গলিয়া গেল। তার মনে হইল, এই রকম একজনকে আপনার এত কাছে পাইলেই যে যেন বাঁচিয়া উঠিতে পারিবে।

ডাক্তারকে সে দুবেলাই এই কথা জানাইতে ত্রুটী করিত না। একদিন বলিয়া বসিল, "আপনার বয়েস কম না হলে আমি আপনাকে বাবা বলে ডাকতুম। আপনি আমায় মালতীকে দিয়ে বাঁচিয়ে দিলেন,— নৈলে এদ্দিনে হয় ত আমি মরে ছাই হয়ে যেতুম।"

রোগীর চেহারাতেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। তার রক্তহীন পাংশু ওষ্ঠ আগের মত নাই হোক,—অনেকখানিই যেন গোলাপী আভা ফিরিয়া পাইয়াছে; জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ সুবৃহৎ চক্ষু দুটীতে জীবনের জ্যোতি আত্মচ্ছায়া পুনর্বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার সেই ভুবনভুলান হাসি, যে হাসি এতদিন অশ্রু-সাগরে গলিয়া মিশিয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আবার তাহা ক্ষণে ক্ষণে উচ্চকিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাক্তারের বুক গৌরবের সুখে স্ফীত হইয়া উঠিল। আড়ালে আসিয়া তিনি মালতীকে বলিলেন,—

"তোমার ম্যাজিক-পাওয়ার এবারও তো খুব খাটলে দেখছি, মিস্ রায়! আমি তা' জানতাম বলেই না এতটা দুঃসাহস করতে পেরেছি।

এঁর মূল রোগ হচ্চে, দারুণ অভিমান। মন এর যত ঠাণ্ডা রাখতে পারবে, আরোগ্যের আশা ততই নিশ্চিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের সন্ধ্যায় স্বর্ণলতার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বৈকালিক বেশ-ভূষার পর সেদিন মালতী তাহাকে হাত-আয়নায় তার মুখ দেখিতে দিয়াছিল। অনেক দিনের পর নিজের মুখ দেখিয়া স্বর্ণ তৃপ্ত না হইলেও, একটুখানি আশ্বস্ত হইয়াছিল। তবে আবার হয় ত তার পূর্ব্বের স্বাস্থ্য, পূর্ব্বের রূপ ফিরিয়া আসিবে!

মালতী লাইট জ্বালাইয়া অনতিদূরে আসিয়া বসিল। হাতে তার নৌকাডুবি। জিজ্ঞাসা করিল—

"এখন কি বইখানা শেষ করবো? শুন্‌বেন?"

স্বর্ণলতা একগাদা বালিশে হেলান দিয়া আধ-বসা অবস্থায় খোলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল, চোখ ফিরাইয়া লইয়া সে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল,—

"না ভাই, আজ আমার কেতাব শুন্‌তে ইচ্ছে করচে না, কথা বলতে ইচ্ছে করচে। তুমিই বরঞ্চ যদি শোন তো কিছু বলি,—শুন্‌বে?"

মালতী বইখানা মুড়িয়া নিকটস্থ টেবিলে রাখিয়া দিল। নিজের চেয়ারখানা স্বর্ণর বিছানার কাছে সরাইয়া আনিয়া বলিল,—

"বলুন, শুনি।"

স্বর্ণ তার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "অত দূরে নয়, কাছে এস,—আমার এই বিছানার উপর এসে বসো। দূরে দূরে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি,—তুমি শুদ্ধু আর অত দূরে থেকো না।"

মালতী সস্মিতমুখে উঠিয়া আসিয়া স্বর্ণলতার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া তার মৃণালের মত হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সাদরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সহাস্যে কহিল,—

"হ্যাঁ, এই আজকের রাতটা! তা'পরে কাছের মানুষটীকে যেই কাল কাছে পাবেন,—আর কি না মালতীকে কাছে পেতে ভাল লাগবে?"

এই টিপ্পনী শুনিয়া স্বর্ণলতা মৃদু হাসিল। তার সেই হাসিতে অনেকখানি বিষাদ ছড়াইয়া পড়িল। তার পর সে আবার একটু হাসিয়া কহিল, "তোমার বিদ্যে আছে, কিন্তু বুদ্ধি নেই, মালতী ভাই, দুধ যদি জোটে, তা'হলে কি কেউ কখন দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে চায়?"

মালতী কথা না কহিয়া নীরব রহিল। স্বর্ণলতার কথার ধরণেই বোধ হইল, তার স্বামী তাকে বুঝি ভালবাসেন না।

মালতীকে নীরব দেখিয়া স্বর্ণ কহিল,—"তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্চে না? মনে করচো, এ সব আমার মনের খেয়াল? না ভাই! সত্যি করেই বলচি তোমায়, দুধ আমি খাঁটিই পেয়েছি; কিন্তু দুধ খাওয়া আমার ভাগ্যে সাধ মিটিয়ে ঘটেনি। জানি না, এ কার দোষে,—আমার কোন্ পাপে এত পেয়েও আমার কপালে সুখ হলো না,—উনি আমায় ভালবাসলেন না।"—স্বর্ণ একটা মস্ত নিশ্বাসকে খুব জোর করিয়াই ফেলিল।

মালতী দেখিল, কথাটা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক উঠিয়া পড়িয়াছে, এ অপ্রিয় আলোচনা তার রোগীর পক্ষে একান্তই ক্ষতিকারক। তাই সে তাড়াতাড়ি আলোচনাটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে হাসিবার ভাবে বলিয়া উঠিল,—

"কি যে বলেন! আপনি এমন সুন্দরী, তিনিও শুনেছি চরিত্রবান, —আপনাকে ভালবাসেন না তো কি? ডাক্তার সেন বলছিলেন, আপনার চিকিৎসায় না কি এ-পর্য্যন্ত তাঁর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর খরচ হয়ে গ্যাছে এবং তাতেও তিনি এখনও কিছুমাত্র খরচ করতে কুণ্ঠিত নন,—"

স্বর্ণলতা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল,—"জানো মালতী! আমার মটুক থেকে পাঁচটা আংটী-শুদ্ধ হীরের স্যুট গয়না আছে, মতিরমালা, মুক্তর সাতনল, কণ্ঠী, কলার, নেকলেশ, শেলী নিয়ে বালা, তাগা, চুড়ি, কাণ সেও পুরো স্যুট আছে, শাশুড়ীর দরুণ সেকেলে সোনার চুড়ি স্যুট, বাউটী স্যুটও পেয়েছি, উনি দেখতে যে কত সুন্দর, তা'—আমার চোখে তো মনে হয়, পৃথিবীতে অত সুন্দর পুরুষ আর একজনও বুঝি নেই, স্বভাব তাঁর দেবতার মতনই পবিত্র,—কোনখানেই তাতে কোন দাগ, কোন ময়লা নেই,—সবই ঠিক। তবু আমি তোমায় বলচি,—এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলচি,—উনি আমায় সত্যি করে মনের থেকে ভালবাসেন না। এ সব যা কিছু সবই বাইরে বাইরে শুধু করতে হয় বলেই করা।"

বলিতে বলিতে সোজা হইয়া বসিল, এবং ঈষৎ উচ্চ উদ্দীপ্তকণ্ঠে কহিল, "শুন্‌লে তুমি হয় ত আমায় বেহায়া বলে মনে মনে হাসবে,—কিন্তু কি জানি কেন, কারুকে যা কোন দিন বলতে পারি নি, আজ তোমায় সেই সব কথা বলতে ইচ্ছে করচে—উনি আপনা হতে ইচ্ছে করে আমায় একটা দিনের জন্যেও এতটুকু আদর করেন নি, নিজেই আমি যেচে, চেয়ে, মান খুইয়ে তবে ওঁর কাছ থেকে যতটুকু পারি ছিনিয়ে নিয়েচি। আচ্ছা, বিয়েই না হয় করো নি,—মেয়েমানুষ তো বটে,—ভেবে দেখে বল তো,—স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালবাসে, তাহলে সেই ফুলশয্যের রাত থেকে আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তার সঙ্গে ডেকে কথা কইতে হয়?—গায়ে পড়েও সে স্বামীর সোহাগ পায় না?"

মালতী এ যুক্তির অকাট্যতায় চুপ করিয়া রহিল।

স্বর্ণলতার মন তখন উচ্ছ্বাসে ভরা,—সে আপন মনেই বলিতে লাগিল—

"এই যে আমার অত রূপ সব চলে গেছে,—অনেক সময় মনে হয় এই যদি সব গেলই,—বিয়ের আগেই কেন যায় নি? তা'হলে কোন গরীবের হাতে পড়ে আমার হয় ত সুখ হতো। আর মনে সুখ পেলে হয় ত আমি এমন করে ভুগতুম না। ডাক্তার বলে আমায় স্ফূর্ত্তি করতে,—তা স্ফূর্ত্তি আমার হবে কি করে?"

এবার মালতী নীরব থাকা ভাল দেখায় না ভাবিয়া শুষ্কভাবে কহিল, "তিনি বুঝি আপনার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছিলেন?"

স্বর্ণ হাসিয়া জবাব দিল,—"না গো না, আমার তিনি রূপে ভোলবার পাত্রই নন,—ওঁর মা সেটা ভুলেছিলেন বটে,—আর সেই হলো আমার কাল! তীর্থ করতে গিয়ে আমায় দেখে আমার শাশুড়ী একেবারে ভুলে যান। তক্ষনি আমার ঠাকুরমার কাছে সত্যি করেন যে আমায় বউ করবেন। শুনেচি উনি না কি প্রথমটায় আমায় বিয়ে করতেই চাননি,—হয় ত—গরীবের ঘর বলে, নয় ত আমি মুখ্যু বলে, তা জানি না কেন,—শেষে মায়ের জেদে মত দেন। তাই হয় ত আমাদের শুভদৃষ্টি ঠিক মতন হয় নি!—অবশ্য আমার দিক থেকে নয়,—আমার তিনি সর্ব্বস্ব। তাঁর মুখে একটুখানি হাসি দেখলে আমি মরতেও ভুলে যাই।"

মালতী স্তব্ধ অনড় হইয়া গেল। তার সেবাপরায়ণ হাতখানি স্বর্ণলতার হাতের উপর শিথিল হইয়া পড়িল। স্বর্ণ অত খেয়ালও করিল না; সে বলিয়া যাইতে লাগিল,—

"এখন তবু অনেকটাই সয়ে গ্যাছে,—মনেও আর ততটা লাগে না, নিজেকেও রোগে ধরেচে,—না হলে ওঁর রকম দেখে যেন অবাক হয়ে যেতুম ভাই! হয় ত অনেক চেষ্টা করে আমার দিকে মনটা একটু ফিরিয়েছি,—একটু কাছাকাছি রয়েছি, বেশ কথাটথা কইছেন,—হঠাৎ কি মনে হলো,—একটা মস্ত বড় নিশ্বাস ফেলে পিছন ফিরলেন। ডাকতে

গেলুম, বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ভাল লাগছে না স্বর্ণ, আমায় একটু ঘুমুতে দাও।'—আচ্ছা, কি তখন মনে হয় বল তো?—আমার কিন্তু বড্ড একটা সন্দ হয় মালতী! আচ্ছা, তুমিই বল তো, তুমি হলে কি হতো না? আমার বোধ হয় উনি আগে থেকে আর কারুকে ভালবাসতেন,—তাকে হয় ত কি জন্যে জানি না, পান্ নি,—তাই আমায় আর ভালবাসতে পারচেন না,—যেমন ঐ প্রতাপ-শৈবালিনীদের, নরেন্দ্র-হেমলতার হয়েছিল না? তুমিই তো চন্দ্রশেখর আর মাধবী-কঙ্কনে আমায় পড়ে শোনালে!"

মালতী কোন সাড়া দিল না।

স্বর্ণ বলিতে লাগিল, "আমি দেখেছি, প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে কথা কইতে গেলেই কেবল নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন,—অনেক সময় এমন কি চোখ পর্য্যন্ত ছলছল করেচে। ঠাকুর-ঝিমণি—ওঁর বোন সুন্দরা দিদি বড্ড ভাল ভাই,—তাঁকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বলতে পারি নে। আর জিজ্ঞেস করলেই কি তিনি বলবেন? ও কি ভাই মালতী! তুমি কিছুই শুনচো না। ঐ দেখ, তোমাকেও সেই রোগে ধরেচে! কি যেন ভাবতে বসে গ্যাচো!"

মালতী সহসা এই কথায় চট্‌কাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া, তাহার দিকে চাহিল। তার চোখে মুখে একটা গভীর বিভীষিকা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তার সেই শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন তার পার্শ্ববর্ত্তিনীর প্রতি ভয়ার্ত্তের মতই অস্থির ভাবে পতিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—"মাপ করবেন, আমি একটু দরকারে যাচ্চি"—বলিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

স্বর্ণলতা কিছু ক্ষুব্ধ, কিছু বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

যে নার্স স্বর্ণলতার সেবার ভার লইয়াছিল সে আরতি। ডাক্তার সেনের সাহায্যে সে ডাক্তারী পড়িতেছিল, কিন্তু পরীক্ষা পাস করিবার মত তার মানসিক শক্তি আর বাকি ছিল না, তাই লেডি ডাক্তারের পরিবর্ত্তে সে একজন শিক্ষিতা নার্স মাত্রই হইতে পারিয়াছিল; আর সে হইয়াছিল, ডাক্তার সেনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। তাঁর নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতির সেই ছিল যেন তাঁর সর্ব্বপ্রধান সহায়। এবারও এই শক্ত কেসটা তিনি ইহার উপরে নির্ভর করিয়াই হাতে লইয়াছিলেন। আরতি কিন্তু তখন স্বপ্নেও জানিত না যে কোন্ বাড়ীতে কাহার সেবা তাহাকে করিতে হইবে!

সেদিন অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত রূপে স্বর্ণলতার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াই সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। তার সর্ব্বত্যাগী মন যে তার নূতন জীবনে আজও কিছুমাত্র অভ্যস্ত হয় নাই, তার পরিত্যক্ত অতীত আজও যে তার জীবন-খাতার পাতা হইতে একেবারেই মুছিয়া যায় নাই, এই একটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে যেন তাহা সুস্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইল। এই যে আত্মকাহিনী এই মেয়েটী তাহাকে অতি বিশ্বাস করিয়া শুনাইল, এ তো তার কাছে অজানা রহস্য নয়! ওই যে সুন্দরী ও যুবতী-পত্নীর নৈশ-শয্যায় বিমনা পুরুষের চিত্র সে আঁকিয়া দেখাইল, সেই অশ্রুত দীর্ঘ-শ্বাসের আতপ্ত বায়ু আরতির চিত্তকে যে এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া দিল! তার বহু বহু পূর্ব্বের সেই এক হিম-কুহেলিকাময় শীত-রাত্রির নৈশ আবিষ্কার মনে পড়িয়া গেল—

"I love you, love you, dear Fanny!"

তার মনে পড়িয়া গেল, বিমুখী নারীর পদপ্রান্তে নতজানু প্রত্যাখ্যাত পুরুষের করুণ কাতর কণ্ঠস্বর! তার মনে পড়িল, তার জীবন-মৃত্যুর মহাযুদ্ধের সেই একক যোদ্ধা,—সেই ত্যাগ-পূত তাপস! অসহ্য—অসহ্য যন্ত্রণার সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিয়া আরতি স্থান কাল পাত্র বিস্মরণ হইয়া গিয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিল।

সে যে তাঁর জন্যই তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছে! সে কি রকম ছাড়িয়া আসা!—অতি হৃদয়হীন নীচ কৃতঘ্নের মতই যে সে ছাড়িয়া আসা! পাছে তিনি তার অস্তিত্ব জানিতে পারেন, তাই প্রাণ বাহির হইতে চাহিলেও, এ তিন বৎসর ধরিয়া তার পৃথিবীর শেষ বন্ধন মঞ্জুকে শুদ্ধ সে একবারটী চোখে দেখিতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই, তার একটু সংবাদও সে লয় নাই—সে কি এই জন্যে? তার সেই অমানুষিক কর্ম্মফলে তিনি তো সুখী হইলেনই না, মাঝে হইতে এই আর একটী নিরপরাধা নারী গভীর দুঃখে ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছে। আর এই সমস্তর মাঝখানে এমন করিয়া সে কি না আবার কোথা দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া জড়াইয়া পড়িল!

আরতি তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। কখন একবার আসিয়া জানালার ধারে বসিয়া পড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—আবার উঠিয়া তৎক্ষণাৎ অস্থির পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া অকারণেও সে চমকিয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছিল,—কে যেন আসিবে, কি যেন ঘটিবে—অথচ কিছুই যেন তার সুস্পষ্ট নয়।

জলের কুঁজা ঘরেই ছিল, আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া সে জল পান করিল, তৃষ্ণা গেল না; ভিতরটা যেন শুকাইয়া উঠিতেছে সমস্ত দেহের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছে—বাহিরের জলে তার দাহজ্বালা নিবৃত্ত হইবে কেমন করিয়া?

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বাহিরে শীতের জড়তা বাতাসের গায়ে ঈষৎ লাগিয়া রহিয়াছিল ; কিন্তু মানুষের মনে তার একটু কণাও সে স্পর্শ করাইতে পারে নাই। দোকানে দোকানে শীতের পোষাক ঝুলিতেছে, তাদের চমৎকার রংয়ে স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু দোকানীর নিজের গায়ে কলিকাতার শীতে একটা খাকি সার্টই যথেষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ বাড়ীর বারান্দায় অপূর্ব্ব সাজসজ্জায় সজ্জিতারা শীতের রাত্রিকে উপেক্ষা করিয়া পাতলা রংদার হাল্কা ব্লাউস্-শাড়ীতে নিজেদের পরীটি করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে।

আরতি দেখিল, কতকগুলি ছোট মেয়ে নিকটস্থ কোন পার্কের ফেরৎ চাকরের সঙ্গে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে হাত দোলাইয়া পরস্পর হাসাহাসি করিতেছে। তার এমন দিনের কথা—চট্ করিয়া তার মনে পড়িয়া গেল—হায় রে!—

ফেরিওয়ালারা মাথায় করিয়া হাতে বহিয়া কতরকম জিনিষ বিক্রি করিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও পিঠে বই কাগজের বা কাপড়ের বোঝা, গলায় রকমারি সুর। বিচিত্র বর্ণের এবং বিবিধ নামযুক্ত মোটরবাসগুলা খন্‌খন্ শব্দ করিয়া দেখিতে দেখিতে কোথাও যেন দৈত্যের মতন উধাও হইয়া যাইতেছে।

* * * *

মোড়ের কাছে আসিয়া রাস্তা ক্রশ করিতে গিয়া সে একখানা ছয় সিলিণ্ডারের নেপিয়ার চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। ক্রুদ্ধ তর্জ্জনে তাহাকে তিরস্কার করিয়া সে যেন তাহাকে এই কথাটী বলিয়া গেল,—'বিজ্ঞানের প্রভাবে আমার সৃষ্টি ধনীর সুখের জন্য,—এর মাঝখানে, হে পাদচারী পথচারী পথিক! তোমাদের স্থান কোথায়? তোমরা হয় আমার গতিপথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া যাও—নতুবা মর!

ডাক্তারের সহিত সে দেখা করিল। তিনি তাহাকে এমন অসময়ে নিজের কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া এখানে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তার মুখ দেখিয়া একটা কিছু বিশেষ অশুভ আশঙ্কা করিলেন। বলিলেন, "ফোন না করে নিজে চলে এলে কেন?"

আরতি কহিল, "ফোন্ করে সে কথা বলবার নয় বলেই এসেছি। আপনি যে আমায় বলেছিলেন সরোজবন্ধু গুপ্তর স্ত্রীর সেবার ভার আমায় দিচ্চেন, সরোজবন্ধু গুপ্তর বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমায় থাকতে হবে,—তা তো নয়? উনি তো সরোজবন্ধুর স্ত্রী নন, ও বাড়ী তো সরোজবন্ধু গুপ্তর নয়।"

ডাক্তার সেন মনে মনে ঈষৎ বিস্মিত হইলেন। আরতিকে এরূপ উত্তেজিত হইতে তিনি একদিনও দেখেন নাই। প্রকাশ্যে মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন "বাড়ী কার তা' ঠিক আমি অবশ্য জানিনে,—তবে স্ত্রী যে উনি সরো[illegible] গুপ্তেরই তা' আমি তোমায় হলপ করেই বলতে পারি। এই দেখ বরঞ্চ তোমার রোগীর স্বামী এই কতক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে আমায় যে চিঠি লিখেছেন তা' এই তো টেবিলেই পড়ে রয়েছে—"

এই বলিয়া ডাক্তার তাঁর সাম্‌নের টেবিলের উপরকার ছড়ান রাশি রাশি কাগজপত্রের উপর হইতে একখানা খামখোলা চিঠি তুলিয়া লইয়া আরতির সামনে ধরিলেন—

"এই দেখ মালতী! তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, সরোজবন্ধুবাবু নিজেই লিখচেন—My wife Sarnalata—ইত্যাদি—উনি যখন নিজেই ওঁকে তাঁর স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিচ্চেন, তখন, তুমি আমিই বা খামোকা অস্বীকার করতে যাই কেন? যাক্ এখন বোধ করি তোমার বিশ্বাস হলো?"

আরতি আকৃষ্ট চক্ষে সেই বহুদিন পরে দেখা সলিলের পরিচিত চির-

অবিস্মৃত হস্তাক্ষরের প্রতি চাহিয়া ছিল। এ লেখা নিশ্চয় তাঁহারই ; কিন্তু নাম সই রহিয়াছে, সরোজবন্ধু বলিয়া! সে যেন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তবে কি তার বুঝিবার ভুল? স্বর্ণলতার কাহিনীর সহিত তার সম্পর্কিত ব্যাপারের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও, আসলে এ দুইটা কি বিভিন্ন? সে তার মনের মিথ্যা উত্তেজনায় কি অনর্থক তার আশ্রয়দাতা স্নেহশীল প্রভুকে দোষারোপ করিতে আসিয়াছে?

কিন্তু না, "সুন্দরাদিদি" বলিয়াও তো স্বর্ণলতা তার ননদের উল্লেখ করিয়াছিল! হয় ত সরোজ নামই সলিলের আসল নাম—হ্যাঁ এ সম্ভব বটে!—

ডাক্তার সেন তীক্ষ্ননেত্রে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আরতি চোখ তুলিয়া চাহিতেই তিনি মৃদু হাস্যের সহিত কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছুতেই ঠিক বিশ্বাস হচ্চে না, না? কিন্তু কেন?"

আরতি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই ঈষদ্দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—

"কিন্তু দেখুন, আমায় আপনি আপনার সেবা-ভবনের ভারই দেবেন বলেছিলেন, প্রাইভেট নার্সিং কর্ব্বার তো কোনই কথা ছিল না, তবে কেন আমায় ওখানে দিলেন?"

ডাক্তার এবার হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"গিল্‌টী অর্‌ নট গিল্‌টী" বিচার তুমি আমার করবেই! কেমন? কিন্তু মালতী! তোমার হাতে না দিলে, মিসেস্ গুপ্তর আজ এই পনের দিনে যে উন্নতিটা হয়েচে, আর কারুর দ্বারা তা' কি হতে পারতো? কাজেই করি কি বল না, তোমায় ওখানে না দিয়ে? না হলে তোমায় এখানে না রাখায় আমার কি না ভারি লাভ! সমস্ত ভারই তো এসে আমার ঘাড়েই পড়েছে। আচ্ছা কেন বল দেখি? মেয়েটী বুঝি তোমায় কিছু

বলেছে? কিন্তু সে রকম যে হতে পারে, সে ত তুমি প্রথম থেকেই জানতে, আমি ত তোমায় সে কথা বলেইছিলাম—"

বাধা দিয়া আরতি প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, সে কিছুই বলেনি, বরঞ্চ সে আমায় আশাতিরিক্ত ভালবেসেছে, বিশ্বাস করেছে; কিন্তু আপনার কাছে হাজারবার ক্ষমা চাইচি ডাক্তার সেন! দয়া করে অন্য কারুকে ওখানে পাঠান, আমি ওখানে কিছুতেই থাকবো না।"

ডাক্তার সেন আরতির আবেগ-আরক্ত উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সাশ্চর্য্যে ডাকিলেন—"মালতী!"

আরতি ম্লানভাবে চাহিল, উত্তর করিল—"আজ্ঞে!"

ডাক্তার কহিলেন,—"মালতী! তুমি জানো আমি তোমায় আমার নিজের ছোট বোনের মত দেখি,—সেই রকমই স্নেহ করি।—কিন্তু তুমি মুখে যতই বলো, কাজে আমায় সে ভাবে দেখ না। তা' দেখলে আমার কাছ থেকে নিজেকে অতখানি ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখতে পারতে না।—আমি জানি, তোমার জীবনে কোন একটা কিছু গোপন রহস্য আছে। তুমি তা' আমায় বলোনি, আমিও নিজে থেকে কোন দিন কিছু জানতে চাইনি সে আমি আজও চাইবো না,—কিন্তু আজও আবার তোমায় বলে রাখছি,—বলা যখনই দরকার বোধ করবে, তোমার বড় ভাইকে, তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুকে—অসঙ্কোচেই তা' বলো—অবশ্য যদি দরকার না থাকে, আমারও জানবার কোন কৌতূহল নেই।—কিন্তু এই সরোজবন্ধুর স্ত্রীর চিকিৎসার ভার যখন আমি নিয়েছি, এখন এ ছাড়া আমার পক্ষে অসাধ্য! অসম্ভব! এ আমি পারবো না—এর জন্য আমায় প্রাণপণ করতে হবে—কিন্তু তোমার উপরই আমার সমস্ত ভরসা,—সেই একমাত্র ভরসাতেই অত বড় রোগী আমি হাতে নিয়েছি।

মেয়েটীর কি অবস্থা জানো? ওর হার্টের এমন অবস্থা যে এতটুকু সামান্য উত্তেজনাতেই ওর হার্টফেল করতে পারে। আমি যতদূর বুঝেছি, ওঁর স্বামীর সঙ্গে ওঁর ততদূর সদ্ভাব নেই, এবং তাঁর জন্য দায়ী ওঁর স্বামী। তিনি হয় ত যতদূর উচিত, ওঁকে ততটাই ভালবাসতে পারেন নি, অথচ মেয়েটীও অত্যন্ত বেশী ভাবপ্রবণ এবং অভিমানী,—তাঁর কাছ থেকে এতটুকু ত্রুটী ওঁর সইছে না। আমি সেই জন্যেই ওঁকে ওঁর শরীরের এ অবস্থায় ওঁর স্বামীর সঙ্গে স্বতন্ত্র থাকাই সঙ্গত বোধ করে এই ব্যবস্থা করেছি। এদিকে শাশুড়ীকেও মেয়েটী ঠিক ভাল চোখে দেখে মনে হলো না। এখন তুমি ভিন্ন কে ওকে স্নেহে, আদরে সেবায়, সাহচর্য্যে, ভুলিয়ে, আশা দিয়ে, উৎসাহিত করে—আরোগ্যের পথে ঠেলে দিতে পারবে, বল? ওর যে জিনিষটীর দরকার ঠিক সেইটীই যে ভগবান তোমার মধ্যে প্রচুর-ভাবে দিয়ে পাঠিয়েছেন, সব্বাইকে তো তিনি অতটা দয়া দেখান নি। বুদ্ধি বিদ্যা ও সহানুভূতি এর একত্র সমাবেশ আর আমি কোথায় পাবো মালতী?"

আরতি আর একটীও কথা বলিতে পারিল না। এই যে দৃঢ় নির্ভরতা, অপরিসীম বিশ্বাস, এর কাছে নিজের কোন লাভ-ক্ষতির হিসাব করিতে বসা কি যায়? এ পৃথিবীতে সর্ব্বাহারা সে,—এই যে মহচ্চরিত্রের আশ্রয় ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছে—এটুকু হারাইলে আর তার এই ছন্নছাড়া অভাগা-জীবনে বাকি রহিলই বা কি?

ডাক্তার সেন উৎসুক নেত্রে তার চিন্তা-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন; তাহার চলচিত্ততা তিনি বুঝিতে পারিলেন, উঠিয়া আসিয়া সস্নেহে তার অবনত মুখের উপর নিজের সহানুভূতিভরা দৃষ্টি রাখিলেন; কহিলেন—"যদি বেশি ক্ষতি হবে মনে করো, তবে না হয় থাক,—কিন্তু জেন তুমি তোমার উপরেই ওর মরা-বাঁচা—নির্ভর করছে।"

আরতি তথাপি কথা কহিল না।

ডাক্তার সেন ডাকিলেন, "মালতী!"

আরতি তার গভীর বিষাদপূর্ণ মুখ তুলিল।—

ডাক্তার বলিলেন, "থাক, আমি অন্য ব্যবস্থাই করবো,—যা হবার হবে,—তুমি এইখানেই ফিরে এস—"

আরতি তখন মন স্থির করিয়াছে, ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল,—"না, সে হয় না, আমাকেই থাকতে হবে।"

ডাক্তার মুখে আর কিছুই বলিলেন না, শুধু সশ্রদ্ধ প্রশংসার সহিত তার সেই অতি ম্লান অথচ স্থির প্রতিজ্ঞায় অবিচল মুখের দিকে বারেক মাত্র চাহিয়া দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

২৯

সলিল আসিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া খুসী হইল। স্বর্ণলতার সেই অস্বাভাবিক রক্তহীন শ্বেত মূর্ত্তি ইহারই ভিতর যেন একটুখানি স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তার চেয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তার মুখভাব। সেই সদা-অপ্রসন্ন রুক্ষ শুষ্ক ভাব আজ আর তাহাতে আদৌ নাই। অভিমানাশ্রু-পরিপ্লুত দুর্ব্বলতা-ক্লান্ত চক্ষে আজ তার সহজ সানন্দ দৃষ্টি। সলিলকে দেখিয়া তাহা অভিমানভরে নিমীলিত না হইয়া পূর্ণানন্দে বিকশিত হইয়া উঠিল। সে তার সমুদয় রোগ-দুর্ব্বলতা পরিহার পূর্ব্বক সহজ ভাবেই উঠিয়া বসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। প্রফুল্ল হাসিমুখে মিষ্টস্বরে কহিল, "এস—এসো—"

কণ্ঠে তার সুপ্রচুর হৃদয়ানন্দ উছলিয়া পড়িল।

সলিল দেখিয়া একান্ত বিস্মিত ও প্রীত হইল। ডাক্তার সেন কি কোন যাদুবিদ্যা জানেন না কি? সেও সহাস্যে কাছে আসিয়া তাহাকে সস্নেহে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিল,—"এইবারে তুমি সেরে উঠবে সোনা!—"

"কই, তুমি আমায় তো এতখানি ভাল থাকার জন্যে কোন প্রাইজ দিলে না?"

"কে বল্লে দিলুম না!"—বলিয়া সলিল তাহাকে হাসিয়া চুম্বন করিল।

স্বর্ণলতা স্বামীর আদরের দ্বিগুণ প্রতিদান করিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বড্ড বেশি হিসেবী কিন্তু—"

সলিল এবার তার শীর্ণ কপোল আদরে চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া তার দুর্ব্বল হস্ত নিজের উভয় হস্তে তুলিয়া লইয়া সস্মিত মুখে কহিল, "হিসেবী নই, সোনা! বরং সাবধানী বলতে পারো। যাহোক লতি! ডাক্তার সেন লোকটী যেন যাদুকর! না?"

স্বর্ণলতা নিজের আর একখানি অস্থিসার শীর্ণ হস্ত দিয়া তার সুস্থ সুন্দর যুবক স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার গরদের পাঞ্জাবী পরা কাঁধের উপর নিজের সুদৃশ্য কবরী রচিত মাথাটী রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল—"ডাক্তার সেন নন, তাঁর অনুচরীটী তাই বটে! তাকেই বরঞ্চ একটী যাদুকরী বলতে পারো।"

সলিল ঈষৎ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "সে আবার কে?"

স্বর্ণলতা কহিল, "সেই তো সব! তোমার ডাক্তার আমার কি করেছে? এমন চমৎকার মানুষ আমি আর কক্ষনো দেখিনি। দেখবে তুমি? ডাকবো তাকে? মালতী?"

সলিল ব্যস্ত হইয়া নিজের কণ্ঠ হইতে তার স্ত্রীর সেই শীর্ণ হাতের— বাসি হওয়া ফুলের মালার মতই বাহুপাশ খুলিয়া ফেলিয়া ঈষৎ সরিয়া

বসিতে গেল, ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"না, না, পাগল না কি! তাকে কেন? আমি তাকে দেখে কি করবো?"

স্বর্ণ স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া তার কোলের উপর নিজেকে এলাইয়া দিয়া ব্যাকুলভাবে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা থাক, ডাকবো না, তুমি আমার কাছে—খুব কাছে থাক।"

কিন্তু তার সেই একবারের ডাকেই মালতী আসিয়াছিল, দ্বারের কাছে পরদার পিছনে গভীর দ্বিধা লজ্জা ও একান্ত বিরক্তিপূর্ণ অনিচ্ছার সঙ্গেই সে দাঁড়াইল। তার মন যেন তখন গভীর সন্দেহের ঘূর্ণাবর্ত্তে সঘনে পাক খাইতেছিল। সত্যই এ ব্যক্তি সলিল কি না? যদি তার সন্দেহই সত্য হয়, যদি এ সলিল হয়, তবে কোন্ মুখে সে তার সামনে গিয়া দাঁড়াইবে?—এবং তার সেই দাঁড়ানর ফলও যে কি ভাবে ফলিবে তাই বা জানে কে? ডাক্তার সেনের প্রতি তার একটা মর্ম্মান্তিক রাগ হইতে লাগিল। এমন সময় তার সামনের ঘরে পর্দ্দার পিছনের দিক হইতে একটা সশব্দ চুম্বনের শব্দের সহিত তার পরিচিত সেই অবিস্মৃত কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনিল—

"কাছেই তো রয়েছি সোনা! ভগবান তোমায় ভাল করে দিন, চিরদিন আমার কাছেই থাকবে।"

স্বর্ণ কহিল,—"তুমি যদি এম্‌নি করে আমায় আদর করো, এম্‌নি করে আমায় কথা বলো, আমি কেন ভাল হবো না? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"কি?"

"তুমি কি বিয়ের আগে আর কারুকে ভালবাসতে?"

আরতি নিজের কাণে আঙ্গুল গুঁজিয়া দিতে গেল, তার হাত যেন অবশ হইয়া গিয়াছে,—সরিয়া যাইতেও চেষ্টা করিল, পা তার উঠিল

না। এমন সময় সে শুনিতে পাইল, স্বর্ণলতা বলিতেছে,—"ওই দেখ, তুমি চমকে উঠলে! তোমার মুখ কি রকম হয়ে গেল! না না, রাগ করো না, সত্যি লক্ষ্মীটি! আমায় মাপ করো, আমার যেন মনে হয়, তুমি যেন আমায় নিয়ে সুখী হওনি, তাই বলে ফেলেছি, আর বলবো না। আমার চেয়ে তুমি আর কারুকে বেশি ভালবাস, এ আমি ভাবতেই পারি নে,—এ যদি সত্যি হয়—আমি মরে যাব।"

"ছিঃ সোনা!—"

আরতি এই ব্যথাহত কণ্ঠও যে অনেকবারই শুনিয়াছে।

ডাক্তার আসিলে তাঁর রোগী একান্ত আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "আবার আমি কবে ওঁকে দেখতে পাবো বলুন না?"

ডাক্তার একটুখানি স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "এই রকম দেরি করে করে দেখলেই তো ভাল হয়।"

ঈষৎ দুঃখিত হইয়া স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তা হলে খুব ভাল লাগে।"

স্বর্ণ একটু লজ্জা পাইল। তার ডাক্তারের সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটা মনে পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে লজ্জা সম্বরণ করিয়া মৃদু মৃদু উত্তর করিল, "না হলেও লাগবে।"

ডাক্তার নিজের পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষার খাতিরে ভিতরের ব্যঙ্গহাস্য রুদ্ধ করিয়া বাহ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি বেশি বেশি এলে, কথাবার্তা বেশি করে শরীর অসুস্থ করবেন না?"

স্বর্ণ ডাক্তারকে এ সব কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিতে থাকিলেও, স্বামীকে কাছে পাওয়ার দুরন্ত লোভে লজ্জা জয় করিয়া লইয়া উত্তর দিল, "তা' কেন করবো,—রোজ যদি একবার করে আসেন, আমি শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাব।"

ডাক্তারের মন হয় ত উত্তর দিল, তাই যদি, তবে এতদিন ভাল হয়ে যাওনি কেন? কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি উত্তর করিলেন,—

"বেশ, ক্রমশঃ তাই-ই হবে। তবে এখন আপাততঃ হপ্তায় দুদিন করে তিনি আপনাকে দেখতে আসতে পারবেন। আচ্ছা আর কোন আত্মীয়কে দেখতে চান কি?"

স্বর্ণলতা একটুখানি কি ভাবিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল,—"সে এখন না হয় থাক, আস্‌চে হপ্তায় একদিন সুন্দরা দিদিকে আসতে বলবেন। এবার বরং তার বদলে ওঁকেই আর একদিন যেন দেখতে পাই।"

"বেশ—" বলিয়া ডাক্তার গম্ভীরমুখে বাহিরে আসিলেন, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একরাশি কৌতুকহাস্য চাপা দেওয়া ছিল। মনে মনে কহিলেন, "তোমার পক্ষে এই ঔষধই ধন্বন্তরী হবে।"

এদিকে আরতি আসিয়া কঠিনমুখে দাঁড়াইল। মুখ দেখিয়াই ডাক্তার সেন তাহার বার্ত্তা বুঝিয়াছিলেন; স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"খবর কি?"

আরতি আরক্ত মুখে কহিল,—"আপনি যে বলেছিলেন, এ বাড়ীতে কোন পুরুষ থাকবে না, তা ওঁকে তো ওঁর স্বামীর নিত্য আসার অনুমতি দিয়ে এলেন। তা হলে আমার ব্যবস্থাটা কি রকম করা স্থির করেছেন?"

ডাক্তার সেন ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কি অতটাই পর্দ্দানশীন?"

আরতি এই প্রশ্নাঘাতে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া পুনশ্চ দৃঢ়ভাবে উত্তর করিল,—"নয়ই বা কেন? যার তার কার সাম্‌নেই বা আমি বার হয়ে থাকি, যে আপনার এই স—স—সরোজবাবুর সাম্‌নেই আমাকে বেরুতে হবে? না, আমি সে পারবো না।"

ডাক্তার সেন তার উত্তেজনার আরক্ত ও উদ্দীপ্ত মুখের দিকে বিস্ময়ভরে চাহিয়া দেখিলেন। তার পর স্নিগ্ধকণ্ঠে ধীর ভাবে কহিলেন, "আমি এখন তোমার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছি,—যা তোমার ভাল বোধ হয় করো, তোমাকে না হলে যে এর চলবে না, সে ত তুমিও দেখতে পাচ্চো? না, না? একটা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে চাও, না মরতে দিতে ইচ্ছা করে? যা তোমার পছন্দ হয় তাই করো, আমি আর বেশি কি বলবো?"

আরতির উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই রাস্তায় তাঁর চলন্ত মটরের গতিশব্দ গর্জ্জিত হইয়া উঠিল। উপরের ঘর হইতে ডাক আসিল—

"মালতী! ও ভাই মালতী! তুমি কোথা ভাই?—"

আরতির বোধ হইল সে যেন চিরদাসত্বপণে আত্মবিক্রয়ের চুক্তি-পত্র সই করিয়া দিয়াছে, এখান হইতে তার মুক্তির কোন উপায় নাই।

৩০

এই যে তৃতীয় হপ্তার তিনটী দিন, এ দিন কয়টীও স্বর্ণলতার যেন স্বপ্নের মতই সুখ সম্ভোগে কাটিয়া গেল। সে যদি প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তার স্বামীর সহিত আগত মিলনের ভবিষ্য স্বপ্নে অতটাই না বিভোর হইয়া থাকিত, তো আরতির মধ্যে যে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহার অস্পষ্ট আভাষ মাত্রই নয়, সুস্পষ্টরূপেই তাহা ধরিতে পারিয়া বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইত। কিন্তু সে অবসর তার তখন ছিলনা; সলিল তার চুলের উপর কেমন করিয়া আঙ্গুল দিয়া খেলা

করিতেছিল, তার জন্য কত বড় ফুলের তোড়া কিনিয়া আনিয়াছে; তার চুম্বনে আর যেন সেই আগের মত অনাগ্রহ শিথিলতা দেখা যায় না! এবার যে দিন সে আসিবে, স্বর্ণলতা কি রঙ্গের সাড়ী পড়িবে? কাণে কোন্ দুলটী তাকে বেশি মানায়? মালতী তাঁকে যেমন সাজায়, তার ভাল দিনেও তাকে এর চেয়ে বেশি ভাল কেহ সাজাইতে পারে নাই।

স্বামীর সহিত বিচ্ছেদে সে যে স্বামীপ্রেম ফিরিয়া পাইতেছে এই সুখেই সে অধিকতর তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। তা হলে স্বামী তাকে ভালই বাসে? একসঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলে অতটা বোঝা যায় না; এই জন্যেই গানে বলিয়াছে 'বিরহে বাড়ালো প্রেম'!—হ্যাঁ এ বেশ বোঝা যাইতেছে!—

আরতি এ কয়দিনই চেষ্টা করিয়া করিয়া সলিলের দৃষ্টি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। পাছে সে যতক্ষণ তার স্ত্রীর কাছে থাকে, তার মধ্যে তাকে কোন দরকার পড়ে, তাই সে সকাল হইতে পরপর সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি একমন হইয়া সম্পন্ন করিয়া রাখিয়া দিত। স্বর্ণলতার ঔষধ পথ্য, মসলার কৌটা, সেণ্টের শিশি, স্মেলিং সণ্ট, যে কিছু তার হঠাৎ দরকার হইতে পারে, সমস্তই হাতের কাছে দিয়া, ঝিকে কাছাকাছি রাখিয়া সে আসিয়া তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিত। জানালা দিয়া যখন সলিলের মোটর চলিয়া যাওয়ার শব্দ আসিত, তার পর সে তার বিশৃঙ্খল চিন্তা-ভারকে সংযত করিয়া লইয়া অবসন্ন মন-প্রাণকে চেতাইয়া লইয়া কর্ত্তব্যের ভার বহিতে বাহির হইয়া আসিত। স্বর্ণলতা তার সুখভরা মনে মন খুলিয়া তার স্বামীর কথা অনর্গলই বলিয়া যাইতে থাকিত,—সে নীরব, নিস্পন্দ থাকিয়া কিছু শুনিত, কিছু বা শুনিত না। অনেক সময় শুনিতে শুনিতে তার বুকটা যেন পাথর চাপানর মতন ভারী হইয়া উঠিতে

থাকিত। তার দিক হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সাড়া না থাকিলে হঠাৎ এক সময় সংযত হইয়া উঠিয়া স্বর্ণলতা তাহাকে অনুযোগ করিত, "ও কি ভাই মালতী! তুমি কিচ্ছু শুন্‌চো না,—তুমি ঘুমোচ্চ!"

আরতি চট্‌কভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সচমকে উত্তর করিত, "কই না, এই তো শুন্‌চি!"—তার পর হয় ত ঈষৎ টানিয়া আনা হাসির সহিত ফিরিয়া অনুযোগ করিত।

"দেখ্‌চেন তো, উনি আপনাকে ভালবাসেন কি না?—আপনি বলতেন, ভালবাসেন না।"

স্বর্ণ আহ্লাদে গলিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উত্তর দিত, "তখন সত্যিই বাসতেন না, এখন বাসচেন ভাই!"

এক মাস কাল কাটিয়া গেলে সলিলের প্রতি প্রত্যহ তার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের আদেশ হইল; কিন্তু সে সাক্ষাতের অবসর-কালকে তিনি ঘড়ির হিসাবে আরও একটুখানি খর্ব্ব করিয়া দিলেন। কোন দিন প্রাতে, কোন দিন অপরাহ্ণে আধঘণ্টা কাল সলিল তার স্ত্রীর কাছে থাকিতে পারিবে, এইরূপই ব্যবস্থা হইল।

স্বর্ণ বলিল, "দেখ দেখি ডাক্তার সেনের অন্যায়! উনি বুঝি বিয়ে করেন নি?"

আরতি চুপ করিয়া রহিল। তখন স্বর্ণ সখেদে কহিয়া উঠিল, "হায় রে! কার কাছেই বা বল্‌চি! উনিও তো এক আইবুড়ী! আচ্ছা ভাই মালতী দিদি! তুমি কি কক্ষনোই বিয়ে করবে না?"

আরতি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, না—

স্বর্ণ কহিল, "কেন ভাই? বিয়ে করা কি মন্দ? আচ্ছা ওঁর মতন সুন্দর দেখতে যদি তোমার বরটী হয়, তাহলেও কি তুমি বিয়ে করো না? অবশ্য আমারটীর কথা বলচি না, ওই রকম আর একটী?"

আরতির সমস্ত চোখ মুখ এ কথায় অস্বাভাবিক রূপেই আরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, তার উত্তপ্ত শোণিত-স্রোত যাহা সবেগে তার মুখের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে, হয় ত, এখনই তাহা তার উপরকার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়িবে! কষ্টে সে আত্ম-দমন চেষ্টা করিতে করিতে তার প্রকৃতি-বহির্ভূত রূঢ় কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল "না, তাহলেও করি না,—কিছুতেই করি না,—কিছুতেই নয়!"

স্বর্ণলতা তার উত্তেজনার অর্থ বোধই করিতে পারিল না। সে অবিশ্বাসে মৃদু মৃদু হাসিয়া শুধু প্রতিবাদ করিল, "হুঁ গো! অমনটী পেলে কি না ছেড়ে দাও—"

আরতির উত্ত্যক্ত অপমানিত চিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য অসহ উত্তাপে তাতিয়া উঠিয়া প্রবলভাবে বিদ্রোহ করিয়া উঠিতে গেল। এক নিমেষের জন্য তার ব্যথা বিপর্য্যস্ত অন্তরাত্মা উদ্দাম আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিল, 'ওগো সুন্দরী! ওগো স্বামী-গরবিনী! আজ কার প্রসাদে, কার দয়ার দানে ঐ স্বামীকে তুমি পেয়েছ তা' কি জানো? আমি তাকে তোমার হ'তে দিয়েছি বলেই আজ সে তোমার।'

কিন্তু, না—না··না, একদিন যাহা গর্ব্বভরে সে হেলায় ফেলিয়া গিয়াছে, আজ তাহারই জন্য এ কাঙ্গালপনা, এ গায়ের জ্বালা—এ তার সাজে না! সে প্রাণপণে আত্ম-সম্বরণ করিয়া আপনাকে স্তব্ধ স্থির রাখিল।

স্বর্ণর ইহা ভাল লাগিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা মালতী! তোমার সে হাসিখুসী গল্পসল্প গেল কোথায়? তুমি ভাই, আজকাল বড্ড মন ভার ভার করে থাক। কেন ভাই কি করেছি? বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত ওই রকম মন ভার ভার দেখে দেখে আমার হাড় অবধি জ্বলে আছে, আর ভাই ও দেখতে আমার রুচি নেই।"

একটুখানি থামিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—"আগে ত তুমি অমন ছিলে না, এ বাড়ীর বাতাস লাগলো না কি ?"

আরতি একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "হবেও বা"—তার পর বলিল "শরীরটা তেমন ভাল নেই মিসেস্ গুপ্ত !"

স্বর্ণলতা ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল "কেন ভাই ! কি হয়েছে ?"

আরতি একটু ইতস্ততঃ করিল, "এই মাথাটা প্রায়ই ধরে—"

স্বর্ণ কহিল, "ও মা ! তা একদিনও তো কই বলো নি ! এস মাথায় একটু অডিকলোন দিয়ে দিই, স্মেলিং সল্টটা নিয়ে শোঁক দেখি, বড্ড শীগগির কমে যায়—"

আরতি ক্ষীণভাবে প্রতিবাদ করিতে গেল,—"না—না, ও সব কি হবে !—"

"আহা, দেখই না একটু—তুমি বড় অবাধ্য মালতী ! আমি দেখ তোমার কত কথা শুনি, এমন কিন্তু আর কারও কখন শুনতুম না—"

আরতি উঠিয়া তার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া স্মেলিং সল্ট শোঁকার অভিনয় করিল ! তার দু'চোখ দিয়া তখন অসম্বরণীয় অশ্রু-জলের ধারা দরদর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

সলিল সকালে স্ত্রীকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখন মনে পড়ে নাই, এ বেলায় একটা দরকারী জিনিষের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে আবারও আসিতে হইল। ড্রাইভার উপস্থিত ছিল না, ট্রামে করিয়া আসিয়াই রাস্তায় নামিয়া একটু পায়ে হাঁটিয়া সে বাড়ী ঢুকিল। লোকজন কেহ কোথাও নাই। সে একেবারে তার নিজের ঘরে—যেখানে তার দরকার সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। এ ক'দিন এ ঘরটা সে বন্ধ থাকিতে দেখে,—আজ দরজা খোলাই ছিল। এ ঘরে যে কেহ বাস করে, তাও সে জানিত না—দ্বিধাহীন চিত্তেই ঘরে ঢুকিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া সলিল

দেখিল, দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া একটা ছোট ডেস্কের কাছে বসিয়া একজন স্ত্রীলোক একটা কাগজে কি লিখিতেছে। বাহিরের আলোকের একটা ঝলক খোলা দরজা দিয়া তার মাথার উপর আসিয়া পড়িয়া তার কালো ও ঈষৎ তরঙ্গায়িত চুলের মধ্যে সোনার ছটা বিস্তার করিয়া দিয়াছিল। তার গলাখোলা জামার উপরকার একটুখানি ফাঁক দিয়া তার নিটোল স্কন্ধের উপর খুব সরু এক ন'র সোনার হারের সামান্য অংশ সেই আলোতে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছিল। তার এলো খোঁপার দু'পাশ দিয়া ছোট ছোট সুগঠিত দুটী অলঙ্কারশূন্য কাণের আকার দৃষ্ট হইতেছিল। সলিল দরজার কাছেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তার পা যেন হঠাৎ সেইখানেই আটকাইয়া গেল। তার বোধ হইল,—মুখ না দেখিয়াই তার সন্দেহ হইল, একে সে চেনে,—খুব যেন তার পরিচিত ঐ চুল, কাণ এবং ঘাড়ের ঐ খোলা অংশটুকু।

তার গলা দিয়া হয় ত একটুকু বিস্ময়-ধ্বনি, নয় ত আর কোন রকম কিছুর শব্দে লেখায় নিবিষ্ট-চিত্ত মেয়েটী ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত মুখ ফিরাইল। তার সামনে দ্বারের দিকে সলিলকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কলম ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সলিলের দিকে সসম্ভ্রমে বারেক চাহিয়া নমস্কার করিল।

তখন সলিল দেখিল, হ্যাঁ—সে আরতিই বটে!

আরতিকে এত সুন্দর সে যেন আর কখন দেখে নাই। তার পূর্ণ সুখ ও গৌরবোজ্জ্বল প্রথম পরিচয়ের দিনেও যেন নয়। আত্মসংযত, ত্যাগনিষ্ঠ দুঃখদাহনির্ম্মল নিষ্কলুষ স্বর্ণখণ্ডের মতই তাহাকে যেন পবিত্র ও উজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। সলিলের বুকের মধ্যে একসঙ্গে সহস্র প্রশ্ন যেন বর্ষণোদ্যত বর্ষাধারার মতই উদ্যত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত অন্তরাকাশ ভরিয়া যেন একটা গভীর আনন্দ, প্রগাঢ় অভিমান, এবং তার সঙ্গে সমান ওজনে

মাপিয়া তার প্রতি তার চিরসঞ্চিত অগাধ ভালবাসা একত্র হইয়া জাগিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া আরতির হাত নিজের এই আগ্রহ-স্পন্দিত দুই হাতে দৃঢ় বলে চাপিয়া ধরিয়া অন্তরের সমুদয় আবেগ ঢালিয়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে এখনি ডাকিয়া উঠে "আরতি! আরতি!"—

আরতির দুই নিথর চরণের উপর আপনাকে আছড়াইয়া দিয়া তার অকাল-ভগ্ন হৃদয়ের বিষাদ-বেদনা-হতাশায় ফাটিয়া-পড়া আর্ত্ত রবে—'নিষ্ঠুর! এই তোমার কৃতজ্ঞতা!" অন্ততঃ এই কথাটাও বলিয়া উঠিয়া তার অন্তরের হাহাকারকে কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়া লইবার জন্য তার নিজের মধ্যে একটা বিপুল বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ফলে সে কিছুই করিল না। শুধু প্রাণপণ বলে আত্ম-সংযত হইবার জন্যই আপনার সহিত আপনিই যুদ্ধ করিতে লাগিল। আরতিকে না পরিচিতের না অপরিচিতের কোন সম্ভাষণই সে জানাইতে পারিল না।

এ বিস্ময়ের তরঙ্গ আরতির দিকে ছিল না। সে মনে মনে জানিত,—একদিন না একদিন এ দিন তার আসিবেই। তাই সে শান্ত সংযত ভাবে এক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে একটা পাশের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। আর সলিল ভূতাহত আড়ষ্ট হইয়া বহু বহুক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যখন পারিল স্খলিত শ্লথ পদে নীচে নামিয়া একেবারে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিল। তার ধরণে বোধ হইল, সে যেন ভুল করিয়া নিজের বাড়ী বোধে অন্যের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন ভয় পাইয়া পলাইতেছে।

এর পর তিন দিন কাটিয়া গেল, সলিল আসিল না। অনেক করিয়া প্রত্যহ স্বামী দর্শনের যে অনুমতি স্বর্ণলতা ডাক্তারের কাছে আদায় করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইয়া গেল। দিন রাত প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া শেষকালে স্বর্ণলতা কাঁদিয়া কাটিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। আরতি তাহাকে বুঝাইতে পারে না,—সে খাওয়া ছাড়িয়া দিল, ঘুম তার বন্ধ হইয়া গেল। যখন তখন কেবল বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া মোটরের শব্দর জন্য কাণ পাতিয়া থাকে, আবার নূতন করিয়া আর একবার কাঁদিতে বসে। আরতির সকল বিদ্যাই এইবার শেষ হইয়া গেল। তা'ছাড়া, তার নিজের শক্তির সঞ্চয়েও যে টান ধরিয়াছিল—সে ত জানিত, সলিল কিসের জন্য স্ত্রীর কাছে আসা বন্ধ করিয়াছে। সে আর একবার তার মুক্তির জন্য ডাক্তারের সহিত তর্ক তুলিল। তিনি তার আবেদন কিছুতেই মঞ্জুর করিলেন না, বলিলেন, "তোমার একটা মিথ্যা খেয়ালের দায়ে আমি আর একটা জীবন নষ্ট হতে দিতে পারি না। মিসেস গুপ্ত এই তিন হপ্তায় দু'সের ওজনে বেড়েছেন। এর আগে ওঁর রোগের হোল হিষ্ট্রীতে ও-রকম ঘটনা ঘটেনি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিচ্ছুক বিরক্তিভরে আরতি তার নিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু যত্ন সে সমানই করিতে থাকিলেও ফল আর সমান ফলানো সম্ভব হইল না। যে আগ্রহ এবং আনন্দ লইয়া সে এই মৃত্যুমুখী তরুণীর সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সে আজ আর তার মধ্যে নাই। এর আরোগ্য সে কায়-মনে কামনা করে, কিন্তু এই গৃহ, এই পারিপার্শ্বিকতা তার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল এবং ক্রমশই সে যেন এখানে

থাকিতে একটা আশঙ্কা বোধ করিতেছিল। ডাক্তার যে ভুল করিতেছেন তাহা সে সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতেছে, অথচ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সত্য কথা বলিবার সাহস তার ছিল না, মিথ্যা রচনা করিতেও সে জানে না। তাই আকণ্ঠবদ্ধ হইয়াই সে রহিয়া গেল।

সলিল সেদিন অতর্কিতে যাহা দেখিয়া গেল, তার পর আর এ বাড়ীতে—তার নিজেরই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে তার সাহস হইতেছিল না। প্রথমে সে আরতিকে এত কাল পরে এ ভাবে এই তার নিজের বাড়ীতে তার নিজের শয্যাগৃহে দেখিয়া যেন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। এমন অসদৃশ—বিসদৃশ ঘটনা কেমন করিয়াই ঘটা যে সম্ভবপর হইল, তাহা যে তার কল্পনার অতীত! তার পর এ কয় দিনে দিনরাত ভাবিয়া ভাবিয়া এইটুকু সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল যে, এই আরতিই সেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা নার্স যাহাকে 'মালতী' নামে স্বর্ণলতা তার কাছে উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু তাই যদি হয়, তথাপি এমন কাণ্ড হইল কেমন করিয়া? আরতি—যে আরতি তাহাকে তার একখানা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতই তুচ্ছ করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে এতকাল পরে নার্স রূপে সেবা করিতে আসিল তারই স্ত্রীকে এবং তারই বাড়ীতে—যে বাড়ীতে সে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে প্রবেশ করিতে পারিত!

এ কি সে না জানিয়া আসিয়াছে? অথবা এ আসা তার কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত? এই গূঢ় রহস্য তার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকিতেছিল, এর কোনই মীমাংসা সে খুঁজিয়া পায় নাই।

এমন সময় ডাক্তার সেনের নিকট হইতে পত্র আসিল যে তার এই নিশ্চেষ্ট নির্লিপ্ততায় তাঁর রোগী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তার নিশ্চিত আরোগ্যের মুখে এমন করিয়া বাধা দান করা মিঃ গুপ্তর পক্ষে একটু অসঙ্গত

হইয়াছে। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি যেন অবিলম্বে আসিয়া তাঁহার পেসেণ্টকে শান্ত করেন, এবং ভবিষ্যতেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, তাঁর এতটুকু ভুলের বা আলস্যের উপরই এই বালিকার জীবন-মরণ একান্তভাবে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় অক্লান্ত স্নেহ এবং আত্মবিস্মৃত প্রেম।

ওঃ—জগতে কর্ত্তব্যের বন্ধনের মত দৃঢ় অচ্ছেদ্য অবিস্মৃত কোন বস্তু নাই! এর কাছে নিজের এতটুকু লাভ-ক্ষতির জন্য অবসর পাওয়া যায় না। অস্থির ও অনিশ্চিত চিত্ত-প্রাণ লইয়া সলিল গিয়া দেখিল স্বর্ণলতা শয্যালীন থাকিয়া প্রবল ভাবে তার আহারে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে; আর আরতি তার বিছানার পাশে বসিয়া তাহাকে এক পাত্র দুধ লইয়া পান করিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেছে। সলিল ঘরে ঢুকিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু স্বর্ণলতা তাহাকে দেখিতে পাইয়াই একটা মৃদু আনন্দ-ধ্বনি করিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, উল্লসিত কণ্ঠে উচ্চ করিয়া বলিল,—

"তুমি এসেছ? ভাল আছ? বাঁচলুম!—আমার এমন ভাবনা হচ্ছিল! যাচ্চো কেন? ও তো নার্স—মালতী। মালতী! তুমিই বা হঠাৎ চল্লে কেন? বাঃ! আমি দুধ খাবো না বুঝি? এখন তুমি যদি দশ সের দুধ এনে দাও—আমি খেতে রাজী আছি।"

অগত্যা সলিলকে প্রত্যহ একবার করিয়া তার স্ত্রীর কাছে হাজরী দিতে আসিতেই হইতে লাগিল। কিন্তু এ আসা আর তার আগের সেই কয় দিনের আসার মত শুভাগমন সূচিত করিল না। এ যেন আবারতাদের সেই পুরাতন যুগেরই পূর্ব্ব-সূচনার মত ছাড়া-ছাড়া, ধার-করা অশ্রু-সজল, অভিমান-দুর্ব্বল দিনেরই পুনরাবর্ত্তন! সলিল আর মন দিয়া তার স্ত্রীকে আদর দেখাইতে পারে না। আসন্ন মৃত্যু-ভয় যে বাধাকে তার শ্লথ করিয়া

দিয়াছিল, আরতির আবির্ভাব তাহাকে যেন আবার নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিল। কোন একটা সোহাগের বাণী তার মুখে আসিলেও সে যেন আর সেটাকে প্রকাশ করিতে পারিত না, তার মনে হইত,—যদি আরতির কাণে যায়, সে হয় ত মনে মনে হাসিবে,—ভাবিবে পুরুষ কতবড় লঘুচিত্ত! আরতিকে যে সব কথা সে বলিতে পারিত, আজ অনায়াসেই তা স্বর্ণ-লতাকে বলিতে তার কোথাও বাধিতেছে না। তাই স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার তার অনিচ্ছা বিরস এবং কৃত্রিমতায় যতই পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল. স্বর্ণলতার পক্ষ হইতে অভিমানের অশ্রুবাণ এবং বাক্যবাণ দুই-ই তত প্রবলবেগে বর্ষণারম্ভ হইল। ফলে আবার তাদের মধ্যের ঐ কয়টী মাত্র দিনের সুখের আভাষ দেখা দিয়াই সেই পুরাতন দিনই জরীর বেশে ফিরিয়া আসিল।

আরতির প্রতিও আর স্বর্ণলতার সে শ্রদ্ধা ছিল না। ইদানীং সলিলের উপস্থিত কালেও সে মালতীকে ডাকিয়া ফাই-ফরমাইস করিত; এবং তাদের দুজনকার দুজনের প্রতি সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া উপহাসও করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ সে একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ঐ ত্রস্ত ভাবটা তাদের বাহ্যিক। আসলে সলিল তার সমস্ত মন এবং চক্ষু দিয়া তাহার পরিবর্তে ঐ তার নার্সকেই অনুভব করিয়া থাকে। উহাকে দেখিলে তার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ও যদি ঘর হইতে চলিয়া যায়, সলিলও যাই যাই করিতে থাকে; থাকিলেও আর তার মুখের সে ভাব থাকে না। তখন তার মনে পড়িল, প্রথম যেদিন এই ঘরে তাদের দেখা হয়, তাদের দুজনকার মুখেই সে কি একটা অদ্ভুত রকমের আর্ত্ত ভাব, সন্ত্রস্ত ভাব ফুটিয়া উঠিতে সে দেখিয়াছিল। অবশ্য তখন তার কোনই সন্দেহ হয় নাই। অতি তীব্র ঈর্ষার বৃশ্চিকদংশনে স্বর্ণলতার মনের ভিতরটা জ্বলিয়া গেল। তার মনে হইল, তাকে উপলক্ষ্য করিয়া হয় ত তার স্বামী এই সুস্থ

সুন্দরী তরুণীটাকে—নার্সটীকে নিজের জন্যই বাছাই করিয়া আনাইয়াছেন। হয় ত—সে এই ঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকে,—কোথায় কি হইতেছে তার খবর কে জানে? তার তখন মনে হইল, ভাড়া করা নার্স আবার এত সুন্দরী হয়? সে কি এত বিপ্তে পড়ে থাকে? নিশ্চয়ই তার ভাঙ্গা কপাল পুরাপুরিই ভাঙ্গিয়াছে!

প্রকাশ্যে এতবড় অপবাদ স্বামীকে হঠাৎ জানাইতেও তার ভরসা হইল না; কিন্তু ছুতায়-নতায় কাঁদিয়া রাগিয়া সে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়াই তুলিল।—অথচ ডাক্তারের আদেশ—না আসিবারও উপায় নাই! সলিল যেন দুই দিক হইতেই হাঁপাইয়া উঠিল। তার রাগ হইল বেশি আরতিরই উপরে। সে কেন তার এতবড় দুঃসময়ে আবার তার এত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল? তার দুর্ভাগ্য সে তো কোন রকম করিয়া বহিতেছিল—এমন অসময়ে তার অতি কষ্টে ও বহু আয়াসে বাঁধিয়া রাখা মনের বাঁধ ধ্বসাইয়া তাহাকে কোন্ প্লাবনের মুখে ভাসাইয়া দিতে তার এই অসম্ভব আগমন? সে কেন আসিল? এই একটী প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে মনের মধ্যে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে তার ভরসা হইল না।

ইহার কয়েকদিন পরে সুন্দরা আসিয়া দেখিল, স্বর্ণলতা উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে দ্বারের দিকেই চাহিয়া আছে। আজ তাকে সেই আসিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া তার চক্ষে একটুখানি আনন্দের আমেজ ফুটিয়া উঠিল। কাছে আসিতেই সে তার একটী হাত বাড়াইয়া দিয়া সুন্দরার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করিল। সুন্দরা তার বিছানার ধারে আসন গ্রহণ করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে ঈষৎ প্রসন্ন-স্মিত মুখে কহিয়া উঠিল "এই তো! বেশ সেরে উঠেছিস তো বউ! বাঃ—অনেকখানি উন্নতি হয়েচে দেখছি যে।"

স্বর্ণ তার হাত ধরিয়া থাকিয়া একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল; সবিষাদে কহিল "ভাল হবো আশা করেছিলুম, কিন্তু বোধ হয় আর তা' আমায় হতে দিলে না, ভাই ঠাকুরঝি-মণি!"

সুন্দরা সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল "সে কি! কেন রে? ও কথা বলছিস কেন? কে ভাল হতে দিচ্ছে না তোকে?"

স্বর্ণলতা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় এক কাপ গরম দুধ হাতে করিয়া সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল আরতি। দ্বার খোলার মৃদু শব্দে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়াই সুন্দরা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তার মুখ দিয়া আচম্বিতে একটা শব্দ বাহির হইতে গিয়াও সহসা বাহির হইল না, সে শুধু অবাক হইয়া তার অগ্রসর হওয়া মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

আরতি প্রথমে তার মুখ দেখে নাই; যখন দেখিতে পাইল, তখন সেও বারেকের জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তার তখন এমনও মনে হইয়াছিল যে, দুধের বাটী ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া এইক্ষণেই সে

তার এই স্নেহময়ী দিদির কোলের উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া পড়ে। তার নীরব কণ্ঠ, নির্ব্বাক জিহ্বা উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিয়া একবার তার সেই প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক ভাইটীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণ শক্তি দিয়া, যে শক্তিতে সে এ জীবনে এই বয়সে অনেক কিছুই অসাধ্য সাধন করিয়া চলিয়াছে, সেই শক্তির বলেই পুটপাক মধ্যস্থ ধাতুদ্রবের মত নিজের অন্তরের সহসা-দ্রব তরলাগ্নিকে চাপিয়া রাখিয়া ঘনস্ফুরিত অধরের উপর দাঁত দিয়া চাপিয়া স্থির পদে রোগীর অপর পার্শ্বে আসিয়া পৌছিল। দুধের বাটিটা তার কাছে ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল—"জুড়িয়ে গ্যাছে, খেয়ে নিন,—"

স্বর্ণ সুন্দরার সুস্পষ্ট চমক টের পাইয়াছিল। তার হাত সেই চমকে স্বর্ণলতার মুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। অতি বিস্ময়াবেগে সুন্দরা তাহা না জানিলেও স্বর্ণ জানিয়াছিল। সে এক একবার দুজন-কারই মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তিভরে সসার শুদ্ধ দুধের কাপটা ঠেলিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল,—"আঃ নার্স ? কেন, ক্রমাগত জালাতন কর, যাও—আমি খাবো না।"—ইচ্ছা করিয়াই সে তাহাকে মালতী না বলিয়া নার্স বলিল। এখন সে প্রায়ই এই রকম বলে।

আরতি মৃদু কণ্ঠে কোন মতে দুচারবার অনুরোধ করিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, ততক্ষণে আপনাকে ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া সুন্দরা ভাজের দিকে ফিরিয়া সস্নেহে কহিল, "ছি, দুষ্টুমী করে কি! নাও লক্ষ্মীটী, খেয়ে নাও।"

এবার আরতি ফিরিয়া দুধ মুখে ধরিতেই স্বর্ণ নিঃশব্দে দুধটুকু পান করিল। এই স্নেহ-মধুর অনুযোগটুকুকেই যে তার ক্ষুধিত চিত্ত অহোরাত্র হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল এবং ঠিক সে যেটুকু চাহিতেছিল পাইতেছিল না।

আরতি নীরবে ফিরিয়া গেল, সুন্দরা তার সঙ্গে একটীও কথা কহিল না। স্বর্ণ তাহাকে নার্স বলিয়া সম্বোধন করায় তার প্রকৃত পরিচয় যে তার কাছে অজ্ঞাত, সে খবর সে পাইয়াছিল। ভিতরে এর কি যে রহস্য কিছুই সে জানে না, আরতিও তাহাকে না চেনার ভান করিল; কাজেই সেও তার অদম্য ইচ্ছাকে জোর করিয়া দমন করিয়া স্থাণুর মতই বসিয়া রহিল, কিন্তু মন তার নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। এত দীর্ঘকাল পরে আরতিকে আজ এই অজ্ঞাত পরিচয়ে ইহারই পাশে দেখিয়া সে মনে মনে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। তার মন যেন তার কাণে কাণে বলিল,—এ তো ভাল ঠেকছে না, এ কি সলিল জানে?—তার পর আপনিই মীমাংসা করিল, জানে বই কি, সেও তো মধ্যে মধ্যে এখানে আসে,—এ কি তবে সে জেনে শুনেই হতে দিয়েছে? ইচ্ছে করে?—

আরতি ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলে স্বর্ণ ডাকিল "দিদি!"

সুন্দরা ভাল করিয়া ফিরিয়া বসিল "কি, সোনা?"

স্বর্ণ কহিল, "দিদি! ও' কে—আমায় তুমি বল।"

সুন্দরা তার কথার ভাবে, তার চেয়ে বেশি তার গলার স্বরে চমকিত হইল। তার পর সহজ ভাব দেখাইয়াই উত্তর করিল,—"কে' কে রে?"

স্বর্ণ তেমনই অনুচ্চ দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন ঐ নার্সটা! তোমরা ওকে চেন,—দুজনেই চেনো। তোমার ভাইও যেন প্রথম দিন ওকে এই ঘরে দেখে তোমার মত করেই চমকে উঠেছিল।—তার পর থেকে আঃ—তার পর থেকে যখনই আসে, তার চোখ আর কোন দিকেই যেন ফেরে না,—শুধু ঐ নার্সকেই দেখে! ও যদি তখন ঘরে না থাকে, ক্রমাগত অন্যমনস্ক হয়ে হয়ে ঐ দোরের দিকেই চায়।—যতক্ষণ নার্স না থাকে, বেশ কথাবার্ত্তা কয়,—যেই নার্স আসে অমনি যেন সব

উল্টে যায়। বেশিক্ষণ থাকতে পারে না ; একটা কিছু ছুতো করে পালায়। এ সবের মানে কি দিদি? আমায় তুমি বলো,—লুকিও না, তোমার পায়ে পড়ি লুকিও না। আমি ভাল হচ্ছিলুম ; কিন্তু যেদিন থেকে এই সব দেখচি, সেই দিন থেকেই আবার আমি মরতে বসেচি। আমায় এরা বাঁচতে দিতে চায় না!—আমায় এরা মারবে,—খুন করবে।”

সুন্দরা এই অনুযোগের মূলে সত্যের আভাষ পাইয়া শুধু উদ্বিগ্নই নয়, শঙ্কানুভবও করিল। সলিল এবং আরতি দুজনের উপরই তার রাগ হইল। কেন তারা এই বেচারার প্রাণটিকে লইয়া এমন অনাবশ্যক নিষ্ঠুর খেলা খেলিতে বসিল? এর কি প্রয়োজন ছিল? এর জন্য দুজনকেই অনুযোগ করিবে স্থির করিয়া স্বর্ণকে সান্ত্বনা দিয়া প্রকাশ্যে কহিল,

“তোর মুণ্ডু! ও-সব তোর মনের খেয়াল। তোর যে চিরকেলে একটা বাতিক আছে না, সেইটের ভূত ফের তোর ঘাড়ে চেপেছে।”

বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া স্বর্ণ ম্লান হাস্যের সহিত জবাব করিল “না, দিদি, না,—আমার খেয়াল নয়,—এ সত্যি! ওর দিকে যখন চায়, তোমার ভাইএর চোখ দিয়ে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। ওর গলার শব্দ, জুতোর শব্দ কাণ পেতে শোনে, আর শুনতে পেলে মুখ যেন আহ্লাদে চকচকে হয়ে ওঠে। কই আমার দিকে ত কক্ষনো অমন চোখে চায় না?—কোন দিনই তো ও—চায় নি? ওকে নিশ্চয় ও ভালবাসে,—হয় ত আগে থেকেই ওদের মধ্যে ভালবাসা ছিল। না হলে কি”—

সুন্দরা শুষ্ককণ্ঠে বাধা দিল, “স্বর্ণ! ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে অমন যা’ তা’ কথা মুখে এনো না, ছিঃ! তোমার ওকে ভাল না লাগে, ওকে বদলে দাও।—”

স্বর্ণ আবার তেমনই বিষাদিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ওকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল,—বলতে গেলে ওই আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে, কিন্তু যেদিন থেকে কি কুক্ষণেই যে ওদের দুজনকার দেখা হলো, সেই দিন থেকে আবার ও-ই আমায় খুন করচে। আমি পারচি না,—আমি সইতে পারচি না—তার চোখের সে চাউনি, সেই—সেই—সে যে কি, তা' আমি বলতে পারবো না, কিন্তু সে যে খুব বেশি কিছু, সে আমি ঠিক বুঝতে পারি! সে কেন হবে? সে কেন থাকবে? আমি যা পাই নি ও তা' কেন পাবে? আর কেউ কেন পাবে?"

স্বর্ণলতা যে ঠিক বোকা নয়, সুন্দরাও তা' জানিত। তবে সে যে এতটাই দেখে, বোঝে ও এমন তীব্র করিয়া অনুভব করে, এটা তাকে কিছু বিস্মিত করিল। তথাপি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া সে ভ্রাতৃ-জায়াকে ধমকাইল,—

"নে,' নে,' রঙ্গ রাখ! তুই কি বলতে চাস যে সলিল তোকে ভালবাসে না? তাই ছায়ার পেছনে ছুটে দুঃখ পাচ্ছিস?"

স্বর্ণ হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল,—

"দুঃখ আমি পাচ্ছি,—খুবই পাচ্ছি, কিন্তু সে ছায়া নয় দিদি! সত্যিকারের মস্ত দুঃক্ষু! তোমার ভাই আমায় যে ভালবাসে না, সে তুমি তার ওই নার্সের দিকে চাওয়া দেখলেই জানতে পারতে দিদি! সে ভালবাসে ওই ওকে—"

"স্বর্ণ! এ' কি কথা! আমার ভায়ের কি সেই চরিত্র?"

স্বর্ণ এ তিরস্কারে অপ্রতিভ না হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল—

"তা নয় বলেই তো বলচি ওকে ভালবাসে,—আগে থেকেই হয় ত বা বাসতো! স্বভাব যদি মন্দ হতো, তা হলে তো জানতুম, ওর স্বভাবই ওই—কিন্তু যে কারুর দিকে চায় না, এমন কি ভাল করে কোন দিন

আমাকেই যে চেয়ে দেখে নি, সেই সে কেন,—সে কেন—ওকে—সে কেন ওকে অমন আপনা ভুলে চেয়ে দেখবে ! কেন সে ওর—"

দুঃখে অভিমানে স্বর্ণলতার ক্ষীণ স্বর একেবারে গভীর নিখাদে ডুবিয়া গেল। তার বড় বড় চোখ দুটি দিয়া এবার অশ্রুর দুটী ধারা নামিল। ইহার পর সুন্দরাও আর তাদের সঙ্গে আরতির পূর্ব্ব পরিচয়ের সংবাদ কোনমতেই দেওয়া সঙ্গত বোধ করিল না, মনে মনে সে যত উদ্বিগ্ন ততই বিরক্ত হইয়া উঠিল।

"দিদি! তুমিও কিন্তু আমায় লুকোলে! তুমিও তো ওকে দেখে চমকে উঠেছিলে। ও কি কখন তোমাদের বাড়ী নার্স ছিল? তোমার ভাইএর সঙ্গে বুঝি ওর—"

সহসা আড়ষ্ট অভিভূত সুন্দরাকে মুক্তি দিতে মুক্তি-দূতের মতই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আরতি নম্রস্বরে কহিল—

"ম্যাডাম! ডক্টর আসচেন, এ সময় অন্যের থাকা নিয়ম নয়—"

সুন্দরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—"আচ্ছা আমি তাহলে যাচ্চি," রুমালে চোখ মুছিতে ব্যস্ত স্বর্ণকে বলিল, "চল্লুম সোনা! এবার যেদিন আসবো, তোমায় এসব প্রলাপ বকতে যেন শুনি না, তাহলে ভারী রাগ করবো কিন্তু তা' বলে রাখছি,—আর আসবো না।"

স্বর্ণলতা মৃদু গুঞ্জনে শুধু আপনা আপনি বলিল—

"পেরলাপ! আমার যেন জ্বর বিকার হয়েচে!"

ডাক্তার আসিয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিতেই সেখানে প্রচুর বর্ষণ-চিহ্ন পাইয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—

"এই যে আজও আবার কেঁদেচেন দেখচি! কেন? বেশ ভালই তো আছেন? তবে আবার কান্নাকাটী কেন? এ কান্নাটা আপনি থামাবেন কবে বলুন তো?"

স্বর্ণ কান্না থামানর চেষ্টাই করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তারের এই অনুযোগে সে আর আত্মদমন করিতে পারিল না, হঠাৎ একান্ত উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া সে বেড-কভার টানিয়া মুখ ঢাকা দিল, কান্না-ধরা গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,

"কান্না আমার থামবে সেই একেবারেই,—তার আগে আর থেমেচে।"

ডাক্তার সেন অপ্রসন্ন মুখে নির্ব্বাক ম্লানমূর্ত্তি আরতির দিকে ফিরিলেন,—

"মিস রায়! তোমার রোগীকে প্রফুল্ল রাখতে না পারা তোমারই কর্ত্তব্যের ত্রুটী বলে আমি মনে করি। পূর্ব্বের মত এ বিষয়ে তুমি হয় ত মন দিতে পারচো না। তোমার কাছে আমি এ-রকম আশা করি নি।"

তিরস্কৃতা আরতি তার নত মুখ আরও খানিকটা নত করিল মাত্র, উত্তর বা কৈফিয়ৎ সে দিতে চেষ্টাও করিল না; চেষ্টা করিবারও তার বিশেষ কিছু ছিল না।

ত্রুটী? হ্যাঁ, ত্রুটী বই কি! তার না হোক, তার অদৃষ্টের এ মহা ত্রুটী, মহা অপরাধ, তা'তে আর সন্দেহ কি? নাঃ, এতবড় ভাগ্যবিড়ম্বনা সংসারে প্রায় দেখা যায় না বটে!

কিন্তু তার বুক যে অবর্ষিত অশ্রুভারে গভীর ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছিল, সেখানে নূতন বেদনায় আর মেঘ জমিবার স্থান ছিল না, স্তব্ধ অচল অনড় হইয়া সে নত নেত্রে যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া এই অযথা অভিযোগে নিজেকে অভিযুক্ত হইতে সায় দিয়া গেল। বলিল না, আমি তো আপনাকে এ কথা অনেকবারই জানিয়েছি।

স্বর্ণলতার কান্না কিন্তু আরতিকে তিরস্কৃত হইতে দেখিয়া এবার সহজেই থামিল, সে মনে মনে কিছু যেন তৃপ্ত হইল। আরতির প্রতি সকল ভালবাসাই তার একটা প্রচণ্ড ঈর্ষায় নিঃশেষ হইয়া গিয়া তার স্থানে

তীব্র একটা জ্বালাময় বিদ্বেষ দেখা দিয়াছিল। সে বিদ্বেষটা এতই প্রবল যে যদি তার সাধ্য থাকিত তো, হয় ত সে আরতিকে নিজের হাতে খুন করিতেও পারিত। আরতি যেন তার চক্ষুশূল, তার চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। মনে মনে সে কহিল, একবার ভাল করে পরীক্ষাটা করে দেখি, তার পর ডাক্তারকে বলে দিচ্ছি পাপটাকে বাড়ি থেকে দূর করে।

৩৩

সলিল আসিলে অভিমানের জ্বালায় মনের সুখ থাকে না, কিন্তু সে না আসিলেও যে অসহ্য দুঃখ দেখা দেয়! পূর্ব্ব দিন আসিয়া স্বর্ণকে অত্যন্ত অস্থির ও ক্রন্দনোন্মুখ দেখিয়া গিয়াছে বলিয়াই হয় ত সলিল এদিন আর ভরসা করিয়া সকাল বেলাই স্ত্রীকে দেখিতে আসিল না,—আসিলেন মহামায়া। শাশুড়ীকে দেখিয়াই স্বর্ণর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। যিনি একদিন তাহাকে সোনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, আজ তিনিই যেন তাঁর বধূটীর দু'টী চক্ষের বালাই হইয়া উঠিয়াছেন। স্বর্ণলতার মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস জাগিয়া আছে যে, সলিল যে তার সঙ্গে নির্লিপ্ত ভাবে চলে, এর মধ্যে তার মায়ের একটুখানি প্রশ্রয় আছে,—পাছে ছেলে বউয়ের বশ হইয়া যায়, তাই তিনি তাকে হাতে রাখিয়াছেন।

মহামায়া মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ মা, বৌমা? শরীরটায় একটু বল পাচ্ছো কি? ক্ষিধে একটু হচ্ছে?"

স্বর্ণ কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তার মনে হইল, নিশ্চয়ই সলিলের আসা আজ তার মাই বন্ধ করিয়া নিজে আসিয়াছেন,—

রুগ্ন বউয়ের বিছানায় বেশিক্ষণ তাঁর ছেলের থাকা তিনি তো কোন দিনই পচ্ছন্দ করিতেন না।

বধূকে নীরব দেখিয়া মহামায়া আরতির দিকে চাহিলেন, "বৌমার শরীর কি ভাল নেই নার্স?" বলিয়াই তাঁর হঠাৎ ভাল করিয়া আরতির মুখ নজরে পাড়িয়া গেল। তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন,—নার্স! তাঁর মনে হইল, সে যেন নার্স নয়, আর কেউ! এই বয়স, এত রূপ, এমন একটা মুখের ভাব, এ কি সামান্য একটা নার্সের! তিনি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, চোখ তাঁর সহসা ফিরিতে চাহিল না।

আরতি তাঁর প্রশ্নেই একটু বিপন্ন বোধ করিয়াছিল। তাঁর বধূর শরীর ভাল নাই, অথবা মন ভাল নাই,—এর কোন্ কথাটাই বা বলিবে এবং কোন্টা বলিলে সে চটিবে না,—তার আজকালের মেজাজ দেখিয়া সে ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। তাই উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াই সে নিরুত্তরে রহিল। মহামায়া আর কোন কথা কহিলেন না, তাঁর উপস্থিতি যে তাঁর পুত্র-বধূকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, সে কথা জানিতে তাঁরও বাকি ছিল না—এতই সুস্পষ্ট এ বিরক্তি।

হঠাৎ সলিল আসিল। ডাক্তারের কাছে গিয়াছিল, ডাক্তার বলিয়াছেন, স্বর্ণলতার যে আশাতিরিক্ত উপকার হইয়াছিল, তার সমস্ত-টুকুই প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, এবং এর জন্য সলিল কিছু এবং নার্সও কিছু দায়ী। উভয়েই পূর্ব্বের মত তাঁদের কর্ত্তব্য পালনে অবহিত হইতেছেন না। সলিল তাই নিজের প্রতি কঠিনভাবে চোখ রাঙ্গাইয়া তার দিকের কর্ত্তব্য পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু কর্ত্তব্য তার পালন করা কঠিন হইয়া পড়িল,—মা রহিয়াছেন। তার পর সেই ঘরেই চোরের মত নতমুখী কুণ্ঠায় অস্থির আরতির প্রতি চোখ পড়িতেই তার সকল কর্ত্তব্যই সে বিস্মৃত হইয়া গেল, তার মনের

অবস্থা মনে মনে অনুভব করিয়া ওই অভাগা নারীর প্রতিই তার অন্তরের সমুদয় অনুকম্পা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তার মনে গভীর সহানুভূতির সহিত জাগিয়া উঠিল, তার মায়ের প্রতি অভিমান। মা না বিরোধী হইলে তাদের দু'জনের জীবন কি আজ এমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইত!—না জানি আরতি আজ তার মাকে দেখিয়া কি ভাবিতেছে?

এই ভাবিয়া পুনঃ পুনঃই সে চকিত-চক্ষে আরতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। কিন্তু তার সেই চঞ্চল দৃষ্টিপাত সেখানকার দু'জন দর্শকের কাছেই অজ্ঞাত রহিল না। তার চোখের সেই অনুরাগ দীপ্ত, করুণা-কাতর চোখের ভাষায় স্বর্ণলতার জ্বলন্ত চিত্ত দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল, আর সে দৃষ্টির অভিনবত্ব বিস্ময়ে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিল মহামায়াকে।

সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়া সুন্দরাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া মহামায়া তাকে প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি তো কাল বৌমাকে দেখ্‌তে গেছলে সুন্দরা! বৌমার নার্সটীকে তোমার কেমন মনে হলো?"

সুন্দরা এ প্রশ্নে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তার পর শান্ত হইয়া সহজ কণ্ঠেই প্রতিজিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মা?"

মহামায়া বলিল, "তা জানি না সুন্দরা! আমার কিন্তু আজ বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে ওর প্রতি সলিলের ভাব দেখে। কি জানি মা! শেষে কি ছেলে আমার বয়ে যাবে? এত সাবধানে মানুষ করে আমার বুদ্ধির দোষেই শেষটা ওকে আমি নষ্ট করে দিলুম সুন্দরা! আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছে করচে না মা!"

সুন্দরা নীরব রহিল,—সে যে কি বলিবে, কিছুই যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

মহামায়া বলিতে লাগিলেন, "ওর ওই মনের ভাব—একটুক্ষণ দেখেই

যা আমি বুঝতে পারলুম, বউমা দেখতে পেলে যে কি করবে তাও জানিনে! তার পর যেমন সব শুনেচি,—সলিল যদি ঐ নার্স ছুঁড়িটাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে টালিয়ে যায়, কি হবে মা ?"

এবার আর স্থন্দরা নীরব থাকা সঙ্গত বোধ করিল না। সে আহত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না মা! ওরা অত ছোট নয়! ঐ যে নার্স, ওই সেই লক্ষপতি অতুলেশ্বরবাবুর মেয়ে আরতি—মুসুরিতে দেখে সলিল যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তোমার মত নয় জেনে ঐ মেয়ে—ঐ ধনীর দুলালী নিজেকে নার্স করে রেখেছে, তবু ওকে বিয়ে করতে কিছুতেই মত করেনি,—তবে অন্যকেও আর সে বিয়ে করেনি, আইবুড়ই রয়েছে।"

মহামায়ার বিস্মিত কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইয়া আসিল, "ওমা, ও যে সোনার প্রতিমা রে!"

স্থন্দরা বলিতে লাগিল—"পাছে সলিল স্বর্ণকে বিয়ে করতে রাজী না হয়, তাই সে নিজেকে এত দিন তার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলেছিল। হঠাৎ এত দিন পরে এই অদ্ভুত ভাবে দেখাটা হয়েই মুস্কিল হয়েছে! সলিলকে আমি ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে বল্লে সে কিছুই জানতো না, মাত্র এই ক'দিনই জান্তে পেরেচে। আমি তাকে বলেছি, ডাক্তারকে গিয়ে সে যেন নিজেই নার্স বদলে দেবার জন্য বলে। যদি দরকার হয় তার কারণও তাঁকে জানালে তাতেও কোন দোষ নেই! ওদের জন্য ভাবনা নেই মা, ভয় রয়েছে এখন স্বর্ণর জন্যেই।"

মহামায়া এক দিকে আশ্বস্ত এবং অপর দিকে একান্ত অনুতপ্ত এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বিষাদিত-কণ্ঠে কহিলেন, "আমার কর্ম্মের দোষ,—না হলে হতভাগী আমি, রূপ দেখেই বা কাণ্ডজ্ঞান হারালুম কেন!"

স্থন্দরার উপদেশে সলিল ডাক্তারের কাছে গিয়াছিল। তার উদ্দেশ্য

ছিল, আরতিকে স্বর্ণলতার নার্সিং হইতে মুক্তি দিবার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করা। কিন্তু ডাক্তার যখন নিজেই নার্সের কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটী করার কথা তুলিলেন, তখন এতবড় সুযোগ সত্ত্বেও সলিল আরতিকে কর্ম্ম-চ্যুত করার কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। দুইটা কারণ আসিয়া তাহাকে এ কার্য্যে নিবৃত্ত করিল। প্রথমতঃ তার মনে হইল, হয় ত ইহাতে আরতির পক্ষে ক্ষতি করা হইবে, ডাক্তার হয় ত তার প্রতি সমধিক বিরক্ত হইবেন,—সলিলের যত ক্ষতিই হয় হোক, আরতির ক্ষতি করা তার পক্ষে অসম্ভব! আর এর সঙ্গে তার আরও একটা কথা মনে হইয়া গেল; সে ভাবিল, আরতি তো জানিয়া শুনিয়াই সলিলের স্ত্রীর সেবার ভার লইয়াছে, অন্ততঃ পরেও তো সে জানিতে পারিয়াছিল, হয় ত—হয় ত আজও সে সলিলকে মনে মনে ভালবাসে, হয় ত তাকে দেখিতে পাইবে বলিয়াই সে এত বড় দুঃসাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সত্যই তা যদি হয়—তবে কি তার এই সামান্য ইচ্ছাটুকুতেও বাধা দেওয়া তার পক্ষে সঙ্গত হইবে? সলিল হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। একবার তার মনে হইল, না, এ'তে তার পক্ষে অন্যায় হইতেছে; সে এখন অন্য নারীর স্বামী, আরতিকে দেখিবার—দেখা দিবার অধিকার আর তার নাই,—কেন সে আরতির এ খেয়াল-খেলার প্রশ্রয় দিবে? একদিন যে তাহাকে অনায়াসে ভালবাসে না জানাইয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ যদি আবার তার সেই অনাদৃত অবমানিত অবহেলিতকে মনে পড়িয়া থাকে, তার পক্ষে হয় ত বা ইহাতেও কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু সলিলের মনের গঠন অন্যরূপ,—সে আর এ খেলা সহ্য করিতে অক্ষম। তার উপর স্বর্ণলতার পক্ষে হয় ত বা ইহা সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে। না—সলিল আর একে প্রশ্রয় দিবে না। এ খেলার—এই হৃদয়-হীন খেয়ালের এইখানেই সমাপ্তি হোক—

কিন্তু তার আরতির প্রতি তীব্র প্রেম এবং পূর্ণ স্নেহ তাহাকে এ চিন্তাতেও প্রশ্রয় দিতে পারিল না, একবার আরতির সঙ্গে কথা না কহিয়াই সে এ সম্বন্ধে কিছুই করিতে সমর্থ হইল না, মনে মনে স্থির করিল একবার আরতিকে শুধু জিজ্ঞাসা করিবে, সে কেন স্বর্ণলতার ভার লইয়াছে? তার পর যা করিবার করিবে।

সুযোগ সেদিনও ঘটিল না। কিন্তু তার সেদিনের সেই সহানুভূতি-পূর্ণ সস্নেহ দৃষ্টি তাদের জীবনের উপর একটা আকস্মিক দুর্যোগের ঝড় তুলিবার নিমিত্ত কারণ হইয়া উঠিল। স্বর্ণলতা সে দৃষ্টিকে আর কিছুতেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হইল না।

৩৪

আরতির শরীর মন আর যেন বহিতেছিল না। সুন্দরাকে দেখার পর হইতেই মঞ্জুর স্মৃতি তাহাকে সর্ব্বক্ষণ যেন গভীর ভাবে পীড়িত করিতে লাগিল। তার জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা হৃদয় মন যেন কার কঠোর হাতে আকর্ষিত বীণার তারের মতই এক মুহূর্ত্তে খান খান হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়া সেখান হইতে একটা বেসুরা বিকট যন্ত্রণার্ত্ত কান্নার ধ্বনি উঠিয়া আসিতে লাগিল। বুক তার যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিয়া তার আর্ত্ত চিত্ত উচ্চরবে বলিতে চাহিতেছিল, মঞ্জু রে! , ওরে যাদু আমার! আমি যে বেঁচে থেকেও মরে রইলুম! ওরে, আর কি কখন তোকে আমি দেখতে পাবো না!

সেদিন সলিলের মার সান্নিধ্য তার একান্ত অসহ্য মনে হইলেও তাঁকে দেখিয়া তার মন কিন্তু একটুও বিদ্বিষ্ট হয় নাই। একবারও তার তাঁকে

তার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু বলিয়া মনে পড়িল না। বরং মা বলিয়া শাশুড়ীর শ্রদ্ধায় সে মনের মধ্যে তাঁহাকে নীরব প্রণাম নিবেদন জানাইল। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর রূপজ্যোতিভরা মহীয়সী মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে মনে মনে কহিল,—

"আমায় নাও বা না নাও, তুমি আমার মা, ছেলেকে দুঃখ দিয়ে তুমিও যে দুঃখ পাচ্চো, তা আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারচি। কি করবে? ভাগ্য আমাদের মন্দ, তোমার দোষ কি?"

সেদিন সে ডাক্তার আসিলে তাঁকে জানাইল, অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েকের জন্য যেন তাকে সেবাভবনে যাওয়ার অনুমতি দিয়া যান। সেখানে যে রোগী —তার শিক্ষয়িত্রী, স্বর্ণলতার ভার লওয়ার পূর্ব্বে তার চার্জ্জে ছিল, তার অসুখ বেশি হইয়াছে, তাঁহাকে সে আজ একবার দেখিতে যাইবে। আসল কথা এই বাড়ীর আবহাওয়া এবং বিরক্তি-বিরস এবং একান্ত অসহিষ্ণু স্বর্ণলতার নিয়ত সঙ্গ আরতি আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অথচ, সে বুঝিয়াছে, তার পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত, এ বিধান তার ভাগ্য-বিধাতার, এর হাত হইতে তার উদ্ধার নাই। এ তাহাকে সহিতেই হইবে।

তথাপি যতটুকু সময়ই হোক, এখান হইতে সরিয়া পলাইতে পারিলে সে যেন খানিকক্ষণের জন্যও বাঁচে।

ডাক্তার সেন আরতির বিষাদ কালিমালিপ্ত ম্লান মুখের দিকে স্থির-নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবু যতটুকু পারা যায় কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা!"

তার পর তাঁহার মৌন নত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়াই স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'বড্ড বেশি Suffer করতে হচ্চে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার কর্ত্তব্যের সে আনন্দ হারালে কেন? তার মধ্যে তো ব্যক্তিত্ব ছিল না,

এ আবার কোথা থেকে খুঁজে পেলে? না—না মালতী! পৃথিবীতে আমায় অন্ততঃ একজনের উপরেও এটুকু নির্ভর রাখতে দাও—একজনকেও শ্রদ্ধা করতে দাও,—এর জন্য নিজের কোন লাভ ক্ষতির পরিমাপ করতে যেও না।—শুধু কর্ত্তব্য করে যাও। এ কি একজনকেও করতে দেখবো না? এ কি এত কঠিন?"

আরতির চোখ দিয়া এই স্নেহবাণী সহসা তার ভিতরে জমান অনেক-খানি জলের মধ্য হইতে কয়েক ফোঁটা অতর্কিতে ঝরাইয়া ফেলিল। সে সহসাই নত হইয়া তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া গাঢ় স্বরে, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাই আমি পারি"—বলিয়াই ত্বরিৎপদে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার একটু বিমনা ভাবেই চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া এক সময়ে ধাত্রী-বিদ্যায় বেশ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিল। আজ নিরাত্মীয় কুমারী জীবন তার পরের হাতেই শেষ সেবা লইতে এই-খানেই তার শেষ-শয্যা বিছাইয়াছে। রোগ দীর্ঘকালের সঞ্চিত, ক্রমেই সে ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। মালতী তাহাকে তার সমস্ত চিত্ত দিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল, সে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে যোগমায়া নিয়তই তার অভাব অনুভব করিতেছিল, আরতিকে দেখিয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

কথায় কথায় যোগমায়া বলিল, "তোমায় একটা কথা অনেকবারই বলেছি মালতী! আবারও বলি, যদি সময় থাকে, এখনও তুমি বিয়ে করো, এখনও ভাল বিয়ে তোমার হ'তে পারে, এর পর কিন্তু আর সময় থাকবে না।"

দিনের বেলায় বিদ্যুতের মত ক্ষীণপ্রভ অথচ অতি তীক্ষ্ণ দুঃখের হাসি হাসিয়া আরতি উত্তর করিল,—"সময় এর মধ্যেই আর নেই, সে কথা তো অনেকবারই বলেছি দিদি! বিয়ে কি সবার জন্য হতেই হবে?"

যোগমায়া দুঃখিত স্বরে কহিল,—"প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিশ্চিতই একদিন তার প্রতিশোধের পাত্র হতেই হবে, এ জেন মালতী! নারী পুরুষের যাঁরা কর্ম্মসমন্বয় করে দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা অদূরদর্শী বা নির্ব্বোধ ছিলেন না। যে মেয়ে তার প্রকৃত পথ না চিনে নিজের হ'য়ে নিজেই যুদ্ধ করতে দাঁড়ায়, জীবনের শেষ ক্ষণে তাকে নিশ্চয়ই তার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আক্ষেপ করে যেতে হবে, এ আমি অনেকবারই দেখেছি। তারা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে, তখন আর তা শোধরাবার সময় থাকে না—এই যা দুঃখ! মরবার সময়ে আশে পাশে ভালবাসা-মাখা ম্লান মুখ, আর সেবাপরায়ণ কাঁপনভরা হাতের দেওয়া জলটুকুন্ এ যদি না পেয়ে গেলুম, তবে জগতে এসে আর পেলুম কি রে?"

যোগমায়ার শুষ্ক নেত্র জলের আভাষে ঝাপসা হইয়া আসিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া নিজের রোগপাণ্ডুর শীর্ণ গণ্ড সেই অশ্রুজলে ঈষৎ সিক্ত হইতে দিয়া তার 'পর একটা মৃদুশ্বাস মোচন পূর্ব্বক সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "একেবারে দিন চলে যাবার আগে নিজের ভুল খেয়ালটাকে ভুলে গিয়ে এখনও সোজা পথে চলতে চেষ্টা করিস্ মালতী! এর পরে অনেক পরে আমার মতন পস্তাসনে দিদি! পস্তাতে হবেই সেই, এ ধরা কথা,— আচ্ছা ভেবেই দেখ, যখন বয়েস বাড়বে, খাটতে পারবি নে, তখন তোকে বসে খাওয়াবে কে? পাসটাসও তো করলিনে, এই নার্সগিরি করে আর কত টাকাই জমাতে পারবি ভাই? যে, অসময়ে বসে খাবি?"

আরতির ক্লান্ত চিত্ত তর্কের জন্য সায় দিল না। সে শুধু দুর্ব্বলভাবে প্রত্যুত্তরে কহিল,—"স্বামী পুত্রই কি সকলের খুব রোজকেরে হয় দিদি? দুর্দ্দশা কপালে থাকলে তার হাত এড়ানো সহজ নয়,—সে ঘটবেই।"

তার নিজের জীবনের এই নূতন সমস্যার কথাটাই মনে হইতেছিল।

যোগমায়া মৃদু বিষাদের হাসি হাসিল,—

"কপাল ছাড়া পথ তো নেইই রে ভাই! তাই না লিখেছে—'মিছে এদেশ ওদেশ করে বেড়াও, বিধিলিপি কপালজোড়া'।—তাই জন্যেই তো বলছি, তাইই যখন, তখন আর সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, স্ত্রী না হয়ে, মা না হয়ে নিজের জীবনটাকে শুষ্ক নিঃসার করে তুলে সারা জীবনটা খেটেখুটে নিজেকে খাইয়ে পরিয়েই শুধু শেষ করে দিয়ে আর বেশি কি পেলুম? না হয় নিজের বাড়া ভাতের ভাগটা কারুকে বেঁটে দিতেই হলো না,—এই তো? কি এত লাভ এইটুকুতে যার জন্য অতখানি ছেড়ে দিই?"

আরতির তন্দ্রাচ্ছন্ন চিত্তে এ সব কথা ভাল করিয়া ঢুকিতেই পথ পায় নাই। সে শুধু মনে মনে বলিল, বিয়ে আমার হয়ে গ্যাছে সেই দিন, যেদিন তিনি মুসুরীতে আমার সঙ্গে ছবি বদল করেছিলেন, তার পরও যে আমার এমন দশা—সে ঐ বিধিলিপি।

পরের দিন আবারও সলিল আসিল না। স্বর্ণলতা আজকাল সর্ব্বদাই বিরক্ত হইয়া থাকে। আরতির সঙ্গে ভাল করিয়া আর কথাও সে কহে না! বই পড়া, গল্প করা, সে সব পাঠ তো তাদের উঠিয়াই গিয়াছে। আজ হঠাৎ সে অনেক দিন পরে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, ডাকিয়া বলিল.—

"মালতী! উনি হয় ত আমার ওপোর রাগ করেই এলেন না, একখানি চিঠি ভাই, বেশ ভাল করে গুছিয়ে লিখে আমার হয়ে পাঠিয়ে দাও তো।"

আরতি শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। তার হাতের লেখা সলিল চেনে। সলিলকে তার স্ত্রীর হইয়া পত্র লিখিতে তার একেবারেই ভাল লাগিল না। সে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই বলিয়া উঠিল,—

"না—না, আমি সে পারবো,—সে আপনি নিজেই লিখুন।"

এই বলিয়া সে দ্রুতহস্তে ঘরের একপাশে রাখা আল্‌নার উপর ছড়াইয়া দেওয়া তোয়ালেটা অন্যবস্ত্রকে পাট করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সেটা হইয়া গেলে র‍্যাপার তুলিয়া লইল,—হাত তার তথন কাঁপিতেছে।

মুখভার করিয়া স্বর্ণ কহিল, "আমি ভাল লিখতে পারলে কি আর ওঁকে চিঠি লিখতে তোমায় মধ্যস্থ ডাকতে যেতুম!—ভগবান ঐখানেই যে আমায় মেরে রেখেছেন, লেখাপড়া শেখা আমার আর হলো কই? যে দারুণ রোগে আমায় ধরলো।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আরতিকে নীরব দেখিয়া বিরক্তি-বিরস পরুষ কণ্ঠে কহিল,—

"তাহলে পষ্ট করেই বলে ফেলো না, যে, আমার এতটুকু উপকার আর তোমার দ্বারা হয়ে উঠবে না? কিন্তু আমি বলি, তা' হবে নাই বা কেন? আমার সব হুকুম শোনবার ভার তো তুমি ইচ্ছে করেই নিয়েছিলে? না যদি পেরে ওঠো, তোমার ডাক্তারকে সে কথা বরং জানিও, যতক্ষণ আমার কাছে আছ, আমার কথা মানতেই হবে।"

আরতি গাঢ় রক্তবর্ণ মুখে আনত নেত্রে লিখিবার উপাদান লইয়া আসিয়া বসিল।

স্বর্ণ বিদ্যুতের মত তীব্র দৃষ্টি তার সেই আরক্ত মুখে হানিয়া বলিতে লাগিল, "পাঠ কিছু লিখতে হবে না, অমনিই লেখ,—'আজ তুমি এলে না কেন? জানো না কি তোমায় একটিবার চোকের দেখা দেখতে পাবো বলেই এত কষ্ট সয়ে আছি! কি নিষ্ঠুর তুমি? একবার এসে চোকের দেখাটাও দিয়ে যেতে পারলে না? পুরুষ ভুলতে পারে, কিন্তু মেয়েরা পারে না, তুমি যত দূরেই থাক, আমি জানি তুমি আমারই,—

আর কারু হতে পারো না। আমার দিব্যি রইলো, যদি না তুমি রোজ আস। ইতি

তোমারই'—

নাম লেখার দরকার নেই, এই রকমই থাক।"

আরতি চিঠিখানা ব্লট করিয়া খামে ভরিল। উপরে সুন্দরার বাড়ীর ঠিকানা সে আত্মবিস্মৃত ভাবেই লিখিয়া ফেলিল। তাকে ঠিকানা লিখিতে দেখিয়া স্বর্ণলতা আবারও একটা অগ্নিবর্ষী তীব্র দৃষ্টিশেল তার প্রতি প্রয়োগ করিল। অন্যমনস্ক আরতি তাহা লক্ষ্যও করিল না।

লেখা শেষ হইলে আরতি জিজ্ঞাসা করিল,—"চিঠিখানা কি ডাকে পাঠাব?"

বলিয়া মুখ তুলিয়া স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিতেই অবাক্ হইয়া গেল। তার মুখ কি অস্বাভাবিক দীপ্ত; দুই চোখে যেন তার আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

বিছানার উপর মুখ গুঁজিয়া দিয়া প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিতে করিতে করিতে স্বর্ণ কহিল,—

"না দরোয়ান যাক্,—"

পত্র পাঠাইয়া দিয়া নিজের ঘরে আসিয়া আরতি বসিয়া পড়িল। মনে মনে সে ভাবিল, কি অচ্ছেদ্য বন্ধনেই যে সে ইহাদের সহিত সংবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে—ইহা হইতে তার যেন কিছুতেই আর মুক্তি নাই! অদৃষ্টের এ যে কি তীব্র পরিহাস,—ভাগ্যদেবতার এ কি নির্ম্মম খেলা!

স্বর্ণলতার ব্যবহার তার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তার চেয়েও অসহনীয় হইয়াছিল সলিলের করুণা-সজল দৃষ্টি! যতই তাহারা পরস্পরকে পরিহার করিতে সচেষ্ট থাক, তবু সেই এতটুকু চকিত স্ফুরিত ক্ষণিকের চাহনি, সে যেন রাত্রি দিন ধরিয়াই তাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতে থাকে, তার সর্ব্বশরীরে এবং মনে সে যেন তাহা সর্ব্বদাই অনুভব করিতে থাকে। সে দৃষ্টির নীরব বেদনা, ক্ষুব্ধ চিত্তের তিরস্কার নির্ব্বাক্ ভাষায় নিবেদন করিয়া দেয়—সে দৃষ্টির ব্যথিত সহানুভূতি তেমনই গোপন বিষাদে তার দিকে চাহিয়া বলে,—এ কি অদৃষ্ট তোমার আরতি! যেখানে রাণী হইতে পারিতে, সেখানে কি না বাঁদী হইয়া আসিলে?

না—না, অসহ্য!—অসহ্য! আরতিও মানুষ। দাসখত লিখিয়া দাসীত্ব স্বীকার করিলেও সে ক্ষুদ্র মানবী বই আর কিছুই নহে। পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া সে নিজেকে ইহজীবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাতেও সে নিঃস্বার্থ ছিল না;—সে দিনে সুখের চেয়ে শান্তিই যে তার একমাত্র কাম্য ছিল। এ অশান্তির দাহ সে আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছে না। না—না, আর না, এ বন্ধন তাহাকে কাটাইতেই হইবে।

দ্রুতকম্পিতহস্তে ডাক্তার সেনকে সে একখানা পত্র লিখিল। পত্রে যতখানি জানানো যায়, তাহা সে খুলিয়াই লিখিল। লিখিল—"আপনি আমার অবস্থা এবারেও বুঝিবেন কি না জানি না, বুঝাইবার সাধ্য আমারও নাই,—একদিন আমার গোপন রহস্য আপনি আপনা হইতেই জানিতে চাহিয়াছিলেন, সে রহস্য আজ আমি আপনাকে জানাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই,—একদিন যে বাড়ীর সকল সম্বন্ধ সকল অধিকার নিজের হাতের কাছে পাইয়াও কোন বিশেষ কারণে তাহা নিজেই আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, আজ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় নিজের অজ্ঞাতে ঢুকিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় সে বাড়ীর দাসীত্ব পর্য্যন্ত আমায় বহন করিতে হইতেছে! ভগবান জানেন, আমি কত চেষ্টাই না এখান হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য করিয়াছি,—এবং আপনিও জানেন যে আপনারও সে কথা আদৌ অজ্ঞাত নহে? কিন্তু আমার ভাগ্য একান্ত বিরোধী, তাই সে চেষ্টা আমার কোন মতেই সফল হয় নাই। ফলে যে ক্ষতি কোন দিনই আমার অভিপ্রেত ছিল না, তাহাই আমার উপলক্ষেই ঘটিতেছে!—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া আর যেন তার কথা যোগাইল না, তাই পত্র লেখা সে বন্ধ করিয়া দিল।

পাশের ঘরে তখন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে,—সে শব্দ হয় ত বা তার কাণে, হয় ত বা তার মনের মধ্যেই প্রবেশ করিল না,—সে কলম হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কি লিখিবে? কেমন করিয়াই বা লিখিবে?—এ চিঠি পাঠাইতে যে লজ্জা বোধ হয়। না জানি তিনি এ পত্র পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবেন? এ পত্র পাঠাইবার পর আর কিসে ডাক্তার সেনের সাক্ষাতে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে?

অর্দ্ধলিখিত পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে নিতান্ত অবসাদ-গ্রস্ত শিথিল শরীরে বিছানার উপর এলাইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তাতেই কি সুখ আছে?—সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হইল, এ বাড়ী, এ ঘর সলিলের! অমনি আসানপুরের শেষ রাত্রি তার মনে পড়িয়া গেল। সে রাত্রে সে চোরের মত লুকাইয়া একবার—মনে করিয়াছিল বুঝি বা সেই প্রথম ও শেষবার,—সলিলের শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া তার বিছানায় তার বালিশে মাথা রাখিয়াছিল। আর—মনে করিতেই তার চোখ দিয়া দর-দর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।—আর—আর—সেই তার উপভুক্ত শয্যাতলে পড়িয়া তার গায়ের গন্ধ, হাতের স্পর্শ নিজের দেহে মনে অনুভব করিয়া, সেদিন সেই তার মাথার বালিশের উপর সে তার অনেকখানি বুকফাটা অশ্রুজলের সঙ্গে তার উদ্দেশ্যে আঁকিয়া দিয়া আসিয়াছিল,—তার প্রগাঢ় প্রেমে পরিপূর্ণ প্রথম চুম্বন-রেখা।

সেদিন সলিল একমাত্র তারই ছিল, কিন্তু আজ?—আরতি কাঁদিয়া ফেলিল,

"কেন, আমায় আবার এখানে টেনে আনলে হে ভগবান! সে কি আমার দর্প চূর্ণ করতে?"

সহসা সবিস্ময়ে শুনিল, তার মাথার কাছে অত্যন্ত মৃদু স্বরে কে যেন ডাকিতেছে,—

"আরতি!"

এ নামে তাহাকে আর কে ডাকিবে?—এ কি! এ যে সত্যই সলিল! তার কল্পনা তো নয়!

সলিল আসিয়া আরতির অনতিদূরে দাঁড়াইল। অশ্রুজলে আরতির সমস্ত মুখ তখনও শিশিরে ভেজা পদ্মের মতই আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে। তার

সুবৃহৎ স্থির গাম্ভীর্য্যময় নেত্র দু'টী সলিল-সিক্ত পদ্মপত্রের মতই টলটল করিতেছিল. তাহা হইতে তখনও সূত্রচ্ছিন্ন মুক্তামালার মত, অজস্র অশ্রুবিন্দু টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে অশ্রু সংবরণ করিতে আজ আরতির মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তেরও সাধ্য হইল না। সলিলের মনের কঠিন ভাষা সেই অনুতপ্ত অশ্রুস্রোতে কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। সে যে সব কথা বলিবে বলিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়া নীরবে আরতির অশ্রু-প্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘর নিস্তব্ধ, বাহিরের কোলাহল উদ্যানের মধ্যস্থতায় কিছু মন্দীভূত হইয়া প্রবিষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, জানালার বাহিরে ছাদের কার্ণিসের উপর বসিয়া যে পাখীটা এতক্ষণ ডাকিতেছিল, সেটা হয় ত আপনার নীড়ের উদ্দেশ্যে উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

আরতি আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া খাট হইতে নামিতে গেলে, সলিল তাহাকে বাধা দিয়া ঈষৎ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আমার কইবার আছে, একটু বসো।"—

আরতি আদেশ পালন করিল। কথাগুলা যে কি, সে কথা বুঝিতে তার বিলম্ব ঘটে নাই। সলিল তবে বিচারকের দাবীতেই আজ তাকে দেখা দিয়াছে?—হয় ত সে তা' করিতে পারে!

সলিল নিজে আসন গ্রহণ করিল না, পূর্ব্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—

"অনেক কথাই জানতে ইচ্ছে করে আরতি! কত প্রশ্নই যে এ তিন বৎসর ধরে আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে, সে বোধ করি হিসাব করা যায় না,—কিন্তু কিই বা আর জান্‌বো? জেনেই বা আর কি? যা হ'বার সে ত আমার হয়েই গ্যাছে! জীবন যে এত বড়

দুঃসহ হতে পারে—এ তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন দিনই তা' আমি ভাবতে পারিনি! যাক্ সে কথা, আমার দুঃখ আমি তোমায় শোনাতে আসিনি, —আমার যা বলবার আছে বলে নিয়ে, তার পর তুমি আমায় কি বল্‌বে তাই শুনে যাব।"—

এই বলিয়া সলিল আরতির মৌন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর এক মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—"তুমি হয় ত আমাকে একটুখানি ভুল বুঝেছিলে আরতি! সেইটুকু আমার বুকে—যে শূল আমার জন্য ব্যবস্থা করে তুমি দিয়েছ; তার মাঝখানেও কাঁটা হয়ে ফুটে আছে। বলা উচিত ভেবে আজ নিতান্ত অপ্রয়োজনেও তাই তোমায় জানাচ্ছি, আসানপুরে আমার নির্লিপ্ততাকে যদি তুমি আর কিছু মনে করে নিয়ে থাকো, সে তোমার ভুল, এবং হতে পারে—আমার নির্ব্বুদ্ধিতা। তোমায় কোন রকমে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তোমায় অসুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ দেখেই বিয়ের কথাটা পাড়তে আমি দেরি করেছিলুম, এর থেকে যে অন্য সন্দেহ তোমার মনে জাগতে পারে, ঈশ্বর জানেন—সে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

আরতি আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দেবতাকে দানব যদি কেউ ক্ষণিকের জন্যও নিজের মনের পাপে ভেবেই থাকে, ভগবান তার সেই ভুলকে বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দিতে পারেন না! আমি যে আপনাদের সাংসারিক সুখের জন্যেই চলে এসেছিলুম, এও কি আপনাকে আজ আবার বলতে হবে?"—আরতির যে অশ্রু অনেক কষ্টে প্রশমিত ছিল, তাহা আবার পতনোদ্যত হইয়া উঠিল।

অভিমানাহত কণ্ঠে সলিল কহিল,—

"তবে কেন লিখেছিলে আমায় তুমি ভালবাস না? তখন অবশ্য সে কথা আমার বিশ্বাস হয়নি,—কিন্তু এত দিনে ধারণা আমার একটুখানি

বদলে গেছে। এই ডাক্তার সেনই হয় ত বা তোমায় আমাকে ভালবাসতে দেননি—না? ইনি নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব্বপরিচিত?”

আরতির উদ্গত অশ্রু-প্রবাহ একটা সুবিপুল বিস্ময়ের তাড়নায় চোখের মধ্যে ফিরিয়া গেল, সে হতবুদ্ধির মত উচ্চারণ করিল,—

“ডাক্তার সেন?—ডাক্তার সেন কি করেছেন?”

সলিলের শান্ত দৃষ্টি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হইল, গলার স্বর তাহার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে তীব্র দৃষ্টি আরতির মুখে স্থির করিয়া বলিল,—

“তিনি তোমায় ভালবাসেন। আমার মত কি না বলতে পারিনে, তবে খুবই বেশী—এটা বলতে পারি। সে কি তুমি নিজেই না জানো, আরতি?”

আরতির ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল,—কোন মতে সে কহিল, “উনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন, পৃথিবীতে উনিই আমার আজ একমাত্র বন্ধু, কিন্তু না—না,—ও কথা আপনি বলবেন না।”—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সলিল কোন কথা বলিল না। তার কান্নাতেও সে বাধা দিল না। তার দুই নেত্রের তীব্র ঈর্ষা-জ্বালা যেন সে আরতির ঐ অশ্রুধারায় ধুইয়া লইতে চাহিয়াই নিষ্পলক নেত্রে তার অশ্রু-পরিপ্লুত মুখখানা দেখিতে লাগিল। তার পর আরতিকে শান্ত হইবার অবসর দিয়া প্রশ্ন করিল,—

“আমায় ডেকেছিলে কেন আরতি?”

আরতি বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল, কহিল,—“আপনাকে ডেকেছিলুম? —সে কি!”

সলিল আরতির ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিতে গিয়া সহসাই যেন মনের কাছে মার খাইল। আরতি তাকে ডাকিয়া আনিয়া এখন যে লজ্জায় পড়িয়া অস্বীকার করিতেছে, এই কথাই তার সোজাসুজি মনে

হইয়াছিল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল আরতির গত চরিত্র! সে তো তেমন মেয়ে নয়? সলিলকে ডাকিয়া আনিয়া একটা মিথ্যা অভিনয় দেখাইবার মত লঘু প্রকৃতি তো তার নয়! তবে?

কিন্তু না—না, আরতি তাহাকে ডাকিয়াছে বই কি! না ডাকিলে সে কি কখন এমন করিয়া তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারে? আমার সস্নেহে সে কহিল, "ডেকে কিছু অন্যায় করেছ কি আরতি? আমার বোধ হয় এ ভালই হলো। এমন করে অপরিচিতের মত ব্যবহার আর আমি তোমার সঙ্গে করে উঠতে পারছিলুম না। কিন্তু একটা কথা এখনও আমার জানবার আছে আরতি! এত দিন পরে এমন করে আবার আমায় দেখা দিতে কেন এলে? অত দূরে চলে গিয়ে,—এমন করে আমার এত কাছে কেন তুমি আবার ফিরে এলে? এ কি ভাল করেছ? তোমার মন বলে কিছু নেই, তোমার পক্ষে হয় ত কিছুই অসম্ভব নয়,—কিন্তু আমি তো দেবতাও নই, পাথরও নই, নেহাৎ রক্তে মাংসে গড়া সামান্য মানুষ মাত্র! আমি কি এতটাই সইতে পারবো মনে করেছ?—অথবা বরাবরের মত আমার কথাটা এবারও হয় ত তোমার ভাবতে মনে পড়েনি!"

এ তিরস্কারের মধ্যে যে জ্বালাভরা ভৎর্সনা ছিল,—তার চেয়েও যে তীব্র অভিযোগ তার উপরে আরোপিত হইল, তাহাতেই আরতি যেন মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গেল। সে অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতই উচ্চারণ করিল,—

"আমি কি জানতুম এ আপনার বাড়ী? আর উনি আপনার স্ত্রী? যেদিন থেকে জেনেছি,—ঈশ্বর জানেন,—এ বাড়ী ছেড়ে পালাবার জন্যে কি চেষ্টাই আমি করেছি! কিন্তু এমনই কপাল আমার,—আচ্ছা, আপনি কেন বল্লেন, আমি আপনাকে ডেকেছি? আমি আপনাকে

কিসের জন্য ডাক্‌বো? কে বলেছে এ কথা, যে, আমি আপনাকে ডেকেছি? এত সাহস কি আমার হতে পারে?"

আরতির এই কথায় সলিল যেন ঈষৎ ভয় পাইয়া গেল। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে আরতির উত্তেজনায় ঈষদারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল,—

"তুমি তো আমায় আসবার জন্যে নিজেই চিঠি লিখেছিলে আরতি!"

আরতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে কি আমার লেখা? আমি তো সে আপনার স্ত্রীর কথামত লিখে দিয়েছিলুম।"—তার মুখ সেই চিঠির ভাষা স্মরণ করিয়া গভীর লজ্জায় রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল।—ছি ছি ছি! সলিল শেষে তাকে এমনই অপদার্থ ঠাহর করিল? সে স্বেচ্ছায় এখানে ঢুকিয়া আজ এই নিতান্ত অসময়ে আবার তার স্বেচ্ছা-পরিত্যক্ত অধিকারের মধ্যে চোরের মত প্রবেশ-চেষ্টা এমন হীনভাবেই করিতেছে, এ সন্দেহও তার মনে জন্মিয়াছে না কি?

সলিল সত্যই এ কথা বিশ্বাস করিল না, সে মৃদু হাসিয়া কহিল,—"হ'তে পারে তা',—আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলুম,—কিন্তু ফোনে যখন তোমায় জিজ্ঞেস করলুম, তুমি তো তা বল্লে না? নিজে লিখেছ বলেই তো স্বীকার করলে? তা' না হলে আমিই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভরসা করতুম?—করেছি কি একদিনও?—মনে আমার যাই থাক?"

আরতি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল,—"ফোনে? আমি? কখন করেছিলেন ফোন? আমি তো ও-ঘরে ছিলুম না? কে ধরলে? কে জবাব দিলে? আশ্চর্য্য ত!"

শুনিয়া সলিলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, তার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত-প্রায় থাকিয়া সে খাটের উপর এক প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—

"বুঝেছি!—এ সব তাহ'লে স্বর্ণরই কাণ্ড! কিছু দিন থেকেই তার মনে যে একটা কিছু হয়েছে, তা' আমিও জানতে পারছিলুম। এখন যা' হবে, সে আমার জানাই আছে। হয় ত এ ঝড় তোমার উপর দিয়েও খুব জোরেই বইবে,—জানিনে তার ধাক্কা কতটা প্রবল!—

—যাক,—সে যা হবে, তা' হবে,—তোমায় আমি বলে রাখছি আরতি! আমার কাছে কিছুই তুমি কোন দিন নিতে চাওনি, আজও হয় ত চাইবে না, কিন্তু যদি কখন দরকার বোধ কর,—যত বেশী বা যত কমই হোক—যদি আমার কাছে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়,—আমায় তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বোলো। আজ এ কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে যত বড় অপরাধজনকই হোক,—তবু এ আমি কোন মতেই অস্বীকার ক'রে নিজেকে সাধু সাব্যস্ত করতে পারবো না,—আমি আজও তোমায় ঠিক সেই রকমই ভালবাসি। হয় ত যত দিনই বেঁচে থাকবো আমায় তা' বাসতেই হবে।—"

আরতির বিবর্ণ মুখ বিবর্ণতর হইয়া গেল, তার চোখ নাক, কাণ সমস্ত জ্বালা করিতে লাগিল। কান্না তার বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে উদ্যত হইয়া উঠিল। সে নিজের মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া দাঁত দিয়া সবলে নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া সেই প্রবল রোদনাবেগকে প্রাণপণে প্রশমিত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তার গলার কাছে একটা করুণ কাতর আর্ত্তনাদ ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফোরকের বেগে আপনাকে ফাটাইয়া দিতে উদ্দাম হইয়া উঠিতে লাগিল,—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, অমন করিয়া আর বলিও না! তুমি যে কত স্নেহময় সে কি আজ আমি নূতন করিয়া জানিব? ওগো, সে যে আমার বুকে শেল হইয়া বিঁধিয়া, কাঁটা হইয়া

ফুটিয়া আছে, আমার মৃত্যুর অধিক হইয়া আছে,—এ দুঃখ কি আমার মরণান্তরেই ভুলিবার ?

কিন্তু সলিলের ঐ আত্মাভিব্যক্তি ক্ষত বড়ই যে বিপ্লব আনিতে পারে, সে ধারণা যদি তাদের একটুও থাকিত !

ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘরের মধ্যদ্বার সবেগে খুলিয়া সশব্দে ঘরে আসিয়া ঢুকিল স্বর্ণলতা। তার শীর্ণ মুখ সকালবেলার আরক্তাভ পূর্ব্বাকাশের মত সমুজ্জল রক্তজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছিল। তার কৃষ্ণতার দুই চক্ষু দুইটী প্রদীপ্ত তড়িতালোকের মতই দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তার মধ্য হইতে যে আলো ঠিকরাইয়া পড়িল, তাহা সার্চ্চলাইটের মতই তীব্র এবং এক্সরে'র মতই অস্থিভেদ্য !

একবার চকিত কটাক্ষে দু'জনকার প্রস্তরীভূত মূর্ত্তি দেখিয়া লইয়া, উন্মত্ত ঝড়ের হাওয়ার মতই এক রকমের উন্মাদ হাসি হাসিয়া, স্বর্ণলতা সলিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাল যে তুমি কতই বাস, তার সাক্ষ্য বরং তোমার হয়ে আমিই এঁকে দিচ্চি !

তোমার অস্থি দিয়ে, মজ্জা দিয়ে, প্রাণ থাকে ত তাই দিয়ে, সমস্ত দেহ মন আত্মা দিয়েই তুমি ওকে কত যে,—কত যে ভালবাস, তা আমার মতন ক'রে আর কেউ জানে না—না, হয় ত' তুমি নিজেও না ! এরই জন্যে তোমার চোখ, তোমার মন একটী দিনের তরেও আমার দিকে ফিরে চেয়ে দেখেনি,—সত্যি ক'রেই দেখেনি ! যেচে, কেঁদে, মান খুইয়ে,—বলতে গেলে প্রায় পায়ে ধরে তোমার কাছে আমি যতটুকু পেয়েছি, সে নেহাৎ লোভী বলেই আমি নিতে পেরেছি,—একটুখানি ইজ্জৎ জ্ঞান যে মেয়ের আছে; সে পারে না। সেও যা' তুমি দিয়েছ তা' আমাকে যে দাওনি, সে আমার দেহ বেশ স্পষ্ট করেই অনুভব করেছে ! আমি মুখ্যু হ'তে পারি,—অন্ধ নই। দেখতে পাচ্চি, আমায় উপলক্ষ্য করে কি তোমাদের

চলেছে! আমায় শীগ্‌গির করে মারবার জন্যে ঐ ডাক্তারকে হাত করে, এই জোচ্চুরির ফাঁদ পেতে—ফাঁদ পেতে—ও বাবা!—ও বাবা!—"

স্বর্ণলতা উত্তেজনায় ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল। তার পা টলিতেছিল, হাত কাঁপিতেছিল, কিন্তু সে সব সে গ্রাহ্যও করিল না। পুনশ্চ হতবুদ্ধি, বাক্যহীন, বুঝি বা স্পন্দহীন স্বামীর দিকে তেমনই জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিয়া বলিতে লাগিল,—

"আমার মনের সন্দেহ আজ মেটাবো বলেই অম্‌নি ধারা করে চিঠি লেখালুম। ভাবলুম, যদি সত্যিকারের কোন কিছু না থাকে, তাহলে তুমি আমার চিঠি বুঝে নিয়ে আমারই কাছে চলে আসবে।—তার পর টেলিফোন বেজে উঠলো,—ঘরে ইনি ছিলেন না,—ধর্ম্মের কল কি না!—আমিই ধরলুম, আর হবি তো হ, আমারই কাণে এলো—'কে? আরতি!' আমি তো এঁকে মালতী বলেই জানতুম,—তখন বুঝতে পারলুম, ইনি মালতী নন,—আরতি! মাথায় তখন চট্ করে একটা ফন্দি ঢুকলো,—জবাব দিলুম 'হুঁ!' ইনি বল্লেন, 'আমায় তুমি যে চিঠি লিখেছ, সে চিঠি কি আমার স্ত্রী লিখিয়েছে?' বল্লুম; না!—শুনে, ওঃ, আনন্দ বুঝি আর ধরে না! সেই যে 'সত্যি?' বলে উঠলেন, আমার বুক সেইখানে কেনই যে ভেঙ্গে গেল না!—বল্লেন, 'আমায় তুমি যেতে লিখেছ?' কোন মতে জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ।'—ও বাবা!—ও বাবা!—আর আমার প্রাণে সহ্য হচ্চে না গো!—আমায় এরা মেরে ফেল্লে গো! আমি বাঁচতে পারতুম, আমায় ঐ হতভাগী বাঁচতে দিলে না।—আমার স্বামী কেড়ে নিয়ে পোড়ামুখী আমায় খুন করলে—"

স্বর্ণলতা ঝঞ্ঝাতাড়িত বৃক্ষ-পত্রের মতই কাঁপিতেছিল,—সহসা সে পতনোদ্যত হইতেই আরতি তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল; এবং তখনও সলিলকে তেমনই নিশ্চেষ্ট ও প্রায় নিশ্চেতন দেখিয়া সে

ত্বরিৎ বেগে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু তার চেষ্টা সফল হইল না, পতনোন্মুখী হইয়াও স্বর্ণলতা আরতির সাহায্য-হস্ত গ্রহণ করিল না, সে প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া আরতির হাত সরাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"রাক্ষুসি! সয়তানি! ছুঁস্‌নে আমায়! তোর জন্যেই আমার সব গেছে, আমি এই বয়েসে মরতে বসেছি, তোকে ঝাঁটা মেরে বিদায় না করে আমার—আমার—স্বস্তি নেই নেই—নেই—তুই দূর হ; দূর হ—দূর হয়ে যা—আ—আ—"

আর্ত্তশ্বাস প্রাণপণে টানিয়াও স্বর্ণ তার কথা শেষ করিতে পারিল না,—সহসা রুদ্ধকণ্ঠ ও নিরুদ্ধশ্বাস হইয়া সে সবেগে মাটিতে পড়িয়া গেল। আরতি ধরিয়া না ফেলিলে মার্ব্বেল পাথরের মেঝেয় পড়িয়া হয় ত মাথা তার ভাঙ্গিয়া যাইত। ধীরে ধীরে তাহাকে সেইখানেই শোয়াইয়া দিয়া ভয়ার্ত্ত চোখে সলিলের দিকে চাহিতে গিয়াই আরতি দেখিতে পাইল, দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া অপর কোন ব্যক্তি অত্যন্ত দ্রুত চরণে কক্ষে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সে জুতার শব্দেই চিনিতে পারিল, সে ব্যক্তি আর কেহ নয়, স্বয়ং ডাক্তার সেন। এক দিকে প্রবলতম আশ্বাসে, অপর দিকে তীব্রতম লজ্জায় সে যেন স্রোতোহত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এক একবার তিনি তিনজনের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। স্বর্ণলতার অবস্থা দেখিয়াই তাঁর মুখে চক্ষে একটা নিরাশাব্যঞ্জক গভীর বেদনা, নীরবে প্রকটিত হইয়া উঠিল। তার পর তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ স্তব্ধ অনড় শয্যাতলে উপবিষ্ট সলিলের এবং স্বর্ণলতার ভূমি-প্রসারিত মূর্চ্ছিত দেহের পার্শ্বে নতজানু, ভূমি-লগ্ন দৃষ্টি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত-প্রায় আরতির দিকে চোখ পড়িতেই তাঁর সেই ব্যথিত দৃষ্টি গাম্ভীর্য্য-বিরস হইয়া উঠিল।

অগ্রসর হইয়া তিনি স্বর্ণলতার পাশে নত হইয়া সর্ব্ব প্রথম আরতিকে সম্বোধন করিলেন,—"বাইরে আমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষণি তুমি সেবা-ভবনে চলে যাও, এখানকার চার্জ্জ তোমার শেষ হয়েচে। যাও—যাও - দেরি করো না—"

আরতি নিঃশব্দে কলের পুতুলের মত উঠিয়া, কোন দিকে একটীবার না চাহিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তারের সস্নেহ কণ্ঠে আজ এমন একটা তীক্ষ্ণতা ছিল, যে, তার এই অসাড় চিত্তবৃত্তির উপরেও সেটা অপারেসন ছুরীর মতই তীব্র আঘাত জাগাইয়া দিয়াছিল। ডাক্তার তাকে কি চোখে দেখিয়া তার জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন, সে কথা বুঝিতে তার বিলম্ব ঘটিল না।

৩৬

সেবা-ভবনে পৌছিয়া আরতি কোন দিকে না চাহিয়াই কলে-চলা পুতুলের মত প্রাণহীন ভাবে তার সুবৃহৎ সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতে-ছিল,—পথেই দেখা হইয়া গেল ডাক্তার রুদ্রের সহিত। ব্যস্ত ভাবে তিনি নামিয়া আসিতেছিলেন, হাতে তাঁর দু' তিনটা ঔষধের শিশি। আরতিকে দেখিয়া থামিয়া পড়িয়া সেই শিশি-শুদ্ধ হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার জানাইলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"বাঁচলুম! আপনি এসেছেন মিস রায়! আমি তো তিনতালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অস্থির হয়ে পড়েছি। যদি কোন কাজ না থাকে, খানিকক্ষণের জন্য ওষুধ-ঘরে গিয়ে একটু বসুন গে', যখন যে ওষুধটা দরকার হবে, ফোনে খবর দেবো, আর লোক পাঠাবো, বার করে সেটা তার হাতে দিয়ে দেবেন তো, আর কেউ তো পারবে না।"

আরতির মনের কাছাকাছি প্রশ্ন উঠিল, কার কি হয়েছে? কিন্তু তার জিহ্বা কোন শব্দই উচ্চারণ করিল না। সে শুধু ঈষৎ মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল, এবং সিঁড়ির ধাপে যেমন পা তুলিতেছিল তেমনই পা বাড়াইল। ডাক্তার নিজ হইতেই বলিলেন,—নার্স যোগমায়া করের অবস্থা আজ মোটেই ভাল নয়।

তার পর তারা দুজনে দুদিকে চলিয়া গেল।

আরতি স্তব্ধ হইয়া সেই ঘরখানার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীর দেনা তার বহু পূর্ব্বেই শোধ হইয়া গিয়াছিল, যে একটীমাত্র লোকের কাছে পাওয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজ তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আজ সে সেই জিনিসটীই হারাইয়া ফিরিয়াছে, তিনি যে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন, ঘৃণা করিতেছেন, তাঁর কাছে তার যে আজ আর কিছুমাত্র মূল্য নাই, সে কথা ঐ একটুখানি দৃঢ় প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল, এর জন্ত আর বেশি কিছুরই প্রয়োজন তো ছিল না! বাস্তবিকই তো তার অপরাধ লোক চক্ষে সামান্তও নয়! আর অত বড় বুদ্ধিমান লোকটার ততটুকু ভূয়োদর্শন-জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে।

একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই ঘরে তাদের দুজনকার সংযুক্ত পরিশ্রমের ফল চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে। এই কর্ম্ম-কঠোর যন্ত্রালয়ের মধ্যেই সে তার এতদিনকার শূন্য হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ খোরাক খুঁজিয়া পাইয়াছিল।—তাই এ ঘর যেন তার তীর্থভূমি।

কলের পুতুলের মতন সে তার পূর্ব্ব নিয়মিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। ইহার প্রত্যেক যন্ত্রের গায়ে তাহার হাতের স্পর্শ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আজও লাগিয়া আছে! প্রত্যেকটাকেই ঝাড়ন দিয়া মুছিতে গিয়া

তার হাতের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের আঙ্গুলের ডগা ও মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তার মনে পড়িল, কি গভীর তন্ময়তারই সহিত ডাক্তার সেন ইহাদের মধ্য দিয়া মানব জাতির উপকারার্থ কত শত প্রকার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়াই নিজেকে সর্ব্বপ্রকার ভোগবঞ্চিত করিয়া রাখিয়া থাকেন। গভীর ক্লান্তিও কখনও তাঁর এতটুকু কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে না। তাহাকে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ বুঝিলে সেই তিনি কি তাহাকে কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারিবেন,—সে তার অসম্ভব আশা! অথচ এখান হইতে বিতাড়িত হইলে আর সে কোন্খানে গিয়াই বা বাঁচিয়া থাকিবে? আবার তাকে নূতন করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে, আর কি তা পারা যায়!

সে দ্রুতহস্তে অথচ সুচারুরূপেই জিনিসপত্রগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার যথাস্থানে যথাযথভাবে সেগুলিকে স্থাপন করিতে লাগিল। এ ঘরের কাজ তার জন্মের মত শেষ হইয়া গিয়াছে, হয় ত এর পর আর কখনও সে এ ঘরের চৌকাটের মধ্যে পদার্পণও করিবে না। যদি স্বর্ণলতা বাঁচিয়া উঠে, ডাক্তার সেন জানিতে পারিবেন, তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সাহায্যকারিণীর দ্বারা কি ভীষণ ভাবেই প্রতারিত হইয়াছেন! আর যদি তার মৃত্যু হয়, এতবড় একটা জয়ের মুখে যার দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছে, তাহাকে তিনি কি কোন দিনই আর ক্ষমা করিতে পারিবেন? —না। কিন্তু সে যে তাঁকে তার পিতার আসনে বসাইয়াছে। এ জগতে আর তো তার কেহই নাই।

নীরবেই সে তার ম্লান দৃষ্টি দিয়া সেই গাম্ভীর্য্যময় নানা প্রকার ঔষধ দ্বারা তীব্র গন্ধে ভারাক্রান্ত ঘরখানার কাছে চিরদিনের মতই বিদায় লইল। এই চির-বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও সে জানিতে পারে নাই, যে, এই বাড়ী এর পর হইতে আমৃত্যু তার কাছে সহস্র অপ্সরা-নর্ত্তিত

পারিজাত-গন্ধামোদিত নন্দনকাননের মতই চিরনন্দিত হইয়া থাকিবে। কারণ এ যেন এ পৃথিবীর বাহিরে আনন্দ-নিরানন্দের চিরঅতীত দ্যুলোক! এখানে তার বর্ত্তমান অতীতের সহিত নিঃসম্পর্কিত! ফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

"ডিজিটেলিশের শিশিটা পাঠান তো মিস রায়!"

যে আলমারিতে রাশি রাশি শিশির প্রায় সবগুলাই মানুষের জীবন এবং মৃত্যু অবস্থাবিশেষে এবং পরিমাণ নির্ব্বিশেষে একসঙ্গেই দিতে ও নিতে সমর্থ, সেইটার চাবি ও তার আলমারিটা তিনি শুধু ডাক্তার রুদ্র এবং আরতিকেই চিনাইয়া রাখিয়াছিলেন; আর কোন ব্যক্তির তাহা জানা ছিল না। আরতি ছুটিয়া আসিয়া গোপন স্থান হইতে চাবি লইয়া আলমারি খুলিল। খুলিবামাত্র সর্ব্ব প্রথমেই তার চোখে পড়িয়া গেল আর্সেনিক। সহসা তার বুকের মধ্যে দুম্‌দাম্ করিয়া যেন কার লাঠির ঘা পড়িতে লাগিল,—"আর্সেনিক!"—আঃ, আবার সেই চিরপরিচিত "আর্সেনিক!"—সেই যা দিয়া তার বাপ—তার চিরস্নেহময় বাপ—তাদের সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়া চিরনিশ্চিন্ত হইয়াছেন এ সেই আর্সেনিক!—

কম্পিত হস্তে ডিজিটেলিশের শিশিটা তুলিয়া লইয়া সে দ্বার সমীপস্থ ভৃত্যের হস্তে দিয়া আসিল। চাকরটা চলিয়া গেলে, আবার সে সেই খোলা আলমারীটার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। সেটা বন্ধ করিবার জন্য কবাটের উপর হাত রাখিয়াও যেন কার প্ররোচনা বলে হাতখানা সরাইয়া লইল, দোরটাকে বন্ধ করিতে পারিল না। তখন তার বুকের মধ্যের সেই শব্দটা এত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাই দিয়া তার দুই কাণ যেন পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল। বাহিরে তখন যদি ঢাক পিটানো হইত, তো হয় ত সে বাজনার শব্দও তার কাণের মধ্যে ঢুকিতে পথ পাইত না।

একদিন সে জলে ডুবিতে চাহিয়াছিল। সেই পূর্ব্ব কথা তার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

তার বাবা এই আর্সেনিক খাইয়াই নিজেকে শেষ করিয়াছিলেন,—এই এমনুই অবস্থায় পড়িয়াই সেই তাঁর হাতের কাছের আর্সেনিকের শিশিটাকে হয় ত তিনিও প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। সেই বা তবে কিসের লোভে এতবড় সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করিবে? ওঃ, জীবন যেন তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তবে আর কাজ কি? বাঁচিয়া থাকার বিড়ম্বনা আর যে তার সহ্য হইতেছে না!

তার বোধ হইল, সেই বুকের ভিতরকার শব্দটা বাড়িতে বাড়িতে, ক্রমশঃ যেন সেটা তাকে পৃথিবীর সকল শব্দ হইতে আড়াল করিয়া দিয়া সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। হাজার হাজার কামানের গোলা, লক্ষ লক্ষ বড় বড় লোহার হাতুড়ী, আরও যেন কত কি দিয়াই সেই বিকট ভীষণ শব্দরাশি তৈয়ারি। আর তার চারিদিকে যেন সেই একটি শব্দ ভিন্ন আর কোথাও কোনখানে কোন কিছুই নাই।—দিন নাই, দিনের আলো নাই, এ ঘর নাই, সে নিজেও নাই,—তবে কি সে পাগল হইয়া যাইতেছে? না, পাগল সে কোন মতেই হইবে না।—তার আগে—

অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাত বাড়াইতে একটা শিশি তার হাতে ঠেকিল। এ নিশ্চয়ই তার নির্ব্বাচিত সেই আর্সেনিকের শিশি! আঃ, এই ত তার সকল শ্রান্তির, সকল চিন্তার, সকল সন্দেহের চরম মীমাংসা! সে সাগ্রহে শিশিটা লইয়া জ্যাকেটের বুকের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তার পর অনেকখানি যেন সংযত হইতে পারিয়া দ্রুত হস্তে আলমারি বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল।

সারা রাত তার জাগিয়া কাটিল। নীচের ঘরের রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দ হইতেছিল। ভোরের দিকে রোগীর জীবনের শেষ আশা

টুকুরও সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। নাড়ী ছাড়িয়া গিয়া ঘাম আরম্ভ হইল, —অস্থির রোগী ক্রমশই স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। আরতি সেই আর্সেনিকের শিশি বুকের মধ্যে লুকাইয়া চোরের মত শঙ্কিত চিত্তে এই মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণেক্ষণেই উঠিয়া গিয়া ঐ ছোট্ট শিশিটা খালি করিয়া ফেলিতে তার মনের মধ্যের লোভ দুরন্ত হইয়া উঠিতে থাকিলেও, সে প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। মনকে বারেবারেই বুঝাইল—"আর একটুখানি থাকো না, আগে এঁর দেনাটুকু চুকিয়ে দিই, তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে—"

মনকে এ কথা সে বলিল বটে, কিন্তু নিজের অসাড় ও অবসন্ন দেহকে এ বুদ্ধিতে বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না। যার দেনা সে মিটাইতে বসিয়া রহিল, তার মুখে একবিন্দু জলও সে চামচে করিয়া তুলিয়া দিল না, দিতে তার মনেও পড়িল না,—এমনই উদ্‌ভ্রান্ত ও অবশ সে হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাক্তার সেন সেই পর্য্যন্ত আর এখানে ফিরিয়া আসেন নাই। হয় ত ওখান হইতেই সোজা বাড়ী গিয়াছেন, না হয় ওইখানেই আছেন,—কি যে ঘটিয়াছে কিছুই বুঝা যায় না! স্বর্ণলতা কি ভাল হইয়া উঠে নাই? তার সে মূর্চ্ছা কি আর ভাঙ্গিল না? কে জানে? ওঃ ভগবান! এ' আবার তার ভাগ্যে কি করিয়া তুলিলে? এত নির্ম্মম তুমি? যাদের ভয়ে সে হত্যাকারী—খুনী আসামীর মত লুকাইয়া ফিরিয়াছে, একেবারে সোজা টানিয়া আনিয়া সেই তাদের মধ্যেই তাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া আজ কি তাকে সত্যকার হত্যাকারীই তৈরি করিলে?

আরতি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। উঃ—যদি স্বর্ণলতা না বাঁচে? কিন্তু কেন? কেনই বা সে না বাঁচিবে? মূর্চ্ছা তো তার আগেও ক'বার না কি হইয়াছিল! কই—মরে নাই ত? তবে এবারই বা মরিবে কেন?

সে একান্ত চিত্তে তন্ময় হইয়া ভগবানের কাছে তার জীবন ভিক্ষা

করিল। মনে মনে বলিল,—আমার আয়ু আমি তাকে দিচ্ছি, আনন্দের সঙ্গে দান করচি,—তাই নিয়ে ওকে বাঁচিয়ে দাও, ভাল রাখো, ওঁরা সুখী হোন, ওঁদের সুখে রাখো। হে ঈশ্বর! তুমি তো অন্তর্যামী, সবই তো জানতে পারচো, আমার মনে কোন দুঃখ নেই, লোভ নেই,—শুধু ওঁর যে সুখের জন্য আমি নিজেকে চিরদুঃখী করেছি; সেইটুকুই ওঁকে তুমি দিও।”

সহসা আরতি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সে হয় ত ঈষৎ একটুখানি লোভে পড়িয়াই এ কাজে তেমন জোর করিয়া ইস্তফা দেয় নাই! ডাক্তারকে তো পূর্ব্বেই সব কথা খুলিয়া বলাও চলিত? তবে কি সলিলকে দেখিতে পাওয়ার লোভটুকু তার মনের মধ্যে গোপনে সঞ্চিত রাখিয়াই এই কাণ্ডটা সে বাধাইয়াছে? ভগবান জানেন! তেমন স্পষ্ট করিয়া ত কই তা' মনেও হয় না? কিন্তু যদিই তা' হয়, তথাপি অতটুকু পাপের ও কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্তই তাকে করিতে হইতেছে?

হঠাৎ সে সংযত হইয়া উঠিয়া শুনিল, কে তাহাকে যেন নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সে ভীষণ ভাবে চমকাইয়া উঠিল। কে? কেন? কোথা হইতে আসিল?—কি বলিবে? কি খবর দিবে? কার কথা বলিবে?

বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। ডাক্তার সেনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডাক্তার রুদ্র আরতির পাশে দাঁড়াইয়া সহানুভূতিপূর্ণ উদ্‌গ্রীব নেত্রে তার দিকে চাহিয়া তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

“আপনি তো সবই বোঝেন মিস রায়! কি আর করবেন বলুন?—অত শোকাকুল হবেন না। একদিন তো সব্বাইকেই এই পথে যেতে হবে। সমস্ত রাত এক ভাবে বসে রয়েছেন, আর তো ওঁর জন্যে করবার কিছুই কারু বাকি নেই, আর কেন? উঠে যান, চানটান করে একটু বিশ্রাম করুন গে।”

আরতি তার শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া বিছানার উপর চাহিয়া দেখিল, যে এতক্ষণ সেখানে পড়িয়া মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাকে সে আর দেখিতে পাইল না, তাহার পরিবর্ত্তে শাদা একখানা 'বেড-কভার' দিয়া কি যেন একটা ঢাকা রহিয়াছে! আরতি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল,—মুহূর্ত্তে তার মুখ দিয়া একটা সুস্পষ্ট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল,—

"বাবা!—ও—বাবা গো!"

তার অপ্রকৃতিস্থ অস্থির চিত্ত দ্রুতবেগে পিছন ফিরিয়া যেন চিরঅপগত অতীতের মধ্যে সবেগে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আর একদিনের এই রকমই শয্যালীন স্তব্ধ অনড় বস্ত্রাবৃত আর একজনের নিদারুণ অবিস্মৃত স্মৃতি তার মানস দৃষ্টি ভেদ করিয়া বহির্দৃষ্টির সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে কাতর করুণ আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াই সংজ্ঞাহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িল। তার যেন মনে হইল ওই আচ্ছাদিত বস্তু পিণ্ড আর কিছু বা আর কেহ নহে, এ তার সেই আত্মঘাতী পিতৃদেহ! আবার যেন তিনিই তাকে তার একান্ত দুঃসময়ে—জীবনের সকল অবলম্বন ও ধৈর্য্য যখন তাহাকে নির্ম্মম হইয়া ছাড়িয়া গিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে তাহার অভিপ্সিত পথ দেখাইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন!

ডাক্তারটী ঈষৎ করুণাপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার বিহ্বল দেহ সযত্নে মাটি হইতে তুলিতে তুলিতে তাঁহার সাহায্যকারিণী অপর নার্সকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"এত কম বয়সে এমন কাঁচা মন নিয়ে ইনি এ পথে কেনই বা আসতে গেছেন!—"

নার্স উত্তর করিল, "মিস রায়ের ঐ স্বভাব! ও রোগীর সেবা প্রাণ দিয়ে করে,—কিন্তু সেই রোগী যদি মরলো, অমনি ও ছুটে পালাবে।

কক্ষনো মরা মানুষ ও সইতে পারে না। আর একবারও এই রকম করেছিল। কিন্তু এ' কি! এ যে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। দাঁতি লেগে গেছে। সেবারে এতটা হয়নি ত! একটু শুধু কি রকম হয়ে গেছলো, তার পর খুব কাঁদলে।"

"ষ্ট্রেচার আনাচ্চি, ওঁকে ওঁর নিজের ঘরে নিয়ে যেতে হবে, এখানে আর রেখে কাজ নেই। আহা, এত যার নরম মন, সে এলো কি না, মৃত্যুর খেলা দেখতে! অদৃষ্টের এ যেন পরিহাস।"

৩৭

সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেও আরতি একটা গভীর অবসাদের মধ্যেই প্রায় সারা দিনটা ডুবিয়া রহিল। মূর্চ্ছা তার ভাঙ্গিয়া গেলেও, মূর্চ্ছাবসন্নতা তাহার চিত্তাশ্রয় করিয়া তার দেহকেও ভর দিয়া রহিল। ডাক্তার রুদ্র করুণার্দ্র চিত্তে তার শয্যাপার্শ্বে সারাক্ষণই যাতায়াত করিলেন। নার্সরা সকলেই আরতিকে ভালবাসিত, তার শুশ্রূষা তারা সযত্নেই করিল। শুধু সংবাদ পাইয়াও তাহাকে দেখিতে আসিলেন না—ডাক্তার সেন। তাঁর এতবড় কর্ত্তব্যচ্যুতি বোধ করি ইতিপূর্ব্বে আর কখন কেহ দেখে নাই, তাই সেবাভবনের সংশ্লিষ্ট সকলেই ঈষৎ বিস্ময়ানুভব করিল। এ ছাড়া, দু'একজন মনের মধ্যে গোপনে একটুখানি লজ্জা বোধ করিল। নিজের মনকে এই বলিয়া তারা ভর্ৎসনা করিল যে,—কি রকমই সন্দিগ্ধ মন আমাদের! ওই পাথরে গড়া মানুষটা, যে কাজ ভিন্ন আর কোন কিছুরই ধার ধারে না,—ওকে একটু যেন টান দেখাত বলে আমরা মনে করেছিলুম, ওর বুঝি কপাল ফিরেছে! কোথায় কি? কাজ বেশি পায়, তারই

ওটুকু দাম। আজ অসুস্থ হয়ে কাজের বাইরে চলে গেছে, তাই ওর মূল্যও ওর কাছে শেষ হয়েছে! হায়রে পৃথিবী! তুমি শুধু কর্ম্মক্ষেত্রই বটে!

আরতির যখন ভাল করিয়া সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দেড় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—সেবাভবনের রোগীদের রাত্রি-ভোজন সমাধা করাইয়া কর্ম্মচারিবর্গ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। চারিদিকে বিশ্রাম-গ্রহণের একটা প্রচেষ্টা এবং বিশ্রাম প্রাপ্তির একটা প্রশান্তি ধীরে ধীরে সারা অট্টালিকাময় যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। কেবল কোন কক্ষে বা কক্ষান্তরে যন্ত্রণাকর রোগ-যাতনার অর্দ্ধস্ফুট বিলাপ-মর্ম্মর অকস্মাৎ সেই প্রায়-শান্ত প্রকৃতির তন্দ্রাচ্ছন্ন বক্ষতলে ঈষৎ চমক তুলিয়া দিয়া আবার কিছুক্ষণের জন্য মিলাইয়া যাইতেছিল।

আরতি অনেকখানি সুস্থ হইয়া তার শয্যাপার্শ্বের চেয়ারে উপবিষ্ট প্রতীক্ষা-নিরত নার্সের দিকে চাহিয়া দেখিল। মেয়েটীর নাম চপলা। বেশী দিনের লোক নয়, নূতন আসিয়াছে; কিন্তু বেশ কার্য্যতৎপর, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধীর স্বভাব। আলোর স্যুইচের দিকে ফিরিয়া একখানা বাংলা নভেল লইয়া সে পড়িতেছিল, আরতি স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাকে দেখিতে দেখিতে তার দুচোখ জলে ভরিয়া উঠিল। একদিন,—একদিন—যেদিন আরতি আর এখানে থাকিবে না,—সেদিন হয় ত এই মেয়েটী—এই চপলা তার সামান্য যায়গাটুকু দখল করিয়া লইবে। হয় ত, হয় ত একদিন ডাক্তার সেন তাকে যেমন করিয়া নিজের পূর্ণ বিশ্বস্ত সহকারিণী রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই করিয়া ইহাকেও তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্রী করিয়া লইবেন! এ পৃথিবীর বালির ঘরে কারও শূন্য স্থান পূর্ণ হইতে তো কই বিলম্ব ঘটে না?

হয় ত তার হাতের সরু দু'টী চুড়ির একটুখানি মৃদু নিক্কণ শোনা

গিয়াছিল,—চপলা মুখ ফিরাইল, বই মুড়িয়া তার কাছে উঠিয়া আসিল,—কহিল "জেগে আছ মালতীদি, জল খাবে ?"

আরতি নিঃশব্দে মাথা নাড়িল। তার চোখ দিয়া দুটী ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিয়াছিল, হাত দিয়া সন্তর্পণে মুছিয়া ফেলিল।

"কত রাত চপলা ?"

চপলা টেবিলের কাছে গিয়া টাইমপিসটার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"এগারটা বেজে পাঁচ মিনিট।"

আরতি আর একটা ক্লান্তির কাতর শ্বাস ত্যাগ করিল,—"তুমি এখনও জেগে কেন, চপলা ? যাও ঘুমোও গে।"

চপলা একটু ইতস্ততঃ করিল, "তুমি একলা থাকবে ? আরও খানিকক্ষণ না হয় থেকে যাই না!—শরীরটা কেমন বোধ করচো মালতীদি ?"

"ভাল"—বলিয়া আরতি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল,—"আমি তো ভালই আছি, মিথ্যে কেন রাত জাগবে, তুমি যাও,—আমিও আবার ঘুমের চেষ্টা দেখি।"

বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

চপলার ঘুম পাইয়াছিল। ডাক্তারও বলিয়া গিয়াছেন, মালতীর দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কোন অসুখ এখন নাই। সে নিজেই যখন ভাল আছে বলিয়া তাকে বিদায় দিতে চাহিতেছে, তখন বিদায় লইয়া ঘুমাইতে যাওয়া অন্যায় বলিয়া তারও মনে হইল না।

"তাহলে যাচ্চি, মালতীদি, কিছু দরকার থাকে ত বলো,—হ্যাঁ,—এই ষ্টিম্যুলেণ্টটা একবার দিতে বলে গ্যাছেন যে!—" বলিয়া সে একটা কাচের গ্লাশে খানিকটা জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ষ্টিম্যুলেণ্ট মিশাইয়া পাত্রটা আরতির মুখের কাছে লইয়া আসিল।

পান করিয়া আরতি ঈষৎ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে বলে গ্যাছেন ? ডাক্তার সেন ?"

চপলা ঠোঁট টিপিয়া একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গীর সহিত উত্তর করিল, "হ্যাঁঃ—ডাক্তার সেন আবার তোমার-আমার মতন লোকের রোগের খবর নিতে আসচেন ! ডাক্তার রুদ্র।"

আরতির বুক চিরিয়া আর একটা গভীর রুদ্ধশ্বাস গলার কাছে উঠিয়া আসিল, কিন্তু বাহির হইতে পারিল না। চপলা নিজে হইতেই বলিতে লাগিল,—

"মানুষটা যেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করা একটা প্রাণহীন বস্তু, অথবা একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ! মন বলে ওঁর মধ্যে কোন কিছুরই বালাই নেই। সকালে তো আজ আসেনই নি,—বেলা প্রায় তিনটের সময় যখন এলেন, ডাক্তার রুদ্র আপনার অসুখের কথা বল্লেন, শুনে কোন কথাই বল্লেন না,—একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করলেন না যে, কেমন আছে ! ডাক্তার রুদ্র নিজ হ'তেই বল্লেন, 'মিস্ রায়ের মনটা বড্ড নরম, মৃত্যু দৃশ্য বেয়ার করতে পারলেন না,—'সকড' হয়ে ওই রকম হয়ে পড়লেন।—শুনে একটু চাপা হাসিমাত্র হেসে তখনই বেরিয়ে চলে গেলেন।—ওঁর কাছে হয় ত মরণ দেখে 'সকড্' হওয়াটা হাস্যজনক ! নিজে অত শক্ত কি না।"

আরতি নিঃশব্দে রহিল। এই তাচ্ছিল্য হাসি এবং নির্লিপ্ততা সেই পরম স্নেহময় চিত্তে আজ কোথা হইতে যে জাগিয়া উঠিয়াছে, চপলা তো সে কথা জানে না,—জানিলে কখনই তাঁহাকে সে দোষ দিতে পারিত না। ডাক্তার সেন যে তাহাকে স্বেচ্ছাতন্ত্রা কলঙ্কিনী মনে করিয়াই তার সম্বন্ধে এই নিরপেক্ষভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

"তাহলে চল্লুম মালতীদি, শুভ রাত্রি অতিবাহিত করো—" বলিয়া স্বচ্ছন্দ লঘু চরণে মৃদুস্বরে একটা গানের আধখানা চরণ গাহিতে গাহিতে চপলা চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতেও তার চাপা গলার মৃদু গুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল,—

—"আমি সুদূরের পিয়াসী—"

আরতির সেই রুদ্ধশ্বাসটা তার বুকখানাকে যেন জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল।

নির্জ্জন ঘরে একা হইবামাত্র তার সারা দিনের কুহেলিকাচ্ছন্নবৎ চিত্ত-তলে চাপা দেওয়া সহস্র দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক তাকে যেন একসঙ্গে চারিদিক দিয়া দংশন করিয়া উঠিল। ডাক্তার সেন তাহাকে কতবড় সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, সে তাঁর এই নির্ম্মম ব্যবহারেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আর এতবড় নিশ্চিত এ প্রমাণ যে, অন্যের চক্ষেও এর অসঙ্গতি ধরা পড়িতে বাকি নাই! স্বর্ণলতা হয় ত তার কাল্পনিক এবং সত্যকার সকল সন্দেহই ডাক্তারের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে। সে যে করিবে, এ' তো জানা কথাই,—এবং প্রমাণ, তার বিপক্ষে এত বেশী প্রবল যে বিশ্বাস করিবার পক্ষেও বিন্দুমাত্র বাধার কারণ নাই। তাছাড়া ডাক্তার নিজেই যে তার 'আই উইটনেস'! তিনি নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তার পরে এ সব কথায় অবিশ্বাস করার কোন উপায়ই তো আর বাকি থাকে নাই?

ঘৃণায় আরতি যেন শিহরিয়া উঠিল,—লজ্জায় সে মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গেল।

তার পর তার মনে পড়িল সলিলকে। তিনি নিজে কি কিছুই বলিবেন না? কিন্তু বলিবার তাঁর দিক হইতে কিছু তো নাইও? কি বলিবেন? তিনি নিজেই যে প্রধান অপরাধী!—সে অপরাধ তিনি কোন্ মুখে

অস্বীকার করিবেন ? আর করিলেই বা সে কথা শুনিবে কে ? স্বর্ণলতা যে নিজের কাণেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে যে,—তিনি আজও তাহাকে ভালবাসেন !

আরতি নিজের ভাবনা ভুলিয়া সলিলের কথাই তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল। স্বর্ণলতা ভাল আছে,—নিশ্চয়ই সে ভাল হইয়াছে, কিন্তু সলিলের কাল্পনিক অপরাধকে সে ক্ষমা করে নাই. তার সত্যকার এত বড় অপরাধকে সে কি আর কখনও ক্ষমা করিতে পারে ? না, নিশ্চয়ই না।—সলিলের বাকি জীবনে এ পাপের শাস্তি তাকে কত বড় করিয়াই যে বহন করিতে হইবে, তার সমস্ত জীবন যে তাহার ভারে কতখানি ভারি হইয়া উঠিবে, সে কথা ভাবিতে তার মন যেন পাথরের মত ভার বোধ করিতে লাগিল। মুসুরীর কথা তার মনে পড়িল। যেদিন তারা বিবাহপণে আবদ্ধ ভবিষ্যৎ পতি-পত্নী বোধে প্রথম পরস্পরকে সম্ভাষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, সেদিনের সেই সুখোজ্জ্বল চিত্র আজ এই নিষ্প্রভ জীবনের ক্ষীণালোকে স্বপ্নের মতই প্রতীয়মান হইল। সলিল, সানন্দ, সুন্দর জীবনের তেজে জ্যোতিষ্মান, ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত সেই তরুণ পুরুষ, আজ কি ঐ অকালপ্রৌঢ় নিরানন্দ নিস্তেজ লোকটী ? আরতির বুক ফাটিতে চাহিতে লাগিল। কেন সে অমন দুর্জ্জয় অভিমানে তার কথা ভাবিয়া দেখিল না ? অজ্ঞ সে, অন্ধ সে—বুঝিতে কত বড়ই ভুল সে করিয়া ফেলিল ! সকল পুরুষের প্রকৃতি যে এক নয়, এ কথা যদি সে জানিত,—সে যদি তাহাকে সত্যকার চেনা চিনিত, তার যদি একটুও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকিত,—এমন করিয়া তিনটা জীবনের সকল সুখ, সমস্ত আশা আজ হয় ত বিসর্জিত হইয়া যাইত না। সলিলের প্রেম যে এতখানি প্রবল তা তো সে ভাবে নাই ! সে মনে করিয়াছিল, যে পুরুষ এক স্ত্রী মরিলে আবার বিবাহ করে, পত্নী বর্ত্তমানে দুশ্চরিত্র হয়, সেও তো

তাদেরই একজন,—অনায়াসেই সে বিবাহ করিয়া আরতিকে ভুলিয়া যাইবে। হায়, তাই যদি সে পারিত! কেন সলিল তাঁর মত দুর্ভাগিনীকে এত ভালবাসিল? কেন তাকে আজও সে ভুলিতে পারিল না? তার মধ্যে কি আছে এতখানি পাইবার মত?

আরতি শয্যাতলে উঠিয়া বসিল। তার চিন্তাভারক্লিষ্ট দুর্ব্বল বক্ষ যেন এত বড় গুরু ভার বহিতে পারিতেছিল না। শ্বাস তার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। শিথিল দেহে ও স্খলিত পদে সে উঠিয়া গিয়া, একটা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের প্রানে চাহিয়া দেখিল। জনবিরল রাজপথ একটা বিরাট মূর্ত্তি অজগরের মতই বিশ্রাম করিতেছে,—তার ইতস্ততঃ সাপের মাথার মাণিকের মত বিদ্যুতের আলোগুলা তীব্র রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুএকখানা মোটরকার বা দু'একটা পথিক সেই সুপ্তিমগ্ন অজগরের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

বাহিরের হাওয়ায় তপ্ত ললাট ঈষৎ শীতল বোধ হইতে, আরতির মন আবার তার সঙ্কটসঙ্কুল সমস্যাময় বর্ত্তমানের দিকেই সভয়ে ছুটিয়া আসিল।

এখন তার কর্ত্তব্য কি? ডাক্তার সেন তাহাকে সন্দেহ করিয়াছেন। সলিলের ব্যবহারে তার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে ত্রুটী আছে, সে কথা তিনি প্রথমাবধিই সন্দেহ করিয়াছিলেন, সে ব্যবহারের সঙ্গে যে আরতিরও যোগ আছে, সেই কথাটাই সেদিন জানা হইয়া গিয়াছে। সে যদি তাঁকে সেই চিঠিখানাও শেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া দিত! যাক্, যা হইয়াছে, সে তো আর এখন কোন মতেই ফিরিবে না।

সে দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইল, এখান হইতে বিদায় লইতে হইবে বলিয়া সে এতখানিই বা কাতর হইয়াছে কেন? তার মনে হঠাৎ একটা সংশয় জাগিল। সলিলের সেই ঈর্ষা-বিকৃত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিদ্বিষ্ট বাক্যগুলা তার মনে পড়িয়া গেল! ডাক্তার সেন তাহাকে ভালবাসেন! না—না, এ

কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়! নিশ্চয়ই না।—কিন্তু—কিন্তু সে নিজেই কি বাসে? তাঁকে ছাড়িতে হইবে বলিয়া, তিনি অশ্রদ্ধা করিতেছেন বলিয়া এত দুঃখ সে কেনই বা অনুভব করিতেছে অনেক কিছুই তো সে ত্যাগ করিয়াছে,—ডাক্তারের আশ্রয়, সেবা-ভবনের চাকরী, সে সবের তুলনায় কিছুই তো নয়! তবে কেন এ ব্যাকুলতা?

আরতি চিন্তিত কাতর চিত্তে নিজের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুল ভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কই না, সেখানে রত্ন-সিংহাসনে আজও তো সলিলেরই সুন্দর মূর্ত্তি তার সেই কন্দর্পের ন্যায় তরুণ রূপ লইয়া সেইরূপ উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্ত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত! সে তো কই এতটুকুও ম্লান হইয়া যায় নাই? সে মূর্ত্তিকে চিন্তা করিতে করিতে আরতির দু'চোখ দিয়া অজস্র ধারা বহিয়া গেল। তার দিকে চাহিয়া দু'হাত যোড় করিয়া, সে তাহার উদ্দেশ্যে মনে মনে বলিল,—'প্রিয়,—প্রিয়তম! জীবনের চিরারাধ্য! তোমায় আমি ভুলবো? তোমার কোন কথাটা ভুলে যাবো? এ জন্মে তো পেলুম না, জন্মান্তরে পাবার আশা নিয়ে তোমার আশায় আমি যুগান্তর অবধি বসে থাকবো। অন্তহীন কালের কাছে সে আর কতটুকু?

এই চিন্তায় চিত্ত তার অনেকখানি লঘু হইয়া আসিল। মনে মনে এই বলিয়া সে মীমাংসা করিয়া লইল,—ভাল সে ডাক্তার সেনকেও বাসে,—সত্যকারই সে ভালবাসা। ভালবাসার শুধু তো ঐ একই রূপ নয়! এই শ্রদ্ধেয়, স্নেহময়, ন্যায়নিষ্ঠ আশ্রয়দাতাকে সে তার অন্তরের মধ্য হইতেই বড় ভাইএর, প্রিয় বন্ধুর, পিতার মত ভক্তি, সম্মান ও ভালবাসার অঞ্জলি দিয়া ফেলিয়াছে,—তিনিও তাঁর মনের মধ্যের নিতান্ত অল্প স্থান জুড়িয়া রাখেন নাই। তাই আজ তাঁর জন্যও তাঁর প্রাণ বড় অল্প কাঁদিতেছিল না।

সেই ডাক্তার সেন যখন কাল সকালে আসিয়া অথবা না আসিয়াই কঠিন দৃঢ় আদেশে তাহাকে তাঁহার সংশ্রব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিবেন, লোকে যখন তার পশ্চাতে নানারূপ জল্পনা-কল্পনায় তার উদ্দেশ্যে কালির আঁচড় কাটিতে থাকিবে,—হয় ত তিনিই তার কথা অন্যের কাণেও তুলিবেন,—স্বর্ণলতা নিশ্চয়ই তাঁহাকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে—সলিল হয় ত এ সব কাণ্ডে তার প্রতি সত্য-সত্যই বিরক্তি বোধ করিবে—সেও তো তাকে স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ীর চাকরী স্বীকার করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল? নাঃ, এ জীবন অভিশপ্ত! এর ভার বহন করা আর একান্তই নিষ্প্রয়োজন!

আরতি সহসা চমকিয়া উঠিল। কই? তার সেই দুঃসময়ের বন্ধু,—পিতৃবন্ধু, অসহায়ের সহায় আর্সেনিক? তাড়াতাড়ি সে বুকের ভিতরে খোঁজ করিল,—কই? কোথায় তার সেই অকূলের কাণ্ডারী? পারের বন্ধু? অসহায়ের একান্ত সহায়? আরতির মাথা ঘুরিয়া গেল। সে তো শিশিটা তার বুকের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কে বাহির করিয়া লইল? কেমন করিয়া খোয়া গেল? ডাক্তার রুদ্র বা চপলা নার্স, অথবা আপনিই কোথাও পড়িয়া গিয়াছে? গভীর হতাশায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সে খাটের উপর বসিয়া পড়িল। তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা অপমান লেখা রহিয়াছে—কে তাহাকে তাহা হইতে রক্ষা করিবে?

দ্বারের বাহিরে প্রশ্ন হইল,—

"মে আই কম ইন্?"

স্বর সে চিনিতে পারিল না, চিনিবার সামর্থ্য তার ছিল না, ভয়ে তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এত রাত্রে? কে আসিল? কেন আসিল?—হয় ত ঐ আর্সেনিকের শিশি চুরির বিচার করিতেই বা সে

আসিতেছে? দুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর কোন মতে তার স্খলিত জিহ্বা দিয়া সে জড়িত স্বরে উচ্চারণ করিল—

"ঈ-য়েস—"

সভয়-কম্পিত বক্ষে চাহিয়া দেখিল, এই গভীর নিস্তব্ধ-প্রায় মধ্যরাত্রে তার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন—সারাদিন ও অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত যিনি তার সংবাদ মাত্রও গ্রহণ করেন নাই, সেই ডাক্তার সেন।—কিন্তু না—তিনি তো একা নহেন?—তাঁর পশ্চাতে এক শুভ্রবসনা শুভ্রবরণা বর্ষীয়সী বিধবা মূর্ত্তিও যে দেখা গেল!

আরতি অবাক্ আকৃষ্ট-চক্ষে দু'জনের দিকেই চাহিয়া রহিল। মহিলাটীকে তার পরিচিত বোধ হইলেও সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। রমণী নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিস্ময়-স্তব্ধতায় অচলা আরতিকে নিঃশব্দে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, তাঁর অজস্র অশ্রুজলে আরতির মাথার চুল ভিজিয়া গেল।

ঘর নিদারুণরূপে নিস্তব্ধ, এত নিস্তব্ধ যে তার মধ্যে টাইমপিসটার চলার শব্দকে কলের চাকাঘোরার শব্দের মতই সুপ্রকট বোধ হইতেছিল। আরতি শুষ্ক, রুক্ষ, অশ্রুহীন, স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, কোন কল্পনা, কোন চিন্তাই তার মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল না।

অনেকক্ষণের অনেক অশ্রুবর্ষণের পর মহামায়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া অদূরে দণ্ডায়মান ডাক্তারের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"ভোরের ট্রেনেই আমি দেশে ফিরচি ডাক্তার সেন! অনুগ্রহ করে একে আজ রাত্রেই আমায় নিয়ে যেতে অনুমতি দিন।"

ডাক্তার সেন সস্মিত মুখে চাহিলেন—আরতির মৃত্যু-পাণ্ডুর ও তেমনই ভাবশূন্য মুখের দিকে স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—

"ইচ্ছা হলে, অনায়াসে। ইনি যে রেজিগ্‌নেশন লেটার আমায় লিখছিলেন, সে আমি পেয়েছি,—এঁকে ডিসমিস বা ডিসচার্জ্জ কর্ব্বার আমার আর দরকার হলো না, যদিও কর্ব্বার মতন কারণ বর্ত্তমান ছিল—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই আরতি—সেই বিস্ময়-বিহ্বলতায় অভিভূত আরতি প্রবল ভাবে চমকাইয়া উঠিল—কারণ ছিল? কি? কি? কি, সে কারণ?—

ডাক্তার সেন আরতির খুব কাছে সরিয়া আসিলেন, হাতের মুঠায় চাপা একটা ছোট্ট শিশি দেখাইয়া স্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন,—

"ডাক্তার রুদ্র তোমার হার্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে হার্ট-ডিজিজের পরিবর্ত্তে যা ডায়াগনসিস করেছেন, সে এই, যাহোক! এটা যখন ফেরত পাওয়া গেছে, চুরির চার্জ্জ থেকে তোমায় আমি এঁর জামিনেই মুক্তি দিলুম। তুমি এঁর সঙ্গে যেতে পারো মালতী!"

এই বলিয়া উভয়কে পথ দেখাইবার ভাবে তিনি তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। আরতি বিনা প্রশ্নে উঠিয়াই মহামায়ার হস্তে ধৃত যন্ত্রের পুতুলের মত তাঁহার অনুসরণ করিল।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা শব্দশূন্য। অতিক্রম-পথের দুধারে বিদ্যুতালোকের সূইচ টেপা ও এই তিনজনের পদধ্বনি ব্যতীত কোথাও কোন সাড়াশব্দই বাকি ছিল না। বহু সুপ্রশস্ত দালান পথ সিঁড়ি অতিবাহিত করিয়া অবশেষে গাড়ি-বারান্দার তলায় যেখানে সুন্দরার বাড়ীর উইস্‌লি নাইট কার অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া তাহারা পৌছিল। মহামায়া ডাক্তারকে নমস্কার জানাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া আরতিকে ডাকিলেন—

এসো মা!

তখন আরতি সহসা চটকাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া ডাক্তার সেনের দিকে

চাহিল। ততক্ষণে ডাক্তার সেন তার আর একটুখানি কাছে আসিয়া হাস্তস্মিত মুখে তাহাকে সম্বোধন করিতেছিলেন,—

"আমি কিন্তু তোমায় 'আরতি'র পরিবর্ত্তে চিরকাল ধরে 'মালতী' বলেই মনে করবো—বিদায় মালতী!"

সমাপ্ত